সাংবাদিক-কেশরী
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দধারা

সাংবাদিক-কেশরী
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

প্রকাশক : দিব্যেন্দু সিংহ
আনন্দধারা
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
জে. ডি. প্রেস
৫২/এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমকালীন-সম্পাদক

শ্রীমান্ আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের

করকমলে—

অবতরণিকা

সাংবাদিক-কেশরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে একজন অতি বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই স্বদেশ-বৎসল পুরুষ-সিংহের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিত হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পরে তাঁহার এক সুযোগ্য শিষ্য শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার একটি জীবনী রচনায় ব্রতী হন। এই পুস্তক প্রকাশের বিষয়টি তৎকালীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিতও হয়। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই জীবিকার অন্বেষণে শম্ভুচন্দ্রকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়া বাস করিতে হয়, সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি তাঁহার পরিকল্পিত হরিশ-জীবনী প্রকাশ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক পরবর্তী কালে তিনি সাময়িক পত্রে ইংরাজীতে হরিশ্চন্দ্রের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য হরিশ্চন্দ্রের শিষ্য, সহচর ও সুহৃদ হিসাবে শম্ভুচন্দ্রের এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর বহুকাল পরে হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম-সংক্রান্ত তিনটি ভাষণ ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রজলাল চক্রবর্তী কর্তৃক ভবানীপুর (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে পরবর্তী কালে হরিশ্চন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার উদ্যোগ লওয়া হইয়াছিল কিন্তু সংগৃহীত উপকরণগুলি যথাকালে অলভ্য হওয়ায় এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই নিবাসী ফ্রামজী বোমানজী নামে এক পার্শী অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করিয়া একটি পুস্তক রচনা করেন (**Light and Shades of the East or A Study of the Life of Baboo Haris Chunder and Passing Thoughts on India and Its People, Their Present and Future—1863**)।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্রের এই প্রথম জীবনীটি সুলিখিত নহে, সুদূর বোম্বাই হইতে হরিশ জীবনীর যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ এই লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে লেখকের নানবিধ মন্তব্য উচ্ছ্বাস পূর্ণ ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং উচ্ছ্বাসই পুস্তকের অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষক-সাংবাদিক রামগোপাল সান্যাল মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের একটি ক্ষুদ্র জীবনী (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬) প্রকাশ করেন। তিনি যথাসম্ভব পরিশ্রম করিয়াও এটিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর রূপ দিতে পারেন নাই, ইহার প্রধান কারণ

এই যে হরিশ্চন্দ্র সম্পাদিত প্যাট্রিয়টের সংখ্যাগুলি তাঁহার অলভ্য হওয়ায় তিনি এইগুলি ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে হরিশ্চন্দ্র চর্চায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। সুখের বিষয় যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির একটি নূতন সংস্করণ সম্প্রতি সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৮৪)। রামগোপাল বসুর কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির যে জীবনী-সংগ্রহ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন (Bengal Celebrities) তাহাতেও হরিশ্চন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত আছে। এই উল্লেখযোগ্য জীবনী-সংগ্রহটিরও একটি নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রামগোপালের পূর্বে ও পরে ইংরাজী ও বাংলায় হরিশ্চন্দ্রের অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্যান্য জীবনীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থপঞ্জীতে এই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর সাংবাদিকতা বিষয়ে গবেষণায় ব্রতী হইয়া আমি সর্বাগ্রে হরিশ্চন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক দামোদর সম্পাদক' অধুনা স্বর্গত দেশকর্মী ও সমাজ সেবক দাশরথি তা হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষের ভিটায় বর্দ্ধমান জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে তিনি হরিশ্চন্দ্রের একটি স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। একাধিকবার তাঁহার আমন্ত্রণে শ্রীধরপুর গ্রামে হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষের ভিটায় হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি সভায় হরিশ্চন্দ্র বিষয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে আমি হরিশ্চন্দ্রের একটি জীবনী রচনার বাসনা ব্যক্ত করি। শ্রীযুক্ত তা আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক কালে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে নানা অপ-প্রচারে আমার হরিশ্চন্দ্রের জীবনী রচনার সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত হয়। অন্যান্য দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি হইতে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। বর্তমানে জাতীয় পাঠাগারে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়টের ফাইল সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেট্রিয়টের ফাইলের প্রতিটি পংক্তি আমি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়া প্রয়োজনীয় অংশগুলি হইতে নোট গ্রহণ করিয়া এমন বহু তথ্য হস্তগতকরি যাহা অন্য কেহই ব্যবহার করেন নাই। পেট্রিয়টের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি অধ্যয়ন ও 'নোট' গ্রহণ করিতে গিয়া আমার দুটি চক্ষুই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটি চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করানোর পর এই একটি চক্ষুটির সাহায্যেই আমি হিন্দু পেট্রিয়ট অধ্যয়ন সম্পন্ন করি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে এই গ্রন্থের অধিকাংশ পৃষ্ঠা হিন্দু পেট্রিয়টের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত অব্যবহার্য হইয়া উঠিতেছে, অনেক সংখ্যা চূর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় জাতীয় পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের

নির্দেশে সঙ্গত কারণে পাঠকদের নিকট উহা অলভ্য হইয়া উঠিতেছে। এই গ্রন্থের দীর্ঘ উদ্ধৃতি গুলি হরিশ্চন্দ্রের অগ্নি-গর্ভ রচনাগুলিকে আরও কিছুকাল পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক হরিশ্চন্দ্রের অপূর্ব রচনাশক্তির পরিচয়ও ইহাতে লাভ করিতে পারিবেন। হরিশ্চন্দ্রের এই জীবনী রচনায় প্রধানতঃ আমি হরিশ্চন্দ্রের রচনাগুলিই ব্যবহার করিয়াছি, ইহাকে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সম্পন্ন করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমি একথা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত নহি যে হরিশ্চন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার চেষ্টা আমার পক্ষে কেন, যে কোন লেখকের পক্ষেই বর্তমানে দুঃসাধ্য। হরিশ্চন্দ্র ও বর্তমান কালের ব্যবধানই ইহার মূল কারণ। বস্তুতঃ আমি হরিশ্চন্দ্রের পূর্ণ আলেখ্য রচনার নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ রেখা চিত্র মাত্র (sketch) অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি সুধী পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ লিখিতে গিয়া ইংরাজ কবি-কুল-তিলক রবার্ট ব্রাউনিং লিখিত এই পংক্তিগুলি বার বার আমার স্মরণ পথে উদিত হইয়াছে "Look at the end of work, contrast/The petty done, the undone vast"। যাহা হউক, এই গ্রন্থটিকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার করিয়া ভবিষ্যতে কেহ যদি হরিশ্চন্দ্রের উৎকৃষ্টতর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন ও সাফল্য-লাভ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এই গ্রন্থে কিছু জীবিত এমন কি মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে রূঢ় বা অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ঈর্ষা-দ্বেষের বশে আমি ইহা করি নাই, সত্যানুরোধে এবং প্রয়োজন বোধে আমাকে ইহা করিতে হইয়াছে। বর্তমানে নানাজনের রচনায় হরিশ্চন্দ্রের অবমূল্যায়ন বা তাঁহার চরিত্র বিদূষণ আমার হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে, অপ্রিয় বা রূঢ় ভাষণ আমার এই অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সুধী পাঠক বৃন্দের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন। এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে হরিশ্চন্দ্র ভক্ত দেশ-সেবক, স্বর্গত দাশরথি তা মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও আমি অমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার উৎসাহ দাতা অন্যান্য সুহৃদগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ও খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক সুধীবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

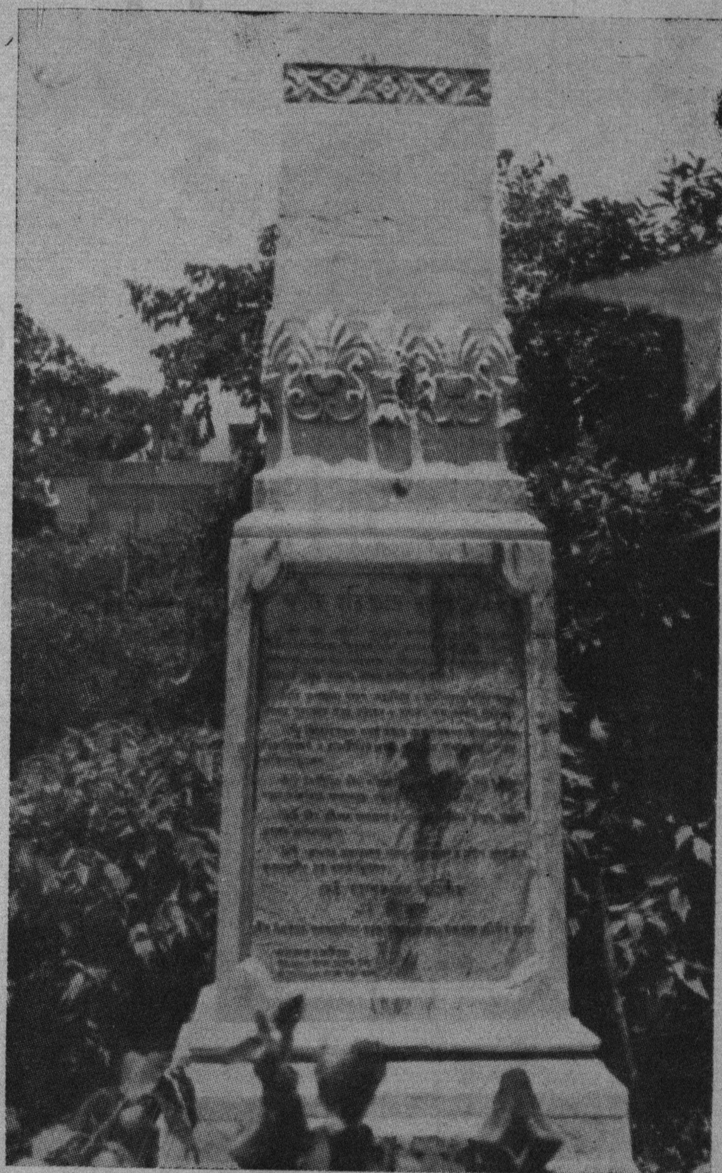
আমার বার্দ্ধক্য জনিত ক্ষীণ-দৃষ্টি, প্রকাশকের অসুস্থতা, সর্বোপরি ছাপাখানার অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থ মধ্যে বেশ কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠক বর্গের নিকটা তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ইতি—

বিনয়াবনত

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

—ঃ সূচীপত্র ঃ—



।। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিসৌধ ।।

রুক্মিণী দেবী তাঁর মাতামহের গৃহে বাস করতেন। মাতার মাতামহ গৃহেই হারাণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। রুক্মিণী দেবীর মাতামহের নামটি জানা যায় না, তবে এটা জানা যায় যে তিনি ভবানীপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। রুক্মিণীর পিতা ঠাকুরদাস সম্ভবত শ্বশুরালয়েই স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করতেন। ঠাকুরদাসের দুটি পুত্র ছিল, এঁদের নাম বীরেশ্বর ও দেবনারায়ণ।

হরিশের বাল্যকাল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল। মনে হয় ধনী শ্বশুরের মৃত্যুর পর ঠাকুরদাসকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দৌহিত্রদের নিয়ে পৃথক সংসার পাততে হয়েছিল। সম্ভবত হারাণ ও হরিশের শৈশবেই মাতামহ ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার মাতুল বীরেশ্বর ও দেবনারায়ণের উপর পড়েছিল। মাতুলদ্বয়ও মনে হয় দরিদ্র ছিলেন। হরিশের বাল্যকাল যে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল, মাতুলদের দারিদ্র্যই তার কারণ হওয়া সম্ভব।

হরিশ শৈশবে ভবানীপুরের একটি পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। শৈশবেই তাঁর অসাধারণ মেধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাঠশালায় পড়ার সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের সাহায্যে তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর হরিশ্চন্দ্র আনুমানিক সাত বছর বয়সে ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলটি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পরিচালনাধীন ছিল। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে এই স্কুলটি জগমোহন বসু (মৃত্যু ১৮৭৩) কর্তৃক স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫—১৮৪২) এই স্কুল কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে এই স্কুলের হেডমাস্টারের নাম ছিল P. Derozais। এই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক Rev. Petard হরিশকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন বলে জানা যায়। স্কুলে ভর্তির সময় হরিশের মেধা দেখে স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন। এই সুযোগ না পেলে হরিশের পক্ষে বেতন দিয়ে স্কুলে পড়া সম্ভব হত না। স্কুলে পড়ার সময় হরিশ মন দিয়ে ক্লাসের পড়া পড়ে নিতেন, আর বাকি সময় ইংরেজি বা বাংলা বই যা হাতে পেতেন তাই পড়ে ফেলতেন। হাতে সামান্য কিছু পয়সা পেলেই হরিশ বই কিনে পড়তেন। অনেক সময় পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বই চেয়েও পড়ে নিতেন।

বাল্যকালে হরিশ অতি সুদর্শন ছিলেন, শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘ ছিল। মেদ বাহুল্য ছিল না। বর্ণ ছিল গৌর, আয়ত চক্ষু ছিল। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের ছেলে হলেও হরিশের মুখে হাসি লেগে থাকত, সর্বদাই তাঁকে প্রসন্ন দেখা যেত। বালক হরিশ যেমন ছিলেন বলবান তেমনি সাহসী।

এই সময় ভবানীপুরের রাস্তায় মাতাল গোরা সৈন্যরা নিরীহ পথিকদের উপর চড়াও হয়ে তাদের অত্যাচার করত। স্কুলের রাস্তায় এমনি এক মাতাল গোরা সৈনিককে একদিন আর কয়েকজন বালককে সঙ্গে নিয়ে হরিশ বেশ উত্তম-মধ্যম

প্রহার দিয়েছিলেন। গোরা সৈন্য মার খেয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। আর কোনও দিন গোরা সৈন্যরা ঐ পল্লীতে নিরীহ পথচারীদের উপর অত্যাচার করতে সাহস পায়নি।

হরিশ প্রায় ছসাত বছর ইউনিয়ন স্কুলে পড়েন। স্কুলের শেষ শ্রেণীর যা পাঠ্য ছিল তা তাঁর আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের অনেক শিক্ষক হরিশকে ভয় পেতেন, কারণ তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে এই বালক ছাত্র ইতিমধ্যেই তাঁদের চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখে ফেলেছে। এঁরা তাঁকে স্কুল ছেড়ে দেবার পরামর্শ দেন। হরিশের বয়স এই সময় ১৩-১৪ বছর। কোনও একটা সূত্র থেকে জানা যায় যে হরিশ এই সময়ে হিন্দু স্কুলের সিনিয়র বিভাগে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে-ছিলেন।* হিন্দু কলেজে কিছু ছাত্র বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত, এদের বলা হত 'ফাউণ্ডেশন স্কলার'। যাঁরা অর্থ সাহায্য করেন তাঁরা বা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা কোনও ছাত্রের নাম সুপারিশ করলে ঐ ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত। হরিশের বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য ছিল না, 'ফাউণ্ডেশন স্কলার' হিসেবে তাঁর নাম সুপারিশ করতে পারেন, এমন কাউকেও তিনি চিনতেন না। হরিশ যে ইউনিয়ন স্কুলে পড়তেন সেটি স্কুল সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। এই সোসাইটির কর্ণধার ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) স্কুলের কার্য নির্বাহক সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের কোনও যোগাযোগের কথা জানা যায় না। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ডেভিড হেয়ার প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে-ছিলেন, নিজে অনেক যত্নে যে বাড়ি তৈরি করেছিলেন তা দেনার দায়ে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে একটি সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। সম্ভবত তাঁর আর আগের মত দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করার সামর্থ্য ছিল না। হরিশের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের যোগাযোগ না হবার আর একটা কারণও থাকতে পারে। নানা কর্মব্যস্ত হেয়ারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাওয়া যেত না। সেইজন্য দরিদ্র বালকেরা হেয়ার সাহেবের পাল্কীর পেছন পেছন ছুটে 'মি পুওর বয় স্যার, মি পুওর বয় স্যার' বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। হেয়ার তখন পাল্কী থামিয়ে ঐ বালকের কথা শুনে তার পড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। মনে হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ বালক হরিশ্চন্দ্র এইভাবে হেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে চাননি।

স্কুলে পড়ার সময়ই হরিশ্চন্দ্রকে মায়ের অনুরোধে বিয়ে করতে হয়েছিল। সেই সময়ে এই ধরনের বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রী ছিলেন ষোড়শী সধবা, উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

* ইণ্ডিয়ান-ফীল্ড (২০. ৬. ১৮৬১)

(৮) স্কুলে পড়ার সময় থেকেই হরিশ্চন্দ্র লোকের নানা ধরণের দরখাস্ত লিখে বা দলিল পত্র নকল করে দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। এই অর্থে সংসারের অভাব কিছু দূর হত। নিজের বাল্যকালের দারিদ্র্যের কথা হরিশ্চন্দ্র পরবর্তী কালে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের শোনাতেন। এমনি একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। একদিন বাড়িতে এককণা মাত্র চাল ছিল না, একটা কাঁসার থালা বন্ধক দিয়ে চাল কেনার জন্য হরিশ বাড়ি থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় খুব জোরে বৃষ্টি নামল। বাড়িতে এমন একটা ভাঙা ছাতা ছিল না, যেটা মাথায় দিয়ে তিনি বাইরে যেতে পারেন। হরিশের মনে বাল্যকাল থেকে ধর্ম ভাব খুব প্রবল ছিল। তিনি বসে বসে ভাবতে লাগলেন যে ঈশ্বর তাঁদের সপরিবারে সেদিন নিশ্চয়ই অনাহারে রাখবেন না। ঠিক এই সময়ে তার বাড়িতে পাড়ার এক মোক্তার তার ধনী মক্কেলকে নিয়ে হাজির হলেন! মোক্তার একটি নথি (ডকুমেণ্ট) দিয়ে হরিশকে খুব তাড়াতাড়ি এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করলেন। মোক্তারবাবু এর আগেও হরিশকে দিয়ে এই ধরণের কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। হরিশের ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় লেখার ক্ষমতা মোক্তারবাবুর জানা ছিল। মোক্তারবাবুর জরুরি কাজটি করে দিয়ে হরিশ দুটাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন. আর সেই টাকা থেকে চালও কিনে আনা হয়েছিল।* সংসারের এই নিত্য অভাব অনটন দরখাস্ত লেখার মত অনিশ্চিত জীবিকায় মিটতে পারে না, এদিকে স্কুলের পড়াও শেষ হয়ে গিয়েছে। অসহায় অভিভাবকদের টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য বালক হরিশ মাত্র ১৪। ১৫ বছর বছর বয়সেই কাজের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছিলেন। কিছুদিন কলকাতা শহরের পথে পথে ঘোরাঘুরি করে হরিশ অবশেষে বর্তমান কলিকাতার বিনয় বাদল দীনেশ বাগ অঞ্চলের (পূর্বতন ডালহৌসি স্কোয়ার) একটি নীলামদার কোম্পানির অফিসে মাসিক দশ টাকা বেতনে বিল লেখকের চাকরি পান।** সম্ভবত এই সময় হরিশের বয়স ছিল পনেরো যোল বছর। একটি নির্দিষ্ট মাসিক আয়ের ব্যবস্থা হওয়াতে হরিশ তখন থেকে নিজের চেষ্টায় বিদ্যার্জনে মন দেন।

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক জে এইচ স্টকলারের চেষ্টায় 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' স্থাপিত হয়। এটি ১৩ এসপ্লানেড রোডে অবস্থিত ছিল। পরে হেয়ার স্ট্রীট অবস্থিত মেটকাফ হল নির্মাণের পর ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি

* হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী—রামগোপাল সান্যাল, কলিকাতা, নূতন সং ১২৮৪।

** Tulloh & Co. 1 & 2 Tank Square, Calcutta, এই কোম্পানি নীলামে জিনিসপত্র বিক্রি করত। এর অংশীদারের নাম ছিল উইলিয়ম টুলো, উইলিয়ম হাণ্টার স্মাইট, জানুয়েল কিলচিন ও হেনরি বেল।

এখানে উঠে আসে।* হরিশ্চন্দ্র মাসিক দু টাকা চাঁদা দিয়ে এই লাইব্রেরির সদস্য হন। তিনি অফিসের কাজের পর এখানে এসে নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। এই লাইব্রেরির 'এডিনবার্গ রিভিউ'-এর ৭৫টি খণ্ড তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের বিশেষত ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে তাঁর জানার আগ্রহ ছিল। এই লাইব্রেরি তাঁর সেই জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছিল। উত্তরকালে তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবন রচিত রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সব কয়টি খণ্ডই তাঁর মুখস্ত ছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক কান্টের 'ক্রিটিক অফ পিওর রিজন'-এর বহু অংশও তাঁর মুখস্ত ছিল। এটি তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। দার্শনিক বেস্থামের তিনি সর্বাধিক অনুরাগী ছিলেন (Jeremy Bentham,17-8—1832)। সম্ভবত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বেস্থামের 'Tragements of Govt' (1773) ও 'An Introduction to the Principle of Morals and Legislation' (1789) গ্রন্থ দুটি তিনি পড়েছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বেস্থামের ঈপ্সিত 'বহু মানুষের বহুমুখী হিত সাধন নীতি'র (Greatest number) বাস্তব রূপায়ণের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। হরিশের জ্ঞানস্পৃহা শুধু পাঠেই তৃপ্ত হত না। কলকাতায় কোনও ভাল বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকলে তাও তিনি শুনতে যেতেন। এক সময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ও সুপণ্ডিত ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের (Dr. Alexander Duff, 1808—1878) মনস্তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে অফিসে কাজের পর জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এ যেতেন। তখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তর কলকাতার নিমতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বক্তৃতা শোনার পর পায়ে হেঁটে নিমতলা থেকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে ফিরতেন। বাল্যকাল থেকে আইন সংক্রান্ত দরখাস্ত লিখতে লিখতে বা আদালতের দলিল দস্তাবেজ নকল অথবা অনুবাদ করতে করতে হরিশ বাল্য বয়সেই আইনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীর অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁকে অনেক সময় দরখাস্ত লিখে দিতে হত।

এই সময়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০ – ১৮৬৭) ভবানীপুরে হরিশের বাসস্থানের কাছেই বাস করতেন। শম্ভুনাথের পিতা সদাশিব পণ্ডিত ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ, ইনি কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ছিলেন। শম্ভুনাথ সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পল্লীর শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর খুব

* ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের চেষ্টায় এটি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এটি ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় পাঠাগার রূপে বেলভেডিয়ার রোডে স্থানান্তরিত করা হয়।

আগ্রহ ছিল, এইজন্য প্রতিবেশী কিশোর ও যুবকেরা অনেকেই তাঁর বাড়িতে যেত। শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রথম জীবনে সদর দেওয়ানী আদালতের রেকর্ড কীপার ছিলেন, বেতন ছিল মাত্র ২০ টাকা। আইন শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। নিজের চেষ্টায় আইন পড়ে তিনি দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করার 'সনদ' পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতে পরীক্ষা দিয়ে ওকালতির অনুমতি বা সনদ নিতে হত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১—১৮৬৮) ও রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭ – ১৮৬২) এইভাবে ওকালতির সনদ পেয়ে আইনজীবী হিসেবে সহস্র টাকা উপার্জন করেন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে শম্ভুনাথ সদর দেওয়ানী আদালতের সহকারী সরকারি উকিল নিযুক্ত হন। পরে তিনি সরকারি উকিলের পদ পান। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে কলকাতায় হাইকোর্টের সৃষ্টি হয়। রমাপ্রসাদ রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এই পদে যোগদানের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অতঃপর শম্ভুনাথ এই পদ লাভ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের তিনিই প্রথম ভারতীয় বিচারপতি। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। শম্ভুনাথ হরিশের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। প্রতিবেশী যুবক হরিশচন্দ্রকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। শম্ভুনাথ উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন। কলকাতা নগরীর বহু অভিজাত বালকই এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শম্ভুনাথের বাড়িতে এঁরা যাওয়া আসা করতেন। শম্ভুনাথের বাড়িতে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে হরিশচন্দ্রেরও পরিচয় হয়ে যেত। অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক হরিশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাধুর্যও সকলকেই আকৃষ্ট করত। ক্রমে ক্রমে হরিশ্চন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কাহিনী কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। শম্ভুনাথের আইন শাস্ত্রানুরাগ হরিশ্চন্দ্রের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল, শম্ভুনাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য হরিশ্চন্দ্র মন দিয়ে আইন বিষয়ক মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করে নিয়েছিলেন। অবসর বিনোদনের জন্য শম্ভুনাথ বাড়িতে নকল আদালত বসাতেন। কোন একটি 'কেস' বা মামলা সাজিয়ে কাউকে বাদী ও প্রতিবাদীর উকিল সাজানো হত। হরিশ এই নকল কোর্টে কখনও বাদী কখনও প্রতিবাদীর পক্ষ নিয়ে সওয়াল করতেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও আইনজীবী প্রসন্নকুমার ঠাকুর মাঝে মাঝে শম্ভুনাথের বাড়ি আসতেন, হরিশের আইনানুরাগ দেখে তিনি নানাভাবে হরিশের আইন জ্ঞান পরীক্ষা করতেন। হরিশের মনে এই ক্ষোভ জন্মাত যে তিনি প্রসন্নকুমারের সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না। রীতিমত অধ্যয়নের পর শেষ পর্যন্ত প্রসন্নকুমার হরিশ্চন্দ্রের আইন জ্ঞানের পরিচয়

পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের এই আইনজ্ঞান তাঁর সাংবাদিক ও ব্যক্তিগত জীবনে খুব কাজে লেগেছিল।

টুলো কোম্পানির অফিসে অতি অল্প বেতনে হরিশকে বেশ কয়েক বছর কাজ করতে হয়েছিল। এই অফিসে সকল কর্মীরই বেতন অল্প ছিল, তবে মালিককে ফাঁকি দিয়ে উপরি রোজগারের অনেক সুযোগ এখানে ছিল। হরিশ্চন্দ্র ব্যাতীত অন্য সকল কর্মচারীই এই সুযোগ গ্রহণ করত। অনেকদিন চাকরির পর হরিশের ২ টাকা মাত্র বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর বেতন হয়েছিল ১২ টাকা।

হরিশ্চন্দ্র অল্প বয়সেই বিবাহিত হন। স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরীর গর্ভে হরিশের দুটি সন্তান জন্মেছিল। প্রথমটি কন্যা সন্তান, জন্মের মাত্র কয়েকদিন পরই এর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় সন্তান একটি পুত্রের জন্মের ১৫ দিনের মধ্যেই মোক্ষদাসুন্দরীর মৃত্যু হয়। শিশু পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য মায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহের পত্নীর নাম ছিল ভগবতী। ভগবতী সুরূপা ছিলেন না, তিনি দরিদ্র পরিবারের কন্যা ছিলেন, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাও বিশেষ ছিল না। যে শিশু সন্তানটি প্রতিপালনের চিন্তা করে হরিশ্চন্দ্র প্রিয়তমা মোক্ষদাসুন্দরী মৃত্যুর অনতিকাল পরেই দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য হন, সেই শিশু পুত্রটি মাত্র তিন বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পত্নী ও সন্তান বিয়োগে হরিশ্চন্দ্র বিশেষ ভাবে কাতর হয়ে পড়েন। এই সময়ে কোন বন্ধুর পরামর্শে তিনি দুঃখ কষ্ট ভোলার জন্য মদ্যপান শুরু করেন। ক্রমে তিনি নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। এই মদ্যাসক্তি তাঁকে অকাল মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মদ্যাসক্তি ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে আর কোন দুর্বলতা ছিল না।

টুলো কোম্পানিতে অফিসের চাকুরিতে হরিশচন্দ্রের সংসার যাত্রা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তিনি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকরির সন্ধান শুরু করতে থাকেন। নীলাম অফিসে ও পাবলিক লাইব্রেরিতে কিছু ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে হরিশের পরিচয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ জেমস্ ম্যাকেঞ্জি (James Mackenjie)। ইনি আয়কর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইনি পূর্বে মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে কাজ করতেন। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত হরিশের বিদ্যাবত্তা বিশেষত ইংরাজি ভাষা জ্ঞান ও চরিত্র মাধুর্যে মিঃ ম্যাকেঞ্জি হরিশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এমন একটি প্রিয়দর্শন ও প্রতিভাবান যুবককে একটি নীলামদারী দোকানে সামান্য বেতনে চাকুরি করতে দেখে তাঁর মনে কষ্ট হয়। এই সময় তার আগেকার কর্মস্থলে মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে একটি নকলনবীশের পদ খালি আছে শুনে হরিশকে ইনি সেই কাজটি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সময়

এই অফিসের বড় কর্তা (মিলিটারি অডিটর জেনারেল) ছিলেন কর্নেল গোল্ডি (Col. Goldie), তাঁর সহকারী ছিলেন কর্নেল ই. জি. আই. চ্যাম্পনীজ, (Col. E. G. I. Champneys)। মিঃ ম্যাকেঞ্জির অনুরোধে এঁরা অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রকেও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। অন্যান্য কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষায় বসার পর হরিশ্চন্দ্র মাসিক ২৫ টাকা বেতনে কপি রাইটার বা নকলনবাশ পদটির জন্য মনোনীত হন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে হরিশ এই পদে যোগ দেন।* সম্ভবত টুলো কোম্পানীতে তাঁর জীবনের ছয়-সাতটি বছর অপচিত হয়েছিল। কর্মদক্ষতার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র নকল-নবাশ থেকে ১০০ টাকা বেতনে কেরানীর (Clerk) পদে উন্নীত হন। কিছুদিন পর এই বেতন ২০০ টাকা হয়। এই সময়ে এই অফিসে ১০০ টাকার বেশি বেতনের পদগুলি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অথবা ইওরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শেষ পর্যন্ত হরিশ মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে সহকারী অডিটর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কাজে যোগদানের অল্প দিনের মধ্যেই হরিশ সহকারী অডিটর জেনারেল চ্যাম্পনীজের বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

কর্নেল চ্যাম্পনীজ স্বয়ং সম্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর মাতুল লর্ড স্ট্যানলি (Lord Stanley) কোম্পানি শাসনের অবসানের পর কিছুকাল ভারত সচিবের পদে আসীন হয়েছিলেন। নিজে সুশিক্ষিত কর্নেল চ্যাম্পনীজ হরিশ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্য চরিত্রবত্তা কর্মদক্ষতার গুণে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পাঠ স্পৃহা মেটাতে তিনি তাঁকে বহু বই ও ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা পড়তে দিতেন। পরবর্তীকালে হরিশ্চন্দ্র যখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র প্রকাশ করেন তখন চ্যাম্পনীজ তাঁকে দেশ থেকে পাওয়া অনেক সংবাদ সরবরাহ করতেন, অনেক সংবাদ জানিয়েও দিতেন। সকল সভ্য দেশেই সরকারী অডিট বিভাগ কিছুটা প্রশাসনিক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, সাধারণ প্রশাসনকে অডিট বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয় না। মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিস সাধারণ প্রশাসনের অধীন ছিল না. হয়ত এই জন্যই হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় সরকারের নিন্দা বা তীব্র সমালোচনা করা সম্ভব হয়েছিল।

ইংরাজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে স্বাধীন চেতা ও সহৃদয় ভারত হিতৈষী বেশ কিছু রাজকর্মচারীর সন্ধান দীর্ঘ ইংরাজ শাসনকালের মধ্যে পাওয়া যায় এটা ঐতিহাসিক সত্য। কর্নেল চ্যাম্পনীজ এমনি এক ভারত হিতৈষী ও সহৃদয়

* রামগোপাল সান্যাল লিখিত হরিশের বাংলা ও ইংরাজি জীবনীতে এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় হরিশের এই চাকরিতে যোগদানের বিষয়টি ১৮৪৭-এ ঘটেছিল দেখা যায়। এই তথ্যটি ভুল।

ব্যক্তি ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে অডিটর জেনারেল কর্নেল গোল্ডি কানপুরে ছুটি উপভোগ করতে যান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি, তাঁর হিন্দুস্তানী স্ত্রী ও চারটি কন্যা সহ, সপরিবারে সিপাহীদের হাতে নিহত হন। কর্নেল গোল্ডির মৃত্যুর পর কর্নেল চাম্পনীজ মিলিটারি অডিটর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন ম্যালিসন (1825-1898) এ্যাসিস্টাণ্ট অডিটর রূপে এই অফিসে যোগ দেন। ইনি উত্তরকালে ঐতিহাসিক রূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। কিছুকাল ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। ক্যাপটেন ম্যালিসন হরিশের সমবয়সী ছিলেন। সুপণ্ডিত হরিশকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাতে তাঁর রচিত কিছু ঐতিহাসিক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। হরিশ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মিলিটরী অডিটর জেনারেল অফিসে যোগদানের দেড় বছর পরে উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই অফিসে কেরানীর পদে যোগদান করেন। হরিশ গিরিশের চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, সচ্চরিত্র ও নম্র স্বভাব যুক্ত গিরিশ অল্পদিনের মধ্যেই হরিশের একান্ত স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। নিজের পদোন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ গিরিশেরও পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিতেন। গিরিশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্রকে (১৮২৪-১৯০৩) ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে হরিশ নিজের অফিসে নিয়ে আসেন। গিরিশের মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ (১৮২৬-১৮৮৬) 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন, পরে ইনি ডেপুটি কালেক্টার পদে যোগদান করেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীনাথের সঙ্গে হরিশের গভীর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, হরিশের তিনি ছিলেন বয়স্য। ক্ষেত্রনাথ ও গিরিশ হরিশের কাছে যথাক্রমে অগ্রজ ও অনুজ তুল্য হয়ে উঠেছিলেন। ঘোষ ভ্রাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে শিমুলিয়া পল্লীর এই ঘোষ পরিবারে হরিশ একজন পরমাত্মীয় রূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

যৌবনে পদার্পণের সময় থেকেই হরিশ ইংরাজিতে নিবন্ধ লেখা শুরু করেন। ইংলিশম্যান, বেঙ্গল হরকরু ফিনিক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রে তার প্রবন্ধ লেখা শুরু হয় বলা হয়ে থাকে। তবে তা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। কাশীপ্রসাদ ঘোষের (১৮০৯-১৮৭৩) হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার পত্রের একজন প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রটি প্রবর্তিত হয়। হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার হরিশের দু একটি লেখা না ছাপাতে হরিশ বিশেষ ক্ষুন্ন হন। কাশীপ্রসাদ রক্ষণশীল মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাছাড়া গভর্নমেন্টের বিরোধী কিছু তাঁর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা তাঁর নীতি ছিল না। সম্ভবত হরিশচন্দ্রের অমনোনীত রচনায় কোন বিষয়ে গভর্নমেন্টের তীব্র

সমালোচনা করা হয়েছিল। হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ারএর সংস্রব ত্যাগ করে হরিশ ঘোষভ্রাতাদের 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রে নিয়মিত রচনা প্রকাশ শুরু করেন। এত কাল হরিশ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও ইংরাজি লেখার খ্যাতি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজি সংবাদপত্রে শক্তিশালী একজন লেখক রূপে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই দেশের শিক্ষিত সমাজে হরিশ্চন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রটি ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়।

২.

হরিশ্চন্দ্র ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

(১৮৫২—১৮৬১)

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) আমাদের দেশে নব জাগরণের অগ্রদূত রূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন। রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে এডামের প্রেস বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এবং পরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতা বঞ্চিত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ রাজের কাছে সেই প্রথম প্রতিবাদ। ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের 'জুরী' হিসেবে কাজ করার অধিকার সীমিত রেখে যে জুরী প্রথা প্রবর্তন করেছিল, রামমোহন অন্য অনেকের সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। ইংলণ্ডেও তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনের সনদ নবীকরণের প্রাক্কালে রামমোহন ইংলণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বজায় রেখে কৃষকদের করভার হ্রাসের অনুরোধ জানান। ভারত থেকে বিপুল সম্পদ শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্সের তিনটি কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রামমোহন ভারতের বিচারব্যবস্থা, রাজনীতি ও বৈষয়িক নীতির পরিবর্তনের দাবী জানিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক রামমোহনের একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল যে তিনি ইংরাজের উদারনীতি ও ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশেষ আস্থা পোষণ করতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার পূর্বে ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না, তিনি মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন। ইউরোপীয়দের এ দেশে বসবাস ব্যবস্থারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে ইউরোপীয়দের সাহচর্যের ফলে ভারতবাসী উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। ইংরেজ বর্জিত স্বাধীন ভারতের চিন্তা স্বাধীনতা প্রেমী রামমোহনের মনে যে প্রায় উঠত তাঁর চিঠিপত্র ও প্রবন্ধের মধ্যে তার আভাস আছে; তবে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সে দিন বহু দূরে এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে 'ধীরে চল'—এই ছিল তাঁর নীতি। যাই হোক, ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি যে সর্বপ্রথম হোতা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রামমোহনের সমকালীন বাঙালী প্রধানদের মধ্যে দ্বারকনাথ ঠাকুর ১৭৯৪—১৮৪৬,

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১—১৮৬৮), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩—১৮৬৭), রামকমল সেন (১৭৮৩—১৮৪৪) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ শাসনের প্রতি এঁদের সকলেরই গভীর আস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসিত হিসেবে ভারতবাসীরও কিছু অধিকার থাকবে এবং সেই অধিকারগুলি আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের প্রাক্কালে রামমোহন রায় ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে যে সব দাবি দাওয়া উপাস্থত করেছিলেন তার অধিকাংশই অগ্রাহ্য হয়েছিল, যেগুলি গ্রাহ্য হয়েছিল সেই দাবিগুলি পূরণেও শৈথিল্য ঘটেছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহনের আকস্মিক মৃত্যুর পর বাঙালা প্রধানদের ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছিল। ইংরেজ শাসনের এক অতি নিষ্ঠাবান সমর্থক দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও খেদ প্রকাশ করে বলতে হয়েছিল যে ইংরেজরা ভারতবাসীকে নিঃস্ব করে দিয়েছে।* উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে শুধু দ্বারকনাথের নয়, বহু শিক্ষিত ভারতবাসীরই ব্রিটিশ জাতি সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়েছিল। তাদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সবই ইংরাজের দ্বারা কবলিত। বাঙালা পরিচালিত ইংরাজী ও বাংলা পত্রপত্রিকাগুলিতে এই সময় থেকেই গভর্নমেন্টের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হতে থাকে।

বিশেষভাবে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর কলিকাতায় দেশীয় ও ইউরোপীয় ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'জমিদারী এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন প্রভৃতি দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদের চেষ্টায় সংগঠিত হয়। এই সংস্থায় বেসরকারি কিছু ইউরোপীয়ও ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটির পরিবর্তিত নাম হয় 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি' (Land Holders Society)।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও ইংলিশম্যান সম্পাদক উইলিয়ম হ্যারিকর এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক হন। শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য জমিদার শ্রেণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটিই আমাদের দেশের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত। শেষোক্ত সোসাইটিটি রামমোহন সুহৃদ উইলিয়ম এডাম কর্তৃক (William Adam) ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসীর দুর্দশার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ। ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে দ্বারকানাথের মোহভঙ্গের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ প্রথমবার ইংলণ্ডে যান এবং এক বৎসর পর স্ব-ব্যয়ে

* Partner in Empire-Blair Buckling California 1976

জর্জ টমসন (George Thomson) নামে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির এক সক্রিয় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। রাজনীতিজ্ঞ ও বাগ্মী টমসনকে সঙ্গে করে আনার পেছনে চতুর দ্বারকনাথের এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। নিজে জমিদার হলেও ধনী জমিদার শ্রেণী প্রভাবিত ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ সোসাইটির ক্রিয়া-কাণ্ড যে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে সমর্থ হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিলনা। 'নব্য-বঙ্গ' রূপে পরিচিত ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত তরুণদের রাজনীতি মনস্ক করে তোলার জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। জর্জ টমসনের সঙ্গে ইংলণ্ডে মেলামেশার পর দ্বারকানাথ তাঁকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে নির্বাচিত করেন। ইতিমধ্যেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কলকাতার 'নব্য-বঙ্গ' রূপে চিহ্নিত যুবকদল কর্তৃক 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (সোসাইটি ফর দি একুইজিসন অফ্ জেনারেল নলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারকনাথের ব্যবস্থায় জর্জ টমসন এই সভায় অনেকগুলি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণগুলিতে জর্জ টমসন বঙ্গীয় যুবকদের এই উপদেশ দেন যে তাদের ভয় ত্যাগ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইংরাজের স্বদেশ ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় (Constitution) শাসিতদের স্বার্থরক্ষার যে সুযোগের ব্যবস্থা আছে, ভারতবাসীকে চেষ্টা করতে হবে যাতে সেই সুযোগ সুবিধাগুলি তাদেরও অধিগত হয়। নব্য বঙ্গের যুবক দলের মধ্যে পূর্ব থেকেই মানসিক প্রস্তুতি এসেছিল, জর্জ টমসন নব্য বঙ্গের এই নব লব্ধ চেতনার সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর পরামর্শে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল কলিকাতায় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, তাদের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণ, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি ও অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে জর্জ টমসন ও প্যারীচাঁদ মিত্র। নব্যবঙ্গের নেতা স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে এই প্রতিষ্ঠান সরকারী চাকুরীতে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ, রেজিষ্ট্রি ও বিচার বিভাগের সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলনে পদক্ষেপ করেছিল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' ও 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি' ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে একই কালে কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রথমটি ছিল 'শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী' সংগঠন ও দ্বিতীয়টি অভিজাত ও ধনী সমাজের সংগঠন। এই দুই সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। কিছুদিন পর অবশ্য দুটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মেই শৈথিল্য এসেছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ চার্টার অ্যাক্টের একটি ধারা ছিল এই যে ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদের অন্যায় অত্যাচার থেকে দেশীয় প্রজাদের বাঁচাবার

জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে অপরাধী ইংরাজ ব্রিটিশ প্রজাদেরও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারত সরকারের আইন সচিব মেকলে (T. B. Macaulay, 1800-1859) ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই মর্মে একটি আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ইউরোপীয় সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করেছিল, আশ্চর্যের বিষয় ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভারতীয়দের স্বার্থে রচিত এই আইন বিধিবদ্ধ করা সমর্থন করেনি। ব্রিটিশ জাতীয়দের সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে বিরূপতা তখনও স্পষ্ট রূপ পায়নি। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইন সচিব মিঃ জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) (ল এণ্ড লেজিসলেটিভ মেম্বার, গভর্নর জেনারেল্স কাউন্সিল) এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়ে চারটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন। এই আইনগুলির একটি ছিল এই যে, যে কোন কোর্টে অর্থাৎ দেশীয় বিচারকদের আদালতেও অভিযুক্ত ব্রিটিশ জাতীয়দের বিচার করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এতকাল শুধু মাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই এই অধিকার ছিল কারণ সুপ্রীম কোর্টে কোন 'কালা আদমি' অর্থাৎ দেশীয় বিচারকের স্থান ছিল না। কালা আদমিদের সাদা চামড়ার অভিযুক্তদের বিচার করার প্রস্তাবের সূচনাতেই কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মেকলের আইনটিকে ব্ল্যাক য়্যাক্ট বলা হত, বেথুনের খসড়া আইনটিও ব্ল্যাক য়্যাক্ট নামে চিহ্নিত হয়েছিল। দেশীয় সমাজ এবার বেথুনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। রামগোপাল ঘোষ এবিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রচার ছাড়াও এই আইনের সপক্ষে বহু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। বাগ্মিতার জন্য তাঁর নাম হয় ভারতীয় ডিমস্থেনিস (Demosthenes, গ্রীক বাগ্মী, জন্ম-খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৩৮৩ শতাব্দ)। ইউরোপীয় সমাজের প্রবল প্রতিকূলতার কারণে বেথুন এই আইনগুলি বিধিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। ভারত-বন্ধু বেথুন অতঃপর দেশীয় সমাজের উন্নতি তথা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু কালাবলার জন্য একই আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁকে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা তাঁর জীবনশক্তি হ্রাস করে দিয়েছিল। ভগ্নহৃদয় ভারতবন্ধু বেথুন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট কলকাতা শহরেই অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করে গিয়েছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অত্যাচারিত ও শোষিত ভারতবাসীকে যে সামান্য ন্যায় বিচার ও সুযোগ সুবিধা দিতে ইচ্ছুক মুষ্টিমেয় ভারত প্রবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধতায় সেটুকুও পাওয়ার আশা নেই এ ব্যাপারটি 'ব্ল্যাকট য়্যাক্ট' প্রত্যাহার ঘটনা থেকেই শিক্ষিত বাঙালী হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। এই সময় তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও ব্রিটিশ জাতির স্বরূপও উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত শাসনের জন্য যে সনদ বা অধিকার পেয়েছিল তার মেয়াদ ছিল ২০ বৎসর। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে

এই সনদ বাতিল অথবা নবীকরণের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষিত বাঙালী বুঝেছিল যে এই সনদ নবীকরণের প্রাক্কালে ভারতবাসীদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন এবং সংগঠনের মাধ্যমেই ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবীগুলি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের কাছে উপস্থিত করতে হবে কারণ কোম্পানীর সনদ (চার্টার) নবীকরণের অধিকার শুধু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কিছু উন্নতমনা বেসরকারী ইংরাজের নেতৃত্ব ভারতবাসী মেনে নিয়েছিল। চতুর্থ দশকের শেষ প্রান্তে এবং পঞ্চম দশকের সূচনায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ইংরাজের নেতৃত্ব মেনে নিতে ভারতবাসী আর প্রস্তুত ছিল না। সর্বনাশ শিয়রে উপস্থিত দেখে এতকাল রাজা রাধাকান্ত প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি' ও রামগোপাল প্যারীচাঁদ প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনাধীন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' তাদের পুরাতন ঝগড়া বিবাদ ভুলে একই পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সংকল্প নিয়েছিল। রাজনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য এই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ একত্রে কলিকাতার পাইকপাড়ার রাজবাটিতে সমবেত হয়ে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর 'ন্যাশনেল এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু এর ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর আর একটি সভায় এই প্রতিষ্ঠানটির নামটি পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ন্যাশনেল এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনিই এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান এই যে রক্ষণশীল মনোবৃত্তির কয়েকজন জমিদারের প্রেরণায় 'ন্যাশনেল' নামটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।* এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শোভাবাজার রাজ পরিবারের রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭)। কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া), রাজা সত্যচরণ ঘোষাল (ভূ-কৈলাস) হরকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), হরমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ ও দিগম্বর মিত্র। এই নব গঠিত প্রতিষ্ঠান সর্ব প্রথম যে কাজটি হাতে নিয়েছিল সেটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্নবীকরণের প্রাক্কালে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কোম্পানী শাসনের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে ভারতের দাবীগুলি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের নিকট উত্থাপন। এসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রদেশ এবং আগ্রা শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও মতামত সংগ্রহ করেছিলেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সময় কলিকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান ছিলেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে তিনি আইন চর্চায় আকৃষ্ট হন। আইন বিষয়ক আলোচনায় এঁদের সমকক্ষতা অর্জনে হরিশ্চন্দ্র মনোনিবেশ করেন এবং এ বিষয়ে সফলকাম হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে ইতিপূর্বেই হরিশ্চন্দ্রের হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের (পাইকপাড়া) নাম করা যেতে পারে। পরিচিত বান্ধবদের অনুরোধে হরিশ্চন্দ্র 'চ্যার্টার য়্যাকট' ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপন কালে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে যে আবেদন পত্র (Petition) উপস্থিত করা হবে তার খসড়া রচনায় ব্রতী হন। বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করে হরিশ্চন্দ্র এই খসড়াটি প্রস্তুত করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনের এক সভায় এই খসড়াটি অনুমোদিত হয়। খসড়ার সারমর্ম সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই হরিশ্চন্দ্র এই সভার সদস্য হননি। সম্ভবত নির্দিষ্ট অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সময় তাঁর বেতন সম্ভবত দুই শত টাকার অধিক ছিল না। যাইহোক বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে অর্থাৎ এসোসিয়েশনের জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার আগেই হরিশ্চন্দ্র পার্লামেণ্টে প্রেরিত পিটিশনের খসড়া করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, এখন সদস্য হওয়ার পর তাঁর উপর আরও বহু গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। হরিশ্চন্দ্রকে বহু বৎসর যাবৎ এসোসিয়েশনের জন্য এত পরিশ্রম ও সময় দিতে হত যে অনেকে মনে করতেন যে হরিশ্চন্দ্র এসোসিয়েশনেই চাকুরি করেন, তাঁর আর অন্য জীবিকা নেই। ঐতিহাসিক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই ভুল করেছেন। তাঁর জানা ছিল না যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ প্রতিষ্ঠার ছয় সাত বৎসর পূর্ব থেকেই হরিশ্চন্দ্র মিলিটারী অডিটর জেনারেল অফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন। সরকারী কর্মচারী রূপে অন্য কোথাও চাকুরী করার অধিকার তাঁর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

চ্যার্টারয়্যাকট নবীকরণের প্রাক্কালে হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

কর্তৃক প্রেরিতব্য যে আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করেন সেটিতে ৩৬টি অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফে ২১টি প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব এই ছিল যে শুধু গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল (সুপ্রীম কাউন্সিল) দিয়ে ভারত শাসনের কাজ নির্বাহ হবে না, এছাড়াও ভারতীয়দের নিয়ে একটি ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) গঠন করতে হবে। এর সদস্য সংখ্যা হবে ১৭, এর মধ্যে বারজন বেসরকারী সদস্য বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্সি ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ থেকে নির্বাচিত করতে হবে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ চার্টার এ্যাকটের দোষত্রুটিগুলি এতে দেখিয়ে দিয়ে এগুলি সংশোধনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। এই আবেদনে বলা হয়েছিল যে ভারত সরকারকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারী ভাবে কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করা চলবে না। সরকারী খরচে ভারত সরকারের একটি ধর্মীয় বিভাগ ছিল (Ecclesiastical deptt.), এই বিভাগের যাবতীয় খরচ সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হত। আবেদনের লক্ষ্য ছিল প্রোটেস্টান্ট মতবাদী খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও পরিপোষণের জন্য সৃষ্ট এই বিশেষ বিভাগটির বিলোপ সাধন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট তারিখে এই আবেদনটি কয়েকটি নকলসহ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল আর্ল হ্যারোবি (Earl Harrowby) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রেরিত এই আবেদনটি লর্ড সভায় উপস্থিত করেন। কয়েকদিন পর ১৯ এপ্রিল মিঃ লেভেসন গাউয়ার (Mr. Leveson Gower) আবেদনটি কমন্স সভায় পেশ করেন।

রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনীলেখক ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন যে এই পিটিশন দিগম্বর মিত্র রচনা করেন, এই পিটিশন রচনার দায়িত্ব এসোসিয়েশনের সরকারী সম্পাদক রূপে তাঁর উপরেই দেওয়া হয়েছিল। "The duty of drafting the memorial lay with the asst. secy who certainly acted in consultation and worked upon the suggestions of his colleagues. We have no doubt that Babu Harish Ch. Mukherjee largely contributed to it (Raja Digambar Mitra, P.43 Calcutta 1893). এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রামগোপাল এবং আরও অনেকে এটি হরিশের রচনা বলেছেন। এক্ষেত্রে ভোলানাথ চন্দ্রের অনুমান নির্ভর উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। C.E. Buckland-এর মতেও এই পিটিশন হরিশের রচনা।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জুন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়া বিল'টি পেশ করা হয়। এটি গৃহীত হওয়ার পর ২০ আগষ্ট এই বিল বিধিবদ্ধ হয়। এই নূতন শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রার্থিত সব কিছু দাবিই পূরণ করেনি।

তবে এর অনেকগুলি দাবিই স্বীকৃত হয়েছিল। এসোসিয়েশনের যে সুপারিশ স্বীকৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সর্বভারতে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা, একটি পৃথক ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council), কোম্পানী শাসনকালের মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর রাখা এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য একজন পৃথক লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ। এসোসিয়েশনের সুপারিশমত ব্যবস্থাপক সভা সৃষ্টির ব্যবস্থা হলেও ইণ্ডিয়া বিলে এই সভায় ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন বা মনোনীত ভারতীয়ের সংখ্যা সম্বন্ধে বেশ অস্পষ্টতা ছিল। ইণ্ডিয়া বিলে কোম্পানীর শাসনকালের মেয়াদ আপাতত দশ বৎসর রাখা হলেও এতে একটি ধারায় বলা হয়েছিল, যে প্রতি বৎসরই কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার একটা সমীক্ষা হবে এবং সেই সমীক্ষার উপর আর কোম্পানীকে ভারতে শাসন করতে দেওয়া হবে কিনা তা নির্দ্ধারিত হবে। এই ব্যবস্থাটি এসোসিয়েশন কর্তৃক সন্তোষজনক মনে করা হয়েছিল। নতুন চার্টার য়্যাকট ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে কার্যকর হয়। এই সময় থেকেই এসোসিয়েশন গভর্নমেণ্টের কাজকর্মের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সুরু করে।

ভারতীয়দের অভাব অভিযোগগুলি সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার প্রতিকারের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠনের পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সক্রিয় সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে কাউন্সিলের Clerk Assistant নিযুক্ত করা হয়। নামে 'Clerk' হলেও এই পদটির বেশ মর্যাদা ছিল। এই পদাধিকারীর দায়িত্ব ছিল নূতন আইনকানুন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দান, বস্তুত আইনকানুনের মুসবিদা করার দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এসোসিয়েশনের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রসন্নকুমার লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলের 'ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন' পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁকে এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য পদ ত্যাগ করতে হয়। হরিশ্চন্দ্র এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভের পরই এর কার্যকরী সমিতির সভ্য হন, পরে তাঁকে এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক করা হয়। এই সময় (১৮৫৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবর্তে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার পর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় হরিশ নিজের আপিসের কাজ সেরে কয়লাঘাট স্ট্রীট থেকে (পরে ব্যাংকশাল স্ট্রীট) কষাইটোলায় (কষাইটোলা—বর্তমান বেণ্টিক স্ট্রীট অঞ্চল) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আপিসে হাজির হতেন। এই প্রতিষ্ঠানের আপিস প্রথমে ৩নং কাশীটোলায় (কষাই টোলা) স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। পরে এটি ১ নং লার্কিনস্ লেনে স্থানান্তরিত হয় (বর্তমান রাজভবনের কিছু উত্তরে)। ১৮ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

স্ট্রীটে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের যে বাড়ী আছে, সেটি হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর সাত বৎসর পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীত হয়। তখন এই রাস্তার নাম ছিল-'রানী মুদিনীর গলি'। পরে নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, বর্তমানে এই রাস্তাটি আব্দুল হামিদ স্ট্রীট্ নামে পরিচিত। বেশ কিছুকাল হরিশ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য অথবা সহকারী সম্পাদক যে পদেই থাকুন না কেন হরিশকে এসোসিয়েশনের জন্য প্রত্যহ প্রচুর সময় দিতে হত। বিশেষ করে মুসাবিদার (drafting) এর সব কাজ তাঁকেই করতে হত। 'চার্টার য়্যাক্ট' প্রবর্তনের প্রাক্কালে এসোসিয়েশনের তরফে যে দীর্ঘ নিবেদন পত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছিল তার মুসাবিদা (draft) হরিশ করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে, শুধু তাই নয় এই 'পিটিশন' তাঁর হস্তাক্ষরেই প্রেরিত হয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট চৌকিদারী ব্যবস্থামূলক একটি 'পুলিশ য়্যাক্ট' লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। এই বিলে প্রজাদের কাছ থেকে অধিক ট্যাক্স আদায় ছাড়াও গ্রাম্য-পঞ্চায়েতগুলির স্বাধীনতা খর্ব করে সেগুলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাব ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের স্বাধীনতা হরণ ও জমির উপর চৌকিদারী ব্যবস্থার জন্য অধিক কর আদায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই প্রতিবাদ সত্বেও বিলটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের উন্নতিকল্পে যে 'মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট' প্রবর্তিত হয় তার প্রাক্কালে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কলকাতার পয়ঃনালীর জল নিষ্কাসন, পানীয় জল সরবরাহ ও সংক্রামক রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে শহরের পরিচ্ছন্নতা সাধন বিষয়ে এসোসিয়েশন অনেকগুলি প্রস্তাব দিয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক বহুলাংশে গৃহীত হয়েছিল। ভারত সচিব স্যার চার্লস উড্ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারকে ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটি নির্দেশ পাঠান এটি উড্'স ডেসপাচ নামে খ্যাত)। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি এই নির্দেশ বা পরামর্শগুলি বাস্তবে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এসোসিয়েশনের এক সভায় এই শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়। এই নূতন ব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সরকারী উপেক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে ব্যয়বহুল করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়। নূতন যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হবে তাদের অর্থ সাহায্যের কোন ব্যবস্থা এই শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবে ছিল না এ বিষয়েও সরকারের সমালোচনা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আঠার মাস ব্যাপী কাজকর্মের সমালোচনা করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল এসোসিয়েশন কর্তৃক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দুই কক্ষে (হাউস অফ লর্ডস ও কমন্স) পেশ করার জন্য দুটি আবেদন (পিটিশন) পাঠানো হয়। এই পিটিশন দুটির একটিতে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা ভারতেই গ্রহণের ব্যবস্থা দাবি করা হয়েছিল, যাতে ভারতীয়প্রার্থী দেরও এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ সম্ভব হয় এবং এই সঙ্গে লবণ ব্যবসায়ে সরকারের একচেটিয়া অধিকার বিলোপের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সংক্রান্ত আবেদনে এই কাউন্সিল পুনর্গঠনেরও দাবি জানানো হয়েছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলটি চালু করার আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আভাসে ইঙ্গিতে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জন করেনি, তারা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত সুতরাং তাদের জাতীয় উন্নতি নিজেদের দ্বারা সম্ভব নয়।

এসোসিয়েশনের প্রতিবেদনে কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বহু তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপিত করে বলা হয়েছিল যে (১) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল চালু করা হয়েছে সেখানে জনসাধারণের মতামত অথবা অভাব অভিযোগ উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই (২) লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাজকর্ম ঠিকভাবে চলার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। (৩) লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাজকর্ম ঠিকভাবে চালাবার মত সদস্যেরও অভাব আছে, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন। (৪) কাউন্সিলে বেসরকারী সদস্য একেবারেই নেই। যেসব সদস্য আছেন তাঁরা সকলেই বেতনভুক রাজকর্মচারী অথবা শাসক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনোনীত প্রতিনিধি। পরিশেষে খুব জোরের সঙ্গে এই আবেদনে বলা হয়েছিল যে ভারতবাসী সংঘবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বাধা দান বা আন্দোলনে যদিও তখন পর্যন্ত বিশেষ তৎপরতা দেখায় নি তার অর্থ এই নয় যে ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। খাস ইংলণ্ডের প্রজারা যে স্বাধীনতা ভোগ করে সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকার বেদনা ভারতবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করে। এই আবেদনের শেষ অংশে লেখা হয়েছিল যে গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ অথবা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নিজস্ব মনোনয়ন অথবা সুপরিকল্পিত কোন নির্বাচন প্রথা এই তিনটির যে কোন একটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম এমন সব ভারতীয় সদস্যকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ("The petitioners asked for some provissions to be made early "for duly representing whether by appointment of the Governor General, by nomination of the legislative council itsell, or by some carefully graded electoral seheme the various

classes and interests of India which are now going wholly unrepresented; it is needless to particularise the landed, the commercial and the industrial interests throughout the vast regions and among the numerous races of India")—Chronicles of the British Indian Association

হরিশ্চন্দ্র উপরোক্ত এই প্রতিবেদনেরও মুসবিদা করেছিলেন।* এই বৎসরেই নভেম্বর মাসে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর কাছে আরও একটি প্রতিবেদন প্রেরিত হয়েছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্টের আইনবিভাগীয় সদস্য মহামতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বিচারের ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের একই ব্যবস্থার অধীন করার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় সমাজ এই প্রস্তাবিত আইনটিকে 'ব্ল্যাকয়্যাকট্' নাম দিয়ে এর প্রবল বিরোধিতা করায় এ আইন বিধিবদ্ধ হতে পারেনি। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অধুনা গঠিত ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই বিলটি পুনরায় উত্থিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই বিলটি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য বহু সভা সমিতির অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সরকার পক্ষ থেকে এই বিলটি তুলে নেওয়া হয়। সিপাহী বিদ্রোহকালে ভারতবাসীর হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কালে গভর্নমেণ্ট নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু নীলকরকে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করেন। এসোসিয়েশন এবিষয়ে সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ১৮৫৯ পর্যন্ত এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করেননি। এই ব্যবস্থার ফলে বাঙলার নানা স্থানে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যব্যস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছিল তবে এই নীতি পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। ব্যবস্থাপক সভা (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল), বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগ ও শিক্ষা প্রসারের দাবি নিয়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি আবেদন পাঠানো হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেও অনুরূপ একটি আবেদন প্রেরিত হয়েছিল। এই আবেদনগুলিতে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিলোপ ঘটিয়ে একটি মাত্র সর্বোচ্চ আদালত (High Court) রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মফঃস্বলের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত গুলির সংস্কার সাধনের প্রস্তাবও এতে ছিল। এসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই

* Representative Indians (P. 47) G. Paramaswaran Pillai, Manchester & Newyork—1897.

আবেদনগুলি উত্থাপন করেছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ মিঃ জন ব্রাইট (John Bright)। মিঃ ব্রাইট ছিলেন ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া রিফর্মস সোসাইটির সভাপতি।

এসোসিয়েশনের এই আবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই তিনটি বিল উত্থাপিত হয়ে বিধিবদ্ধ হয় :— (১) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বিল (২) হাইকোর্ট বিল (৩) সিভিল সার্ভিস বিল। উপরোক্ত বিল তিনটির প্রথম দুইটিতে এসোসিয়েশনের অধিকাংশ সুপারিশ গ্রাহ্য হয়েছিল। তৃতীয় বিলটিতে আই-সি-এস পদে ভারতীয় নিয়োগের দাবি গ্রাহ্য হয়। তবে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) ভারতীয় ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলকরদের এসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ ব্যবস্থা রদ হলেও নীলকর সায়েবদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ সরকার এক আইন জারি করেন যে নীলচাষীরা চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদের সাজা দেওয়া হবে। নীল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ও প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার যে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন, এসোসিয়েশন তার সমর্থন করেছিলেন। নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার এই এসো-সিয়েশনের প্রতিনিধি চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। নীল কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বঙ্গদেশের জেলা ও মহকুমাগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল নিকটতম স্থানগুলিতে নূতন নূতন আদালত, পুলিশখানা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। অত্যাচারিত প্রজারা যাতে সহজেই পুলিশ ও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র এসোসিয়েশনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কার্যকালে সম্পূর্ণভাবে হরিশ্চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় হরিশ্চন্দ্র শুধু নামেই সহকারী সম্পাদক ছিলেন, আসলে তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হরিশ্চন্দ্র নিজে পদত্যাগ করে তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণদাস পালকে সহকারী সম্পাদকের পদে বসিয়ে দেন। কৃষ্ণদাসের সময় থেকে এই পদের জন্য বেতন ধার্য হয়, কারণ কৃষ্ণদাস অতি দরিদ্র ছিলেন। প্রথমে তাঁর বেতন ছিল ১২৫ টাকা পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০. টাকা হয়। ১৮৫৮

থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণদাস এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কৃষ্ণদাস এই পদে আসীন ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে একেবারে শয্যাশায়ী না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অক্লান্ত সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে তাঁরও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ বিদেশের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে ১৮৫২ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড স্বরূপ কাজ করে গিয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র জীবনের অন্যদিকের কথা যাঁরা জানেন না এমন কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজেই মনে আসা সম্ভব যে হরিশ্চন্দ্র কৃষ্ণদাস পালের মতই এসোসিয়েশনের বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন।* বস্তুত কোন সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানে হরিশ্চন্দ্রের মত দীর্ঘকালীন নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল।

হরিশ্চন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মাসিক অধিবেশনে হরিশ্চন্দ্রের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে এসোসিয়েশনের পক্ষে এটি একটি দারুণ বিপর্যয়রূপে বর্ণিত হয় (A severe calamity) আরও বলা হয় যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এতগুলি বছর ধরে তিনি শুধু সক্রিয় সদস্যই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কার্যকরী সমিতির একজন অতি উৎসাহী এবং পরিশ্রমী সদস্য। তাঁর উপযোগিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাঁর মতামতও ছিল যথার্থ (**"he was always an active member, an energetic and labourious committee man and a real counsellor)" ....** ।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক আহুত শোকসভায় (১২-৭-১৮৬১) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম স্তম্ভ ও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বাগ্মীবর দেশপ্রেমিক রামগোপাল ঘোষ এসোসিয়েশনে হরিশ্চন্দ্রের সেবার প্রসঙ্গে বলেন যে হরিশ্চন্দ্রের মত সদস্য লাভ করে এই প্রতিষ্ঠানের মহদুপকার সাধিত হয়েছিল। তিনি এই ধরণের সদস্য ছিলেন না, যাঁরা শুধু 'হাঁ' বলার জন্যই সভায় আসেন, সেই ধরনের সদস্য ছিলেন যাঁরা কাজ করেন। হরিশ কখনও এসোসিয়েশনের জন্য কাজের যে চাপ পড়ত তার জন্য অভিযোগ বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। সমস্ত দিন আপিসের কাজের পরেও

* ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের নাম এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

তিনি মোমবাতি জালিয়ে এমন কি না জালিয়েও এসোসিয়েশনের কাজ পরিশ্রম সহকারে করে যেতেন। এইভাবে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি বিশাল স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন, যে এসোসিয়েশন ভারতের এই প্রান্তে দেশীয়দের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (...."His connection with the B. I. Association did an immense deal of good. Harris was that type of member who work and not that type who only concerned. He never complained of work. Even after his office hours he laboured arduously with candle light or no candle light and thus became a great prop to the B. I. Association, the only native political body on this side of India.")

রামগোপাল এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের নানা গুণাবলীর উল্লেখ করেন। তাঁর এই বক্তৃতার বাকী অংশ পরে যথাস্থানে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হবে। রামগোপালের এই বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে একসময় হরিশ্চন্দ্রকে একবার দেশীয় প্রতিনিধিরূপে এদেশের অভাব অভিযোগ ব্রিটিশের গোচরে আনার জন্য ইংলাণ্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল (সম্ভবত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই এর উদ্যোক্তা ছিল)। হরিশ্চন্দ্র এর জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলেন কিন্তু সামাজিক প্রথা ও প্রতিবন্ধকতার জন্য হরিশ্চন্দ্রের ইংলাণ্ড যাত্রা সম্ভব হয়নি। রামগোপাল বলেছিলেন যে সামাজিক কারণে হরিশ্চন্দ্রের ইংলাণ্ড যাত্রার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়েছিল, তবে এটা আংশিক সত্যমাত্র। হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, তাঁর মাতা হরিশ্চন্দ্রকে দূর বিদেশে পাঠাতে চাননি। হরিশ্চন্দ্রের অল্প বয়সে শ্লেষ্মাকাশ রোগ ছিল, মাঝে মাঝে হাঁপানি রোগেও তিনি ভুগতেন। স্নেহশীলা মাতা সম্ভবত পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই পুত্রকে শীতপ্রধান দেশে পাঠাতে অসম্মত হয়েছিলেন। আজন্ম কলিকাতাবাসিনী এই মহিলা সম্ভবত দূর প্রবাসে ইংলাণ্ডে রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ অবগত ছিলেন। যাই হোক মাতৃভক্ত হরিশ্চন্দ্র মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন না করে ইংলাণ্ড যাত্রার সুযোগ ত্যাগ করেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কতদূর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেবা করতেন তার একটি বিবরণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করা হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁর মৃত্যুর ষোল বৎসর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনে হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাজেন্দ্রলাল বলেন (১৫ ৭ ১৮৭৬)—প্রতিদিন তিনি সবার আগে এসোসিয়েশনের নিজের কাজের ডেস্কে এসে বসতেন, সবার শেষে উঠতেন। সাপ্তাহিক, কি মাসিক কিম্বা বিশেষ কারণে আহুত সাধারণ সদস্যদের সভায় তিনিই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এসোসিয়েশনের প্রতিটি পদক্ষেপের

সঙ্গে তিনি একান্তভাবে জড়িয়ে থাকতেন। ("Early and late at daily desk work, at weekly Committee meeting and at monthly and special general meetings, he was foremost everywhere and identified himself in all its actions")*

হরিশ্চন্দ্র যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মহারাজা, রাজা, জমিদার শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানর কর্মধারা শুধু ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হতে পারেনি, দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্যই এর সর্বশক্তি নিয়োজিত করা হত। হরিশের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধীরে ধীরে জমিদার শ্রেণীর মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল এবং এই কারণেই পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়া লীগ, ন্যাশানাল কনফারেন্স প্রভৃতি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এইগুলি সবই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বেই জন্মলাভ করেছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই স্মৃতিরক্ষার বিষয়টিও যথাস্থানে আলোচিত হবে।

* Speeches and Writings of R. L, Mitra—R. Mitra. Calcutta—1892 (PP 51-52).

৩.

সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মসংস্কার ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্র

অল্প বয়স থেকেই হরিশের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রখর ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই চেতনা আরও দৃঢ় হয়। হরিশের অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে নীতিবোধও প্রখর ছিল। পাশ্চাত্য দেশের নীতিবাদী দার্শনিকদের রচনার সঙ্গেও হরিশ গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। হরিশের প্রতিবেশী শম্ভুনাথ পণ্ডিতের গৃহ তৎকালে কলকাতার বিদগ্ধমণ্ডলীর মিলনস্থল ছিল।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ভবানীপুর বাসভবনে 'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' (Truth Revealing Society) নামে একটি সভা স্থাপিত হয়' এর উদ্দেশ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অনুরূপ ছিল। শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হন ভবানীপুর নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তৎকালে সদর দেওয়ানা আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র এই সভার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় এই সভার অধিবেশন হত। সভারম্ভের পর গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত। প্রার্থনামূলক গানের পর সভার কাজ শেষ হত। এই সভায় অর্দ্ধশতাধিক সদস্য হয়েছিল।

এই সভার অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন কাশীশ্বর মিত্র। মিত্র মহাশয় সরকারী বিচার বিভাগে চাকুরি করতেন এবং ভবানীপুর পল্লীতে বাস করতেন। কাশীশ্বর আদিব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনমাস পর কাশীশ্বরের আমন্ত্রণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অধিবেশনে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি এই সভায় প্রায়ই যোগ দিতে আসতেন। এই সময় কাশীশ্বর প্রস্তাব করেন যে এই সভায় আদিব্রাহ্ম সমাজের মতই উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত করতে হবে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় যাঁদের বিশ্বাস ছিল না, এমন অনেক সদস্য এই সময় এই সভার সংশ্রব ত্যাগ করে চলে যান। অনেক নতুন নতুন সভ্য এসে এঁদের স্থান পূর্ণ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২:জুন 'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকীতে 'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' নামটি বিলুপ্ত করে এর নতুন নামকরণ হয় 'ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ'। হরিশ্চন্দ্র

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়েছিল। ৭১নং পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের বাড়িটি এখনও কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। ভবানীপুর পল্লীতে পরবর্তী কালে বিভিন্ন মতের একাধিক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজটি প্রাচীনতম।*

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজকে কেন্দ্র করে তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শে এই পল্লীতে 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা' স্থাপিত হয়। হরিশ্চন্দ্র এই সভারও সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র এই সভায় ধর্ম বিষয়ে বহু ভাষণ দান করেন। ভাগবদ্গীতা সম্বন্ধীয় ভাষণগুলিও এই ভাষণের অন্তর্ভুক্ত। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে রক্ষিত হয়নি, এটি দুঃখের বিষয়। হরিশের মাত্র তিনটি বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর বহু পরে প্রকাশিত হয়েছিল।** এই বক্তৃতাগুলি অক্সফোর্ডবাসী জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকস্‌-মূলারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'সত্য সঞ্চারিণী সভা' প্রতিষ্ঠার পর এই সভার ৫৩ জন সদস্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই দীক্ষিত সদস্যদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র অন্যতম কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধ তৎকালে মূলতঃ মূর্তিপূজাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। হরিশ্চন্দ্র নিজের বাড়িতে মাতার আজ্ঞায় দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করতেন, তিনি বলতেন এটা অন্যায় নয়। হরিশ্চন্দ্র নিজে হয়ত মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু মাতার তৃপ্তি সাধনের জন্যই বাড়িতে দুর্গাপূজা করাতেন। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও তাঁর এই 'পর-ধর্ম'-সহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মবন্ধুগণ হরিশ্চন্দ্রের এই কাজকে কি চোখে দেখতেন তা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র হিন্দু 'গোঁড়ামি' ও ব্রাহ্ম 'গোঁড়ামি' এই উভয়ের উর্ধ্বে এক অনানুষ্ঠানিক সত্য ধর্মের উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই উপলব্ধিই তাঁর মনে ধর্ম বিষয়ে উদারতাবোধ এনে দিয়েছিল।

সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের (১৮২২-১৮৭৩) বাড়িতে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের কৃতী ছাত্র

* History of the Brahmo Samaj (P267-303)—Vol II,—Sivnath Sastri. Calcutta 1912.

** Three lectures on Religion—Harischandra Mookherjee, Calcutta 1987,

কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সময় কলিকাতায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট্-পদে নিযুক্ত ছিলেন। সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ প্রবর্তন, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধতা, দেশে কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পোদ্যোগের উন্নতি ইত্যাদি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি এবং কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। যে বার জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে এর কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সমিতির ক্রিয়াকর্মের প্রভাব পড়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কলিকাতায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। এই তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। এই সভার উদ্যোগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২১ জন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষিতদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মসূচিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ব্যতীত সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজেরও স্থান ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি বা এই ধর্মগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন না এমন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই সভার সদস্য এমন কি কর্মকর্তাও ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর হরিশ্চন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। সভ্যপদ গ্রহণের পর হরিশ্চন্দ্র মাঝে মাঝে এই সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপেও কাজ করেছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকর' থেকে জানা যায় যে হরিশ্চন্দ্র 'ভবানীপুর সেমিনারী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পরিচালক ছিলেন চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র হালদার, গোবিন্দপ্রসাদ বসু ইত্যাদি (সংবাদ প্রভাকর, ৩ আষাঢ়, ১২৫৬; ১৬ জুন, ১৮৪৯)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় আলোচনার আবশ্যকতা আছে।

কিছুদিন পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাসে হরিশ্চন্দ্রকে এর অন্যতম নায়করূপে চিত্রিত করা হয়েছে।* এটি প্রথমে

* সেই সময়—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা—১৯৮১.

একটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পরে পুস্তাকারে প্রকাশিত হয় ও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হরিশ্চন্দ্র যে ঐ এময়ে একজন বিশিষ্ট ও বহুবন্দিত ব্যক্তি ছিলেন—লেখক তা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি, দুঃখের বিষয় এই উপন্যাসে লেখক তাঁকে বারাঙ্গনা গৃহগামী ও মদ্যপরূপে চিত্রিত করেছেন, শুধু তাই নয়, গ্রন্থের তরুণ নায়ক নবীনচন্দ্রকে (স্বনামে কালীপ্রসন্ন সিংহ) তিনি মদ্যপান ও বারাঙ্গনা গৃহগমনে প্রলুব্ধ করেছেন দেখানো হয়েছে। উপন্যাসটি সাময়িকপত্রে প্রকাশকালে হরিশ্চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র-রূপে পরিচয়দানকারী এক ভদ্রলোক* লেখকের বর্ণনায় ব্যথিত বোধ করে এর প্রতিবাদ করেন এবং কিসের ভিত্তিতে লেখক এই সব তথ্য দিয়েছেন তা জানতে চান। এর উত্তরে লেখক প্রথমে রামগোপাল সান্যালের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন। রামগোপাল লিখেছিলেন "In these days, habit of drinking sometimes for consideration of health and sometimes for pleasure was a common vice among all the English educated natives of Bengal and Harishchandra was no exception to the rule. Want of domestic felicity sometimes led him into other vices which it is now painful to reflect upon."

এর ভিত্তিতে লেখকের মন্তব্য এই যে "সেকালে মদ্যপান ছাড়া other vices বলতে বিশেষ করে একটি ব্যাপারই বোঝাত, যাকে আমি বলেছি যোষিৎ সংসর্গ। শিবনাথ শাস্ত্রী আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন "এরূপ শুনিয়াছি যে ইহার কিছু পূর্বে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই শোকের অবস্থায় তাঁহার নব পরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাঁহাকে সুরাপান ও অন্যান্য নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হইতেই তাঁহার সর্বজন প্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখা পড়ে। তাহা হইতেই তাঁহার পানাসক্তি প্রবল হয়"। লেখক এর পর নিজের লেখার সমর্থন করে বলতে চেয়েছেন যে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে রক্তমাংসের মানুষের মত উপস্থিত করতে গেলে সেই মানুষটির জীবনের সব কটি দিক কেন দেখানো হবে না ?

আলোচ্য উপন্যাসের লেখকের বক্তব্যের শেষ অংশটুকুর বেশ গুরুত্ব আছে, এই অংশটুকুর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন "আমার উপন্যাসে হরিশ যে সমস্ত কথা বলেছেন বা যে সব জায়গায় যাচ্ছেন সে সবই কাল্পনিক। এরকম কোন বিবরণ ইতিহাসে নেই ঠিকই। হরিশের পূর্ণাঙ্গ কোন জীবনীও আজ পর্যন্ত কেউ লেখেননি। ইতিহাসের টুকরো টুকরো উপাদান থেকে হরিশের কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-ছবিটি আমার মনে গড়ে উঠেছে, তারই প্রতিফলন হচ্ছে এই উপন্যাস। আমাদের দেশের ইতিহাসের

* ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়— পি ৩২, সি. আই. টি. স্কীম ৬ এম, কাল—৫৪)

সেই সময়টিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য" ।* একটি বহুপঠিত জনপ্রিয় উপন্যাসে হরিশ্চন্দ্রের মদ্যাসক্তি ও বারাঙ্গনা গৃহগমনের উল্লেখ বড়ই বেদনাদায়ক। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে হরিশের এই পরিচয়ের পরিণামও বিষময় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। আলোচনা যতই অপ্রিয় হ'ক না কেন এর মীমাংসা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য লেখকের প্রধান দুই সাক্ষী রামগোপাল সান্যাল ও শিবনাথ শাস্ত্রী। রামগোপাল হরিশ্চন্দ্রকে চিনতেন না, হরিশের মৃত্যুর প্রায় দুই যুগ পরে গত শতাব্দীর অষ্টম দশকের মাঝামাঝি (আঃ ১৮৮৫) তিনি কলকাতায় আসেন। অনেকের নিকট খোঁজ খবর নিয়ে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হরিশের একটি ক্ষুদ্র জীবনী লেখেন, পরে ক্ষুদ্রতম একটি ইংরাজীতে লেখা জীবনী তার 'বেঙ্গল সেলি ব্রিটিজ' বই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটিতেই ঔপন্যাসিক উদ্ধৃত "Other vices" শব্দ দুটি আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে হরিশের আলাপ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। হরিশের মৃত্যুর বহু পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রামতনু লাহিড়ী ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

রামগোপাল সান্যাল ব্রাহ্মনেতা রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও স্বনামধন্য ব্রাহ্ম আচার্য। এঁদের বর্ণিত মদ্যপান ব্যতীত বা "নিন্দিত আমোদ" গুলি বাস্তবে ছিল প্রথম যৌবনেই হরিশের ধূমপান অভ্যাস ও নাচ গানে আসক্তি।

পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তদানীন্তন কলকাতার অন্যতম ধনী ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্রের শোক প্রশমনের জন্য এঁদের কারো কারো বাড়িতে নাচ গানের আসরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত। হরিশ্চন্দ্র যাত্রা থিয়েটার ও নাচ গান ভাল বাসতেন বলে জানা যায়। সম্ভবতঃ বাঈজীদের নাচের আসরেও তিনি এই সময়ে উপস্থিত থেকেছেন। তখনও তিনি সদ্যযুবক। খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও হিন্দু-পেট্রিয়ট আত্মপ্রকাশ করেনি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতা অথবা হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার পূর্ব যুগেই হরিশের পক্ষে নাচের আসর উপভোগ করা সম্ভব ছিল না। প্রথম জীবনে যাত্রা থিয়েটার দেখা বা বাঈজী নাচের আসরে উপস্থিতিই ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন রামগোপাল বর্ণিত 'other vices.' ব্রাহ্মাচার্য শিবনাথের কাছে এই গুলিই ছিল 'নিন্দিত আমোদ'। এই নিন্দিত আমোদ অথবা 'other vices'-এর উল্লেখ থেকেই আমাদের আলোচ্য

* দেশ, ২২শে মার্চ, ১৯৮০.

ঔপন্যাসিক হরিশ্চন্দ্রের বারাঙ্গনা-প্রিয়তা ও মাতলামির সূত্র খুঁজে পেয়েছেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ঔপন্যাসিকের উদ্দাম কল্পনা এক্ষেত্রে তার সীমা লঙ্ঘন করেছে। একজন সাধারণ লেখক হলে তাঁর রচনার আপত্তিকর অংশগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করা যেত। লেখক লব্ধ প্রতিষ্ঠ, তাঁর উপন্যাসও বহুপঠিত। সেইজন্য এর প্রতিবাদ করা যে কোন হরিশ-অনুরাগী তথা সত্যানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ঔপন্যাসিক, তা তিনি যত প্রতিপত্তিশালীই হোন না কেন, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে যা খুসী তাই বলবার অধিকার তাঁ' থাকে না; সাহিত্য জগতে এটাই স্বীকৃত রীতি।

তৎকালে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। 'মহর্ষি' অভিধায় ভূষিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক সময় মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, পরে তিনি এই অভ্যাস ত্যাগ করেন, তবে মধ্যে মধ্যে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে পরিমিত ব্যাণ্ডি 'সেবন' করতেন। ঋষি খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র মদ্যপান করতেন। তাঁদের কেউ মদ্যপ বা মাতালরূপে চিত্রিত করতে সাহস পায়নি। হরিশ্চন্দ্রের অকলঙ্ক চরিত্রে মদ্যাসক্তি যে কলঙ্ক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে মদ্যপানের ফলেই যে হরিশের মৃত্যু হয়েছিল একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মদ্যপায়ীরা সচরাচর যকৃতের পীড়ায় মারা যায়। হরিশ ক্ষয়কাশ (Pthisis) রোগে মারা যান। নীলবিদ্রোহ কালে অনিয়মিত আহার নিদ্রা ও বিশ্রামের অভাবই তাঁর মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হরিশ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এতেও তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল। শরীর সুস্থ হওয়ার আগেই তিনি নীল বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথমে দৈনিক 'ঘুষ ঘুষে জ্বর' হতে থাকে, পরে এটি যক্ষ্মা রোগে পরিণত হয়।

হরিশের মদ্যাসক্তি সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। হরিশ মদ্যাসক্তি কাটাতে পারতেন না বলে লজ্জিত বোধ করতেন। কিন্তু দ্রুত উপচীয়মান জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত করে হিন্দু-পেট্রিয়টের কাজে লাগাতে তাঁর মদ্যপানের প্রয়োজন হত।

প্রকাশ্যভাবে যখন তখন কেউ কখনো তাঁকে মদ্যপান করতে দেখেনি। মদ খেয়ে তাঁর কোন অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সামান্যমাত্র ইঙ্গিতও কোথাও পাওয়া যায় না। মদ্যপান যে একটি কুঅভ্যাস এবং সমাজ জীবনে এটা প্রশ্রয় যোগ্য নয় এটা হরিশ্চন্দ্র খুব ভালই জানতেন। তখনকার দিনে ইয়ং বেঙ্গলের এই কদঅভ্যাস তাঁকে পীড়িত করত। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' নামক বাংলা বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তা থেকে মদ্যপান সম্পর্কে তাঁর কি বিরূপতা ছিল তা' প্রকাশ পেয়েছে (হিঃ পেঃ ৪. ৬. ১৮৫৯)। হিন্দু-প্যাট্রিয়টে এ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধও লেখেন—এটির মর্ম হল এই "মদ্যাসক্তি সমাজে চিরকাল নিন্দিত,

নতুনভাবে এসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মদ্যপানের ফলে মানুষ কতই না অন্যায় করে থাকে। মদ্যপানের পর ঘোর অশিক্ষিত ব্যক্তিও মনে কষ্ট পায়। শিক্ষিত লোকের ত' কথাই নেই। মনের উপর এর প্রতিক্রিয়া খুবই অশুভ হয়ে থাকে। অনেক সময় মদ্যপান থেকে আত্মহত্যারও প্রেরণা এসে থাকে। 'ইয়ং বেঙ্গল' এই মদ্যপান প্রবণতার জন্য এখন সমাজে কুখ্যাতি অর্জন করেছে কারণ এরা প্রকাশ্যে মদ্যপান ও মাতলামি করতে লজ্জা বোধ করেন না। ("The vice of drunkerness has been declaimed against from the beginning of society, and we have no new arguments to bring against it. There are few offences man can commit which procure so little enjoyment and leave such acute remorse behind. The most ignorant, and veriest boor, feels it and the suffering of the educated man is proportionately greater. As an incentive to crime it has few equals among other motives (to take up a very low ground) drunkerness offers no profit no temporal benefit. Intoxication is a punishment in itself, and leaves behind it others, the acutest of their kind ……such wicked things are sometimes done under influence of intoxication that many feel strongly inclined to commit suicide to escape the constant bitterness of feeling, which is kept up by the recollection of these deeds. Would they often think, it were in their power to erase them from the tablet of their memory. Young Bengal is now a turn of decision. It is applied to those of our young men, who openly eat and drink in public places, and are nor ashamed of getting drunk.' (Vices of young Bengal. 1—1 HP. 5.12.60)

হরিশ্চন্দ্র যদি অসচ্চরিত্র প্রকৃতির মানুষ হতেন তবে কি তাঁর পক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পূতচরিত্র শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন হওয়া সম্ভব হত? যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে হরিশ্চন্দ্র নিয়মিত ধর্মোপদেশ দিতেন এবং তিনি যে সমাজের সম্পাদক ছিলেন সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যাতায়াত করতেন, এটি তাঁরই প্রভাবে তাঁর ভক্তদের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। যদি হরিশ্চন্দ্র বাস্তবে মাতাল ও লম্পট হতেন তা হলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সংশ্রব দূষিত এই ব্রাহ্মসমাজ কি ত্যাগ করতেন না? তাঁকে কি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে উঠার সুযোগ দেওয়া হত? আলোচ্য উপন্যাস লেখক এই কথাগুলি ভেবে দেখবেন ও তাঁর উপন্যাসটি সেই ভাবে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন এই অনুরোধ করা যেতে পারে। সেই সময়ের ব্যবসায়িক সাফল্য ও পুরস্কার প্রাপ্তিতে উৎসাহিত হয়ে একজন অধ্যাপক-লেখক হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে বেশ একটি রসালো উপন্যাস ফেঁদেছেন, একটি মাসিকপত্রে এটি প্রকাশিত হচ্ছিল। এতে হরিশের বেশ্যাগৃহে ও শুঁড়িখানায় প্রবেশ দেখানো হয়েছে। হরিশের দুর্ভাগ্য তাঁর মৃত্যুর ১২৫ বৎসর পরেও তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে সন্দেহ নেই।

৪

হিন্দু পেট্রিয়টের সূচনা ও ক্রমবিকাশ।

হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকার নামটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। হরিশ্চন্দ্রের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু-পেট্রিয়টের' নাম মনে আসে। আবার 'হিন্দু-পেট্রিয়টের' নাম মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের নামটি মনে আসে। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকাটির জন্যই মাত্র আট বৎসর কালের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের খ্যাতি সমস্ত ভারতে ছড়িয়েছিল, এমন কি ইউরোপ মহাদেশের শিক্ষিত সমাজেও তাঁর নাম পরিচিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, আধুনিক কালে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে হরিশ্চন্দ্রকে হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই সব বইএ গিরিশ্চন্দ্র ঘোষকে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতার গৌরব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে যাঁরা ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরা হাতের কাছে যে সব মুদ্রিত গ্রন্থ পেয়েছেন, সেইগুলিই ব্যবহার করেছেন, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সংবাদপত্র সাময়িকপত্রাদির ফাইল খুবই দুষ্প্রাপ্য।* হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্তে গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা রূপে উল্লেখিত হওয়ার কারণ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত গিরিশ্চন্দ্র ঘোষের একটি জীবনী (Life of Grishchandra Ghose—The founder and first editor of the Hindu-Patriot and the Bengalee)। এই বইটিতে লেখকের নাম নেই—গিরিশ্চন্দ্রকে চিনতেন এমন একজন ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের লেখক রূপে ঘোষণা করা হয়েছে (By one who knew him)। তবে এই বইটি যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁর নাম আছে। ইনি গিরিশ্চন্দ্রের পৌত্র মন্মথনাথ ঘোষ (Edited by his grandson Manmathanath Ghose)। মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮৪-১৯৫৯) একজন সুদক্ষ জীবনীলেখক ছিলেন। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালী মনীষীর জীবনচরিত রচনা করে যশস্বী

History of Press in India (P. 5), London 1967,
The Indian Press—Mrs. M Barnes.
History of Indian Journalism—J. Natarajan. New Delhi—1955.

হয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলি তাঁর উত্তর-কালের গবেষকদের কাছে বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। গিরিশচন্দ্রের এই ইংরাজী জীবনীটির রচয়িতাও (one who knew him) স্বয়ং মন্মথনাথ। সম্প্রতি তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকেই এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পৌত্রের লেখা পিতামহের জীবনীর প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণে পাঠকের মনে যে সন্দেহ জাগতে পারে সে সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ অবহিত ছিলেন। মনে হয় সে জন্যই তিনি 'ওয়ান হু নিউ হিম' নামের আড়ালে আত্মগোপন করে পিতামহ গিরিশচন্দ্রকে হিন্দু-পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক রূপে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন। ইংরাজীতে লেখা মন্মথনাথ সম্পাদিত গিরিশ জীবনীটি যে সুপ্রচারিত হয়েছিল তার বেশ প্রমাণ আছে। কলকাতার ও মফঃস্বল বাঙলার অধিকাংশ প্রাচীন পাঠাগারে এই বইটি সুলভ। এই বইটির কল্যাণেই হরিশ্চন্দ্র হিন্দী-পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং তৎপরিবর্তে গিরিশচন্দ্রকে এই গৌরব দান করা হয়েছে। এই ভ্রান্ত তথ্যটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে, সেই হিসেবে হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা আবশ্যক।

উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীর ঘোষ পরিবারের তিন সুশিক্ষিত ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ, শ্রীনাথ ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের গভীর অন্তরঙ্গতার কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ভ্রাতৃগণ পরিচালিত 'বেঙ্গল-রেকর্ডার' পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন একথাও বলা হয়েছে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বৎসর দুই চলার পর 'বেঙ্গল রেকর্ডার' সম্পাদক শ্রীনাথ একটি ভাল সরকারী চাকুরি পেয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদপত্রের মৃত্যু হয়। ঠিক এই সময়েই চার্টার য়্যাক্টের পুনর্নবীকরণের সময় আসন্ন হয়ে এসেছিল। এই সময় দেশবাসীর পক্ষ থেকে পুরাতন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলি নূতন চার্টার য়্যাক্ট থেকে অপসৃত করা এবং উন্নততর ব্যবস্থার দাবী উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেশের শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়েছিল। এসোসিয়েশন এই আন্দোলনেও নেমেছিল। দেশের এই পরিস্থিতিতে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের এক ধনী ব্যবসায়ী মধুসূদন রায়ের মনে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা জেগে উঠেছিল। মধুসূদন তাঁর এক আত্মীয়ের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি প্রেস কিনেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই আত্মীয় এই প্রেস চালাতে অসম্মত হন। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলে প্রেসটি চালু থাকবে এবং এই কাগজের মাধ্যমে দেশের সেবাও করা যাবে ;এই ভেবে মধুসূদন সিমুলিয়ার ঘোষ ভ্রাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঘোষ ভ্রাতাদের 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকা প্রকাশ এবং তার

অবলুপ্তির কাহিনী সম্ভবতঃ মধুসূদনের জানা ছিল। ইংরাজীনবীশ রূপে ঘোষ ভ্রাতাদের খ্যাতি-তাঁর কানেও উঠেছিল। মধুসূদন রায় সম্ভবতঃ সুবর্ণবনিক সমাজভুক্ত ছিলেন। এই সমাজের মানুষদের বদান্যতা ও শিক্ষানুরাগের খ্যাতি আছে। সম্ভবতঃ ধনী ব্যবসায়ী মধুসূদন খুব উচ্চশিক্ষিত না হলেও মোটামুটি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার অভাব থাকলে তিনি কখনই একটি ইংরাজী সংবাদপত্র নিজের খরচে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতেন না। মধুসূদন যে একটি ইংরাজী পত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে ছিলেন এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব নিতে সর্বপ্রথম ঘোষ ভ্রাতাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। এর পরবর্তী ঘটনাগুলির বিবরণ পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিশ ঘোষ জীবনীতে যে ভাবে দেওয়া হয়েছে তার সারমর্ম হল মধুসূদনের অর্থব্যয়ে যে কাগজ বেরবে তার দায়িত্ব নিতে ঘোষ ভ্রাতারা সম্মত হন। এই আলোচনা কালে হরিশ্চন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন, কারণ তিনি একরকম ঘোষ পরিবারেরই একজন বলে গণ্য হতেন। ক্ষেত্রনাথ ঘোষ (বড় ভাই) প্রস্তাব করেন কাগজের নাম হবে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'। আরও ঠিক হয় কাগজের সম্পাদক হবেন গিরিশ ঘোষ। হরিশকে একটি ছোট পদ অর্থাৎ টুকিটাকি সংবাদ লেখকের মত একটি পদ দেওয়া হয়েছিল। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর বেঙ্গল রেকর্ডারের সব কর্মীদের হিন্দু পেট্রিয়টে বদলী করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রটিই নবকলেবর নিয়ে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' রূপে গিরিশ ঘোষের সম্পাদনায় আবির্ভূত হয়।*

গিরিশ জীবনীর এই বিবরণ আষাঢ়ে গল্পকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। বেঙ্গল রেকর্ডারের নিজস্ব প্রেস ছিল না। কষাইটোলার একটি প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। শ্রীনাথ ও গিরিশ কোনরকমে কাগজ চালাতেন, এর 'স্টাফ' বা 'সাজ-সরঞ্জাম' হিন্দু-পেট্রিয়টে বদলী করে দেওয়ার মত ছিলই না। হিন্দু-পেট্রিয়ট ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এর পরিকল্পনা বা প্রাথমিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। এই সময় গিরিশের বয়স ২৪ পূর্ণ হয়নি। গিরিশ অত্যন্ত নম্র, শান্ত ও বিনয়ী প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্ম-খ্যাপন বা আত্ম-প্রচার বিমুখ গিরিশ তাঁর কৃতবিদ্য দুই অগ্রজ ক্ষেত্রনাথ ও শ্রীনাথকে ডিঙিয়ে যে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক রূপে সকলের মাথার উপরে বসতে রাজী হয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। দুই অগ্রজকে উপেক্ষা করে তিনি সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলেন এটা মেনে নেওয়া গেলেও একথা কখনই মেনে

* **Life of Grish Chandra Ghose**
by one who knew him Ed. by M. N, Ghose, Calcutta (P,p—79-32)

নেওয়া যায় না যে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে উপেক্ষা করার মত ধৃষ্টতা দেখাতে পেরেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র গিরিশ থেকে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের বড় ছিলেন, তিনি ছিলেন ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সমবয়সী। কর্মক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্র গিরিশের শুধু ঊর্দ্ধতন কর্মচারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন গিরিশের মুরুব্বি। নিজের পদোন্নতি মাত্রই গিরিশকে তিনি নিজের পরিত্যক্ত পদে বসিয়ে দিতেন। হরিশের মাধ্যমেই গিরিশের কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মদক্ষতার কথা অ্যাপসের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাত। ব্যক্তি জীবনে গিরিশ ছিলেন হরিশের পরম অনুগত ও একান্ত স্নেহভাজন। হরিশের অলৌকিক প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার কাহিনী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বাঙালী সমাজে সুবিদিত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজে নবাব্রুণের মহিমায় আবির্ভূত হরিশ্চন্দ্রের উপযুক্ততা অগ্রাহ্য করে গিরিশ 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন একথা একান্ত অবিশ্বাস্য। জীবনীকার লিখেছেন যে তৎকালে হরিশকে একটা ছোট পদে রাখা হয়েছিল (in those days he was assigned a sub-ordinate post)। সুজন ও সুশিক্ষিত ঘোষ ভ্রাতৃগণ হরিশ্চন্দ্রকে তাঁদের অধস্তন হিসেবে ব্যবহার করার মত ধৃষ্টতা সম্পন্ন ছিলেন একথাও অকল্পনীয়।

হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্ম বিবরণ দেওয়ার উপযুক্ত পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্রনাথ, শ্রীনাথ, গিরিশ এবং হরিশ্চন্দ্রের লিখিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, চারজনই এবিষয়ে নীরব থেকেছেন। পঞ্চম ব্যক্তি, যাঁর ছাপাখানায় এবং যাঁর অর্থানুকূল্যে হিন্দু-পেট্রিয়টের আবির্ভাব হয় তিনি মধুসূদন রায়। এ সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষ্য একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর অতি কৃতিত্বের সঙ্গে ৭ বৎসর 'বেঙ্গলী' নামীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনার পর গিরিশচন্দ্র মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। গিরিশ জীবনীতে তাঁকে বেঙ্গলী পত্রের প্রথম সম্পাদক বলা হয়েছে, এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। তবে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। গিরিশের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়টের তদানীন্তন সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল গিরিশের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। গিরিশের বিভিন্ন গুণাবলী ও কৃতিত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণদাস হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্ম বৃত্তান্তও এইভাবে বর্ণনা করেন—দেশীয় নেতৃবৃন্দ যখন চার্টারের বিষয়ে আন্দোলন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন তখন মধুসূদন রায় নামে সুবর্ণবণিকসমাজ ভুক্ত (of banker caste) এক উৎসাহী ভদ্রলোক হিন্দু পেট্রিয়ট নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘোষ ভ্রাতৃগণের পরিচয় ছিল। এই জন্য এই ভদ্রলোক ঘোষ ভ্রাতৃগণকে তাঁর পরিকল্পিত কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ

জানান। এই ভদ্রলোকের মুখ থেকেই আমরা শুনেছি যে হরিশ্চন্দ্রের কথামত এই কাগজের নামকরণ হয় 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' এবং তাঁকেই সর্বপ্রথম এই কাগজ সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (He, M. S. Roy, was acquainted with the Ghose brothers and invited them to take its editorial management. We have the authority of the gentleman for stating that it was Harish who gave the paper name 'Hindu Patriot' and was elected its first responsible editor)

"আমাদের পক্ষ থেকে এটা বলা নিষ্প্রোয়োজন যে হরিশের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধি প্রাখর্য দুর্লভ যুক্তিপরায়ণতা, এবং দেশীয় রাজনীতি জ্ঞানের সমাবেশ থাকায়, তৎকালে দেশীয় সমাজের রাজনৈতিক মুখপত্র স্বরূপ একটি পত্রিকার প্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার তিনি উপযুক্ততম পাত্র ছিলেন। গিরিশ প্রথম থেকে এই কাগজের মধ্যে দিয়ে তাঁর বন্ধু হরিশের যে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ পাচ্ছিল তা সশ্রদ্ধভাবে এবং সানন্দে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন এবং প্রসন্ন মনে তাঁর নির্দেশমত এই পত্রিকার সেবা করেছিলেন।' ('Grish Chandra who watched with interest and admiration the rapid development of his friend's intetellect cheerfully served under him—'Grish Chandra Ghose, H. P.-dated-27-9 1869.) কৃষ্ণদাস পালের উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর সম্ভবতঃ ঘোষ পরিবারের উদ্যোগে 'ন্যাশনেল পেপার' নামক সাপ্তাহিকে এর একটি বেনামী প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।* এই প্রতিবাদটি 'বেঙ্গলী' কাগজে উদ্ধৃত করা হয় (৯. ১০ ১৮৬৮), এতে বলা হয় যে-"মধুসূদন রায়ের সঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রবর্তনের সম্পর্ক ছিল বটে তবে তিনি ভুলে গিয়েছেন যে এই পত্রিকা প্রকাশের সময় এই পত্রিকা পরিচালনের ব্যাপারে হরিশের স্থান খুব নীচে ছিল (Harish Chandra held a very subordinate position in the management of the paper)। এতে বলা হয় যে হরিশ হিন্দু-পেট্রিয়টে যোগদানের আগেই গিরিশ হিন্দু-পেট্রিয়ট নামটি ঠিক করেন ("The name of the journal was wholly Grish's coinage and it was sometime before Harish joined").

"যাঁরা হিন্দু পেট্রিয়টের পত্রের প্রথম দিকের ইতিহাস জানেন তাঁদের জানা আছে যে হরিশ দীর্ঘকাল হিন্দু পেট্রিয়টে 'আজ্ঞাবহ' হিসেবে ফরমায়েস খাটতেন। (Those who know anything of the circumstance connected with the early growth of the Patriot must remember that Harish was for long time a mere subaltern) অলৌকিক

---

* ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় এই ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কাগজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রতিভাশালী ও খ্যাতিমান হরিশ্চন্দ্রের মত আত্মমর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজেদের আজ্ঞাধীন রেখে (Subordinate or subaltern.) তাঁকে দিয়ে বিনা বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়ার মত সাহস, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা দেখাবার মত মানুষ যে ঘোষ ভ্রাতৃগণ ছিলেন না, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করার বিষয় যে ন্যাশনেল পেপারে এই পত্র বা সংবাদ লেখকের নাম ছিল না, গিরিশ জীবনী লেখকের মতই নিজের নাম ঘোষণার সাহস এই লেখকেরও হয় নি। যাই হোক, এই পত্র বেঙ্গলীতে প্রকাশিত হওয়ার পর দিনই হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম স্বত্বধিকারী মধুসূদন রায় হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশের জন্য একটি পত্র পাঠান। চিঠির তারিখ ১০. ১০ ১৮৬৯। চিঠিটি হিন্দু পেট্রিয়টে পরদিন প্রকাশিত হয়। পত্রটির মর্ম এইরূপ-"হিন্দু-পেট্রিয়েটের প্রথম সম্পাদক কে এই নিয়ে পরস্পর-বিরোধী সংবাদ বের হতে দেখা যাচ্ছে। আমি এই পত্রের প্রথম স্বত্বাধিকারী। কাগজ বের করার পরিকল্পনাও আমার ছিল। আমি প্রথমে এই কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের জন্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলাম। উনি তাঁর বন্ধু হরিশ্চন্দ্রই যে এই সম্পাদক পদের উপযুক্ত ব্যক্তি একথা আমাকে জানান। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে তিনি (গিরিশবাবু) দীর্ঘকাল ধরে পত্রিকার ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র আমার অনুরোধ রক্ষা করে হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই পত্রিকার নামকরণও করেছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথম মালিক হিসেবে আমার স্বাত থেকে প্রকাশ্য ভাবে ও সাধারণ ভাবে আমি এই তথ্য ঘোষণা করছি। আমি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ। আমার বিশ্বাস তিনি জীবিত থাকলে তিনিই সবাগ্রে আমার এই ঘোষণা সমর্থন করে হরিশ্চন্দ্রকেই হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথমসম্পাদকের সম্মান দিতেন। কারণ এ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। আমার পক্ষে এটা বলা নিরর্থক যে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে আমার স্মরণে আছে। যাঁরা বলছেন যে আমি এর পূর্ব ইতিহাস ভুলে গিয়েছি, তাঁরা শুধু নিজের মনকে প্রবোধিত করছেন—মধুসূদন রায় (১০ ১১. ১৮৬৯)"
("Sir, As some contradictory statements have been put forth regarding the first editorship of H.P., I, as the first proprietor of that paper beg to state that project was originally conceived by me and applied first to the late Babu Grish Ch. Ghose for his editorial management, but he recommended me to his friend Babu Harish Chandra though I must thankfully acknowledge that he long co-operated with him. Babu Harish Chandra gladly accepted my offer and became it's editor, and also gave

the name 'Hindu Patriot' to the paper. It is due to memory of the first Hindu Patriot proprietor to state this fact openly and broadly, for though I am a great admirer of late Babu G. C. Ghosh. I think that if he were living to day he would have been first to join with me in giving Harish the credit which was eminently due to him. It is needless for me to state that I have a distinct recollection of the history of establishment of the Patriot and those who assert that I have forgotten the fact make gratuitous assumption"—Madhusoodan Roy, 10th Oct, 1869 (Pub. in H. P of Oct 11, 1869.)

গিরিশের মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর পূর্বোক্ত গিরিশ জীবনীতে (১৯১১) আর একবার গিরিশকে হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা হয়। প্রতিবাদ করতে পারেন সমসাময়িক কালের এমন কোন ব্যক্তি এসময় জীবিত না থাকায় এই বিকৃত তথ্যটিই একালের ঐতিহাসিকেরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। এর ফলে মন্দভাগ্য হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদকের মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এই অসত্য প্রচারের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁরা হরিশ-অন্তপ্রাণ গিরিশের স্মৃতির প্রতিও অবিচার করেছেন। গত শতাব্দীর সাংবাদিকতা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে গিরিশের নামটি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে, হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন না এটা প্রমাণিত হলেও তাঁর কোন মর্যাদাহানি হতে পারে না, কারণ তিনি নিজ মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন। পূর্বোক্ত গিরিশ জীবনীতে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রে তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা আছে, এতে দেখা যায় যে তিনি ১৮৫৪ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত এ পত্রিকায় মোট ৭৬টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা ২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্ধ সংখ্যা শূন্য। গিরিশচন্দ্র যদি পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক হতেন তবে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলির উল্লেখ পূর্বোক্ত গিরিশজীবনীতে নেই কেন ? হিন্দু পেট্রিয়ট, সাপ্তাহিক হিসেবে বৎসরে ৫২টি সংখ্যা প্রকাশ করত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্তত ৫২টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বের হয়েছিল ; এই বৎসর গিরিশের নামে ২০টি প্রবন্ধ চিহ্নিত হয়েছে, এগুলি সবই প্রবন্ধ মাত্র, সম্পাদকীয় নয়। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক ছিলেন না, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী শনিবার কলকাতা বড়বাজার অঞ্চলের কলাকার নামে একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে অবস্থিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রেস থেকে

হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদনায় ইংরাজী সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আকার ছিল ১৫"×১০" পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল।০ মাসিক চাঁদা ১টাকা, বার্ষিক চাঁদা ১২। পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল-"যথাযথ ভাবে ও সাহসের সঙ্গে দেশের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের পক্ষে হানিকর বিষয়গুলির নিরপেক্ষ ভাবে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।" ("a fair and manly advocacy of the interests of the country and an impartial exposition of the social and political evils with which she is now afflicted",*

'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রবর্তনের ব্যাপারে ঘোষ ভ্রাতৃগণ, বিশেষত গিরিশচন্দ্র যে প্রভূত সহায়তা করেন, এটা সর্বাংশে সত্য। প্রথম দিকে এই পত্রিকার ব্যাপারে তাঁরা প্রচুর ভাবে উৎসাহিত ছিলেন। তবে পত্রিকা প্রকাশের তিন চার মাসের মধ্যেই তাঁদের এই উৎসাহ হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে এই পত্রিকা পরিচালনার সব দায় দায়িত্বই হরিশের স্কন্ধে এসে পড়েছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিশের জীবনের শেষ চার বৎসর কাল তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। দুই জনেরই সংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরু ছিলেন হরিশচন্দ্র, দুজনেই হিন্দু-পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উত্তর কালে কৃষ্ণদাস পালের মতই শম্ভুচন্দ্র সাংবাদিক রূপে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। শম্ভুচন্দ্রের মতে ঘোষ ভ্রাতৃগণ হিন্দু পেট্রিয়ট প্রবর্তনের ৩।৪ মাসের মধ্যেই হিন্দু পেট্রিয়টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তখন কাগজ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হরিশকে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন রায় বলেছেন যে হরিশ প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে পেট্রিয়ট আপিসে এসে বসতেন (প্রেসটিও এখানেই ছিল)। একাসনে বসে তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন, পরে ইউরোপ থেকে পাওয়া সংবাদিগুলির সংক্ষিপ্তসার ও দেশীয় সংবাদগুলি লিখে ফেলতেন। সমস্ত কাজ সেরে তিনি শেষ রাত্রে বাড়ি ফিরতেন।•

হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশ কালে বঙ্গদেশে দেশীয় পরিচালিত একমাত্র সংবাদপত্র ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার'। সমগ্র ভারতে 'হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সিয়ার' ব্যতীত দেশীয় পরিচালিত আর দুটি মাত্র ইংরাজী সংবাদ পত্র ছিল মাদ্রাজ রাইজিং স্টার Madrs Rising Star ও হিন্দু-হারবিঙ্গার (Hindu Harbinger)। শেষোক্তটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হত। কাশীপ্রসাদ ঘোষের ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত 'হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সিয়ার' বাঙালী পরিচালিত প্রথম ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রূপে একটি গৌরবজনক

স্থানের অধিকারী। হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রকাশের সময় এর বয়স ছিল সাত বৎসর, সেদিক থেকে এটি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত তবে হিন্দু-ইন্টেলিজেন্সিয়ার কাগজটি নব-জাগ্রত বাঙালী সমাজের আশাআকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে নি। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র ও ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করে সুখ্যাতি অর্জনকারী কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিন্তু বেশ রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা নিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর পত্রিকায় রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের মত সমর্থন করতেন। দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা তার কাগজে স্থান পেত তবে তিনি শাসক গোষ্ঠির সমালোচনা করতে ভয় পেতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন যখন আসন্ন তখন দেশবাসির আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দান করতে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' কাগজের আবির্ভাব খুবই প্রয়োজন ছিল।

'হিন্দু-পেট্রিয়ট' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তবে তার প্রচার সংখ্যা খুব সীমিত ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প ছিল।

তখনকার দিনে কলকাতা শহর থেকে ইংলিশম্যান (দৈনিক), বেঙ্গল হরকরা (দৈনিক), ফিনিকস, এম্পায়ার প্রভৃতি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, এছাড়া ছিল 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (সাপ্তাহিক), শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হলেও এটিও একরকম কলকাতার কাগজই ছিল। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজ উপরোক্ত কাগজগুলিই পছন্দ করতেন, কাজেই 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' আশানুরূপ প্রচার লাভ করতে পারে নি। বড়বাজারের এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে থেকে পেট্রিয়টের উন্নতি সম্ভব নয় দেখে কিছুদিন পর কাগজের আপিস ১৩৬নং রাধা বাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হয়। হরিশের আপিস ছিল কয়লা ঘাট স্ট্রীটে। রাধাবাজারে হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রেস ও আপিস উঠে আসায় হরিশের কাজের সুবিধা হয়। তবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রেসটি ১৭নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটে আবার স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। এই বৎসরেই আগষ্ট মাসে হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রেস ৬০নং কসাইটোলায় উঠে আসে (বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট অঞ্চল) ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত হিন্দু-পেট্রিয়ট এই ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলার পর ও হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রচার সংখ্যা দুই শতের অধিক হয় নি। যদিও এটি সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাঙালী শিক্ষিত সমাজের বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইউরোপীয় পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি এই দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবকেও সুনজরে দেখে নি। আড়াই বৎসর ধরে কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিয়ে পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারীর ধৈর্যচ্যুতি

ঘটেছিল। তিনি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রটি তুলে দিয়ে প্রেসটি বিক্রয় করে দেবার চেষ্টা করেন। আড়াই বৎসর ধরে হরিশ্চন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় একাই 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা পরিচালন করেন, মধ্যে মধ্যে গিরিশ ঘোষের মত অনুগত বন্ধুরা কিছু কিছু প্রবন্ধ দিতেন। বাকী সব লেখা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি কাজ নিজের আপিস এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ শেষ করে হরিশকেই করতে হত। হিন্দু-পেট্রিয়টের মাধ্যমে দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের যে একক চেষ্টা হরিশচন্দ্র চালিয়ে ছিলেন তা যে নিষ্ফল হয় নি, তার লক্ষণও পাওয়া গিয়েছিল। নিজের হাতে গড়া 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' কাগজ উঠে যাবে এই চিন্তা হরিশের পক্ষে অসহনীয় বোধ হয়েছিল। এই সময় হরিশ্চন্দ্রের কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছিল। কোনমতে ভবানীপুর পল্লীর চাউলপটি রোডে তিনি একটি বাড়ি তৈরী করে তাঁর চিরদুঃখিনী পরাশ্রিতা জননীকে সর্বপ্রথম স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতে সংসার পরিচালনার ভার দিয়ে হরিশ নিজের আপিস, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও হিন্দু-পেট্রিয়টের কাজ করতেন। উপরি অবসরটুকু, পড়াশুনা ও সজ্জন সঙ্গমে কেটে যেত। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের কল্যাণে এই সময় গৃহে কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল। হরিশ এই টাকা দিয়ে মধুসূদনের কাছে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বত্ব ও প্রেস কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। মধুসূদন এতে সম্মত হন। সম্ভবতঃ মধুসূদন হরিশের সামর্থ্য অনুযায়ী টাকার বিনিময়েই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রেস ও কাগজের স্বত্ব হস্তান্তর করেছিলেন। মধুসূদন অর্থগৃধ্নু হলে হরিশের মত আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে প্রেস ও কাগজের স্বত্ব ক্রয় সম্ভব হত না। আড়াই বৎসর কাল হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্য হরিশের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও লোক-চরিত্র-জ্ঞান সম্পন্ন মধুসূদনের মনে নিশ্চয়ই তাঁর সম্বন্ধে একটা বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছিল। মধুসূদন এই শ্রদ্ধারও মূল্য দিয়েছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র নিজে সরকারী কর্মচারী হিসেবে কোন প্রেস বা কোনরকম ব্যবসা করার অধিকারী ছিলেন না। তৎকালে কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সংবাদ পত্রে রচনা প্রকাশ করা বা সম্পাদনা বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সংবাদ পত্রের সঙ্গে সংশ্রব ও রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। এই সময় বাঙলার লেঃ গভর্ণর ছিলেন স্যার জন ক্যাম্বেল (Sir George Campbell) এই নিষেধাজ্ঞার প্রথম শিকার হয়েছিলেন স্টেটসম্যান পত্রের প্রথম সম্পাদক, স্বাধীনচেতা ইংরাজ সন্তান রবার্ট নাইট (Robert Knight); রবার্ট নাইট সরকারী কর্মপরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত সংবাদ পত্র সম্পাদনার পথই বেছে নিয়েছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারানচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের নামে হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকার স্বত্ব ও প্রেস ক্রয় করেন। হরিশের অর্জিত অর্থে কেনা হলেও হারানচন্দ্র শুধু নামে এর মালিক ছিলেন না, কাজেও তিনি মালিক ছিলেন। অকৃতী এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হরিশ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, তাঁর সংসারে মায়ের পরেই ছিল হারানের স্থান। মধুসূদনের মালিকানায় হিন্দু-পেট্রিয়টের শেষ সংখ্যা (৩য় খণ্ড, ২২ সংখ্যা) ৬০নং কসাই টোলা থেকে ১৮৫৫খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে প্রকাশিত হয়। নূতন ব্যবস্থায় পেট্রিয়টের প্রথম সংখ্যা (৩য় খণ্ড, ২৩ সংখ্যা) ভবানীপুরের সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী প্রেসে মুদ্রিত হয়ে ৭জুন (১৮৫৫) বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়। এতে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে যথাক্রমে উমেশচন্দ্র মিত্র ও শ্যামাচরণ সরকারের নাম ছিল। সম্ভবতঃ হিন্দু-পেট্রিয়ট, ও প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র প্রেসটি ভবানীপুরে স্থানান্তরিত করতে পারেন নি, তাঁর নিজের বাড়ি বেশ ছোট ছিল সেখানে প্রেস স্থাপন সম্ভব ছিল না। সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার তিনি অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন, সেই জন্যই সাময়িকভাবে ঐ প্রেস থেকেই কাগজটি তিনি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন পরে তিনি তাঁর নিজের বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়ি 'লিজ' নিয়ে সেখানে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট্' প্রেস স্থাপন করেন। এই বাড়িটি সদর দেওয়ানী আদালতের দক্ষিণ দিকে কালীঘাটের দিকে যাওয়ার রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বাসভবনও এই বাড়ির নিকটে অবস্থিত ছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই হিন্দু-পেট্রিয়ট, ভবানীপুরস্থ তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা থেকে মুদ্রাকর হিসাবে শ্যামাচরণ সরকার ও প্রকাশক হিসেবে রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য প্রেসের লাইসেন্স হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামেই ছিল। তৎকালে কোন সংবাদপত্রেই সম্পাদকের নাম ঘোষণার প্রথা ছিল না।

স্বত্বাধিকার পরিবর্তনের পর হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথম সংখ্যা (৩য় খণ্ড, ২৩ সংখ্যা) ভবানীপুর থেকে সর্বপ্রথম ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭জুন বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয় একথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন থেকে এই পত্রের স্বত্বাধিকারী এবং এখন থেকে পত্রিকার বিষয় সংক্রান্ত সব কিছু চিঠি পত্র তাঁর কাছে প্রেরিতব্য।

হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়ার পর হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে মধুসূদন রায়ের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। "The interest and responsibility of Baboo Madhusoodan Roy of Calcutta as Proprietor. Manager of the Hindoo Patriot News-Paper was transferred on the 1st inst. to Baboo Haran Chander-

Association, as our readers are already aware, have moved the Governor-general to take into consideration amongst other matters connected with the formation of the new council, the propriety of its debates with open doors and of allowing parties considering themselves likely to be injured by any proposed law, to appear at its bar in person or by agent to show reasons against the enactment of such law. His lordship reserved these matters for the council itself......the chief defect in a legislature constituted like the one which is now to give laws to the people in India is its total exclusion of popular element. No amount of local knowledge which may be possessed by individual members of the council can serve in the place of these lights which the discussions of a popular assembly alone can throw upon a subjcet. The want may, however, be partially met by the expositions of counsel at the bar. The practice of allowing such expositions to be made prevails in. most of the dependencies of Great Britain. having a local legislature of their own. and we can conceive of no rational objection to its adoption by the legislature of India"—The new legislative council. H.P, May 25, 1854,

কিছুদিন পর হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে (জুন ২৯, ১৮৫৪) লেখেন যে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরকে কাউন্সিলের সচিব (clerk assistant) নিযুক্ত করা উচিত, কারণ ইনি সদস্যদের নিকট প্রস্তাবিত বিষয়গুলি ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। হিন্দু-পেট্রিয়টের পরামর্শ অনুযায়ী ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দেই প্রসন্নকুমার প্রস্তাবিত পদে নিযুক্ত হন। "clerk assistant" এই বাক্য দুটির clerk শব্দটি 'করণিক' এর সমার্থক ছিল না, ব্যবস্থাপক সভা প্রসঙ্গে এটি একটি পারি-ভাষিক শব্দ। প্রস্তাবিত আইনের 'মুসাবিদা' এই পদাধিকারীর দায়িত্ব ছিল। প্রসন্নকুমার পরবর্তী কালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও মনোনীত হয়েছিলেন।

সরকারি পুলিশ বাহিনী কর্তৃক জনসাধারণের উৎপীড়নের কাহিনী হিন্দু পেট্রিয়টে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পেত। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫জুন হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে শিশুদের বাদ দিয়ে যে কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষেরই সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, ঔদ্ধত্য, জুলুম ও নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রেণীর সরকারি

কর্মচারী থেকে নিম্নতম পদের পুলিশ চৌকিদার পর্যন্ত এই দোষে দোষী। এদেশে পুলিশের অত্যাচার কাহিনী এত ব্যাপক যে তা' কারও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।—

["The oppression of the Police is so universal that to be ignorant of its existence appears to us a simple impossibility]

বর্তমানে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে আমাদের আশঙ্কা এই যে অপরাধ নিরোধ ব্যবস্থার দিকে জোর না দিয়ে শুধু অপরাধী ধরার ব্যবস্থায় কোনও কাজ হবে না।

[The present state of things we fear can not be sufficiently improved so long as the preposterous system continues of attending more to the detection of crime after it is committed than to the prevention of it.]

এই বক্তব্যের জের টেনে পরে লেখা হয় যে যাদেব উপর আমাদের প্রাণ ও ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত তাদের এমন হতে হবে যেন তাদের উপর আমরা ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে পারি, এদের প্রকৃতি যেন এমন না হয় যাতে মানুষ তাদের অত্যাচারী মনে করে তাদের এড়িয়ে চলে। ...কোনও দেশেই সাধারণ ভাবে পুলিশের মধ্যে নৈতিকতার মান উঁচু নয় তথাপি আমরা একথা বলতে বাধ্য যে বঙ্গদেশে পুলিশের নীতিবোধ সব থেকে কম।

প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে ধীরে ধীরে কিছু উন্নতি এসেছে, ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন হয়েছে কিন্তু সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি (পুলিশ) ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আমলে যেমন অকর্মণ্য ছিল এখনও তাই রয়ে গিয়েছে।

["The tone of morality in the Police of every Country is generally low, but in Bengal, we are forced to acknowledge it is the lowest. Whilst every department of the administration has been progressively improved and its abuses weeded out, this most important branch continues in almost the same state of inefficiency that it was in the days of Clive and Hastings "] Torture by the Police in Bengal. (H. P. Dt. 28. 6. 1955)

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় হরিশচন্দ্র প্রথম থেকেই সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি লেখেন যে, সব সমাজে দুটি শ্রেণী আছে—অত্যাচারিত ও অত্যাচারী। শিক্ষিত মানুষের উচিত অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করা (HP, 10. 5. 1855. ; 3.4. 1856) ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুলাই "English Strike and Bengalee Dharmaghat" নামীয় একটি প্রবন্ধে ইংলণ্ডে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ কি ভাবে

শিল্পপতিদের দ্বারা শোষিত হয় তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তাদের প্রতি স্যায়বান মানুষের সহানুভূতির প্রয়োজন আছে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সময় বাংলার কৃষকদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে এখানে সেখানে 'ধর্মঘট' বা চাষ বন্ধ আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছিল। ইংলণ্ডে এবং ভারতে 'স্ট্রাইক' ও 'ধর্মঘট' কে একই ধরণের বিক্ষোভ রূপে চিহ্নিত করে হরিশচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে এই সামাজিক বিপর্যয় রোধে উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে না, তাদের এই অনাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা উচিত। পরবর্তী কালে নীল বিদ্রোহ চলার সময় হরিশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লেখেন যে 'Uncle Tom's Cabin (H.B. Stowe)' গ্রন্থে আমেরিকায় নিগ্রো দাস ব্যবসায়ীদের যে নিষ্ঠুরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেটা জ্ঞানীগুণী উচ্চশ্রেণীর মানুষকে দাস ব্যবসায় উচ্ছেদে অনুপ্রাণিত করেছিল, ঠিক এমনি ভাবে বাঙলার উচ্চশ্রেণীর মানুষদের নীলকর অত্যাচার দমনে এগিয়ে আসা উচিত (HP.-25. 2. 1860)। হরিশচন্দ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের আমদানি রপ্তানি নীতিরও তীব্র সমালোচনা করে ছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেন যে ভারতবাসীর জীবন ধারনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় চাল, চিনি, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্য বিলেতে রপ্তানি করে মদ প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য এদেশে আমদানি করা হয়। অল্পবিত্ত জনসাধারণ তাদের উৎপন্ন বস্তু ভোগ করতে পায় না। আমদানি করার জন্য যে সব বস্তু আসে তার মুনাফা থেকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ধনস্ফীতি হয়, সাধারণ মানুষের বা দেশের কোনও উপকার হয় না (H.P.-17.5.58)

হরিশচন্দ্র দেশের সামাজিক সমস্যাগুলিকেও উপেক্ষা করেন নি। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ নিয়ে তিনি পেট্রিয়টে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করে একটি পুস্তক প্রচার করেন। পরবর্তী জুলাই মাসে আর একটি অনুরূপ পুস্তক প্রচারিত হয়।*

হরিশচন্দ্র এই পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিন্দু-পেট্রিয়টে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য শুধু হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার দানই নয়, তিনি চেয়েছেন এর পথে যে সব বাধা আছে তারও উচ্ছেদ সাধন (HP. 17. 6. 1956) ইতিপূর্বেই দুই সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদনের ভিত্তিতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি বিল প্রণীত হয়ে সেটি কাউন্সিলে উত্থাপিত করা হয়। এই আবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ও ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

* এই পুস্তকটির একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র এই পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের অনুরোধে অনুবাদ করেন।

মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র এবিষয়ে জনমত গঠনের সহায়তা করেন। সরকারকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন মূলক বিল উত্থাপনের জন্যেও তিনি লেখনী ধারণ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত বিলটি জন সাধারণের অবগতির জন্যে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ মুদ্রিত হয়। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে লিখেছিলেন যে হিন্দু বিবাহ প্রথার সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা ন্যায় ও নীতি সম্মত নয়। হিন্দু আইন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একই প্রকার প্রথা থাকত। বস্তুত তা দেখা যায় না। হিন্দুদের মধ্যেই এক এক অঞ্চলে এক ভিন্ন ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা বা সামাজিক প্রথা বর্তমান। বিবাহ একটি সামাজিক প্রথা (Civil Law), সুতরাং সামাজিক প্রথা প্রবর্তন ধর্ম বিরোধী এই যুক্তি যারা দেখাচ্ছেন তারা ভ্রান্ত—["The bill in fact proposed to make an alteration in the civil law of the country, and should boldly ahow that intent, reading its justification on the undoubted right of every section of the people to have the law so modified as, without injuring others, may forward their innocent objects of life. The Re-marriage of Hindoo Widows, HP. (31. 11. 1856).] এই বিলের মর্ম প্রচারিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত সংস্কারেব বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। এতে বলা হয় যে প্রস্তাবটি হিন্দু আইনের পরিপন্থী, পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এই আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা ভারত সরকারের নেই এবং এই আইন অগ্রহনীয়। হরিশ্চন্দ্র প্রতিপক্ষের এই যুক্তিই খণ্ডন করে গভর্ণমেণ্টের উপর এই বলে দোষারোপ করেন যে বিলটি এতদূর এগিয়ে আনার পর নূতন ভাবে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। জনমতের উপর নির্ভরতা দেখাতে গেলে আগেই জনমত সংগ্রহ উচিত ছিল। প্রতিবাদিগণ কয়েক সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত যে আবেদন পেশ করেন তার উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, দুজন জমিদার যতলোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন বিধবা বিবাহ যাঁরা প্রবর্তনে ইচ্ছুক তাঁরা সহস্র গুণ অধিক বিধবা বিবাহ সমর্থকের স্বাক্ষর উপস্থিত করতে সক্ষম। দেশে এমন একটি পরিবারও মিলবে না যে পরিবারে অকাল বৈধব্য সংসারের সকল সুখ শান্তি হরণ করে নেয়নি [···There are few families of any standing in the land which do not suffer, grieveously suffer, under the cruel restriction which is sought to be removed by the bill" The Hindoo Widow Remarriage Bill, H.P. (1. 5. 1856).]

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই বিধবা বিবাহ বৈধ এই

মত্ম একটি আইন গৃহীত হয়। এটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ ধারা নামে পরিচিত। এই আইনে বিধবার গর্ভজাত পুত্র তার জন্মদাতা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ২৩ অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬) বিদ্যাসাগর সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী শ্রীমতী কালীমতী দেবী বর্দ্ধমানের পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। দ্বিতীয় বিধবা বিবাহটিও ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রের নাম মধুসূদন ঘোষ (কুলীন কায়স্থ) পাত্রী ঠনঠনিয়া নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের কন্যা থাকমনি। এই দুইটি বিবাহের সংবাদ ঘোষণা করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করে ছিলেন যে বিরুদ্ধ পক্ষীয় লোকদের মনে এই আশা ছিল যে বিধবা বিবাহ আইন 'পাশ' হলেও সমাজ এই আইনকে প্রশ্রয় দেবে না, কোনও বিধবাকেই কেউ বিয়ে করতে চাইবে না, কিন্তু এদের এই আশায় ছাই পড়েছে। তিনি আরও লেখেন যে দেশবাসীর এই প্রথাকে মেনে নেওয়া উচিত। ভণ্ড সমাজপতিগণ হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ হয়ে গেল এই আর্তনাদ না তুলে সমাজের নৈতিক উন্নতির জন্য এই প্রথার সমর্থনে এগিয়ে আসুন। ["It remains now for the country to cease waiting fancied dangers to which the over-Hinduism is freshly exposed, and to turn their anxiety towards interests of genuine social morality." Remarriage of Hindoo Widows (11. 12. 56).]

বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুইটি পুস্তিকাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার কল্যাণে বহু বিবাহ যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত তা দেখিয়ে দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এই কৌলিন্য প্রথার জন্য এক বৃদ্ধ কুলীন বহু অপ্রাপ্ত বয়স্কার পাণিগ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁর দেহান্তরের সঙ্গে অসংখ্য শিশু ও বালিকা স্ত্রীকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রহিতকরণের জন্যেও আন্দোলন শুরু করেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত দুটি পুস্তক যথক্রমে ১৮৭১ মার্চ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বহু বিবাহ রহিতকরণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রও যোগদান করেন। হরিশ্চন্দ্র নিজে বহুপত্নীক দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতার সন্তান ছিলেন। তাঁর ছয় মাস বয়সের সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর অভাগিনী মাতার অদৃষ্টে কখনও পতিগৃহ বাসের সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর মাতামহীর পিতার গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল, মাতামহীও কুলীন পত্নী ছিলেন। এই সব কারণেও হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে নিজে এই প্রথার বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন। বহু বিবাহ রহিতকরণের সপক্ষে ও কৌলিন্য প্রথার দোষ এই বিষয়টি নিয়ে তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্যামাচরণ সরকারের (১৮১৪-১৮৮২)

একাধিক প্রবন্ধও হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন। এই সব আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বহু বিবাহ রহিতকরণের জন্ত একটি আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একাধিক আবেদনপত্র গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। এই আবেদন প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ সজ্ঘটিত হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে বিব্রত গভর্ণমেণ্ট এই আবেদন অনুসারে আইন প্রণয়নে কোনও উদ্যোগ নিতে পারেননি। সিপাহী বিদ্রোহের কারণে জনসাধারণের কল্যাণমূলক সকল কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে যখন বহু বিবাহ রহিতকরণ আইন বিধিবদ্ধ হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা আমাদের ব্যবস্থাপকদের মনে নিষ্ক্রিয়তা এনে দিল।

["The Widow's Marriage act is an instance to prove the advanced position which the legislature had taken in respect of social measures. A law to restrain polygamy was on the tapis and merely awaited a few formalities to have effective penal force throughout the country. Other abominations like...... All these have gained a long lease of existence......but to draw out and destroy evils that are eating into the very core of social morals and happiness, our legislators have become—owing to the mutinies alone—utterly powerless. H.P. (31, 12, 1857)]

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট'এর পত্নী লেডি আমহার্ষ্টে'র পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ রায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে বিশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। মিশনারী পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা কম ছিল না, তবে এই সব ছাত্রীরা প্রায় ছিল দরিদ্র দেশীয় খ্রীষ্টান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু-কন্যা। মিশনারী পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয় এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপযোগী হতে পারে না। এই সত্যটি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ভারত সরকারের তদানীন্তন আইন সচিব ও সরকারী শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ভারতবন্ধু জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (Sir J. E. Drinkwater Bethune)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালি প্রধানদের সহযোগিতায় উত্তর কলকাতায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর এই বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের সরকারি পরিদর্শক রূপে ঈশ্বরচন্দ্র হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় অল্পদিনের মধ্যেই ৩০টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা বেথুন

পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তি তিনি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে দান করে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'বেথুন স্কুল' রাখা হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা করা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহু সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক মাত্রই তাঁর পরিবারের মেয়েরা যে শিক্ষিত নন সে বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে তাঁরা কোনও সক্রিয় সহযোগিতা করেন না। এক সময়ে সরকারি স্তরে বয়স্কা মহিলাদের বাড়িতে শিক্ষিকা পাঠিয়ে তাদের শিক্ষিতা করার একটা পরিকল্পনা করা হয়। হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কোনও হিন্দু গৃহে খ্রীষ্টান শিক্ষিকা পাঠিয়ে গৃহিনীদের শিক্ষাদান সম্ভব নয়, বিশেষ করে শিক্ষিকাকে যখন বেতন দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে এই সব অসম্ভব পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই বাস্তবোচিত। ["...instead of losing much valuable time in idle discussions and airy schemings, use the resources already at our disposal and give a practical turn to our speculations. The Bethune School was instituted to forward the views of the most hearty of Hindoo female education and we are at a loss to account for the lamentable indifference which educated natives manifest towards that institution. We have had personal experience of the amazing progress made by some of the girls brought up at the school and we have not the least doubt but that under proper encouragement from the Caste classes of the metropolis it may become the instrument of a high order of education to our females. If, therefore, native gentlemen who are now apparently lost in a labyrinth of doubts and perplexities as to what is likely most efficiently to educate the females of the country, and those of our European friends who are floundering in the same labyrinth, will for once follow our advice and reducing their speculative energies into active energies transfer them to the support of the Bethune School, they will find that the object of their search lies much nearer than the bottom of well ! Hindoo Female Education (28. 8. 1856)]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন হরিশ্চন্দ্র পতিতা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে একমাত্র কলকাতা শহরেই তৎকালে প্রায় ১৩,০০০ জন পতিতার বাস ছিল। যে সামাজিক ব্যবস্থা পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে সেই সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকে হরিশ্চন্দ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্রের নিজস্ব চিন্তা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এটা তিনি মনে করতেন না। তিনি লিখতেন যে স্কুল, কলেজ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তার সুফল জনসাধারণের কাছে খুব কমই পৌঁছেছে। দেশে কি ঘটেছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে, দেশের মানুষকে সে সম্বন্ধে অজ্ঞই রেখে দেওয়া হয়। উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকে তা তাদের চরিত্রকে উন্নত করে না, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা যে কোনও অনৈতিক কাজ করতে পারে, যার ফলে অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষ অশেষ কষ্টের শিকার হয়। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে জনমত যাতে জাগ্রত না হতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারি কর্মকর্তাদের আধিপত্য ও অত্যাচার অব্যাহত রাখা সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ["The principles consist in preventing the formation of a national opinion of public affairs :—the object is the establishment of official irres-possibility and the social supremacy of the official class" H. P. (19. 3. 57)]

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি মনে করতেন যে ভারতের সব ভাষাগুলির জননী সংস্কৃত ভাষার চর্চা উপেক্ষিত হচ্ছে। একটি মাত্র সংস্কৃত কলেজেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। তিনি মনে করতেন যে বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিতের সংখ্যা লোপ পাচ্ছে, এরা পাণ্ডিত্যের জন্য এক কালে সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এদের স্থান অধিকার করেছে মর্কট পণ্ডিতের দল। এদের যেমন সংস্কৃত জ্ঞান তেমনি ইংরাজীর জ্ঞান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি লেখেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা সংস্কৃতকে যেন 'ডিগ্রী' লাভের জন্য অবশ্য পাঠ্য করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি সংস্কৃত অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্যও তিনি হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রবন্ধ লেখেন। মাতৃভাষার পঠন পাঠনের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত এটাও হরিশ্চন্দ্রের অভিমত ছিল। তাঁর মন্তব্য এই ছিল যে, আমলাতন্ত্র মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে নীতি অনুসরণ করে তা' নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজন অনুসারে! এর বেশি তারা অগ্রসর হতে চায়না। [National Education—HP 19.3.1857].

হরিশ্চন্দ্র স্বপ্ন দেখতেন যে ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হয়ে উঠবে, তার সভ্যতা হবে অতুলনীয়। পৃথিবীর উত্তুঙ্গতম পর্বত তার

উত্তরে, বাকী তিন দিকে সমুদ্র। নিয়তি একটা বিরাট রাষ্ট্ররূপে তার অভ্যুদয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।......কতকগুলি দুষ্ট মানুষ এতে বাধা দিচ্ছে বটে, তবে সে আসবেই। ["Surer is it that India will one day be the seat of power and a civilization such as other parts of the world may rival but not surpass.

"Bounded on the north by the mountains highest on the globe, on all others by wave, in some places as high as the mountain itself, India appears to be destined by providence to be seat of an Empire of one great people. The wickedness of man has to this day operated against the fulfilment of the will, but it has only deferred the day."]

নানা ভাষা ও বহু প্রদেশে বিভক্ত ভারতভূমির উপর যে নূতন ভারতরাষ্ট্র সগৌরবে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী ভারতীয়দের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন হবে। এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ প্রেমিক ও জনসেবকদের কাছে হরিশ্চন্দ্র এই অনুরোধ জানান যে প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য যে একটি সাধারণ ভাষা প্রয়োজন সেটা তাঁরা গড়ে তুলুন। ["The work of patriots and philanthropic statesman therefore lies clear. They should join in supplying for India a much needed want...They should give her a language"—The necessity of a language for India Quoted by N. C. Sengupta. O. P. cit P XIII. Addenda]

হরিশ্চন্দ্র মাতৃভাষা বাংলার প্রতিও বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলা ভাষায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর হিন্দু-পেট্রিয়ট সম্পাদনার সময়সীমাকালে যে সব বাংলা বই প্রকাশিত হ'ত তার সমালোচনা হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত হত। মনে হয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে হরিশের গভীর বন্ধুত্বের অন্যতম উৎস ছিল মধুসূদনের কবি-প্রতিভা। হরিশ্চন্দ্র বাংলা সংবাদপত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। প্রতিষ্ঠিত কোন বাংলা সাময়িকপত্রের মানের অবনতি দেখলে তিনি মনে দুঃখ পেতেন। তিনি মনে করতেন যে দেশীয় ব্যক্তি পরিচালিত বিশেষ ভাবে দেশীভাষায় প্রচলিত সংবাদ পত্রগুলির সংখ্যা ও প্রচার বৃদ্ধি না পেলে আমাদের উন্নত শাসন ব্যবস্থার দাবিগুলি জোরদার হতে পারবে না। ["Unless native press is fortified in number and in intelligence, little will avail for us to advance our claims for better government" H.P. (7.2.1859)]

হরিশ্চন্দ্রের চিন্তায় ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড মাত্র ছিল না। দেশের সমস্যাগুলিকে তিনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মন্তব্য প্রকাশ করতেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রবর্তনের শুরু থেকেই তৎকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আলোচনাও পেট্রিয়টে স্থান পেত। তৎকালীন রুশ সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তার লিপ্সা, পারস্য ও চীন দেশের অবস্থা প্রভৃতি তিনি ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেন। তাছাড়া অন্যান্য বিদেশী ও দেশীয় সংবাদ হিন্দু-পেট্রিয়টে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হত। ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারদর ইত্যাদি সংবাদ ও থাকত। তখনকার কালে দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন খুব কমই প্রকাশিত হত। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টকে একটি আধুনিক সংবাদপত্র রূপে গড়ে তোলার পর দেশের দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীরাও হিন্দু-পেট্রিয়টে বিজ্ঞাপন প্রকাশ শুরু করেছিল, প্রায় দেড় কলম বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত। হরিশের প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল, দেশের মানুষের অবস্থা কি এবং তারা কি ভাবছে এটা একজন চিকিৎসক যেভাবে রোগীকে পরীক্ষা করেন সেইভাবে তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং নিজের প্রজ্ঞার সাহায্যে সেই অবস্থার পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে দেশবাসীর এবং শাসক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য কি তার নির্দেশ দিতেন। হরিশের দৃষ্টি নিরপেক্ষ ছিল—হিন্দু-মুসলমান পার্শী খ্রীষ্টান নির্বিশেষে ভারতের যে কোন অংশের মানুষের যে কোন সমস্যা বিশেষভাবে যে কোন ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী তিনি নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করে যেতেন। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা ধীরে ধীরে বিদেশী পরিচালিত কলকাতার ইংলিশ ম্যান, বেঙ্গল হরকরু, ফিনিক্স ও এম্পায়ার, শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা নিউজ' প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-পেট্রিয়টের অভ্যুদয় এদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। পেট্রিয়টের নির্ভীকতাকে এরা একজন নেটিভের 'ঔদ্ধত্য' বলে বিবেচনা করত। প্রথম থেকেই এরা পেট্রিয়টের শত্রুত সাধনে তৎপর হয়েছিল।

৫০

হিন্দু পেট্রিয়ট ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন ভাগলপুর জেলার 'দামিন ই কো' থেকে বর্তমান বীরভূম জেলা পর্যন্ত সাঁওতাল আদিবাসিদের বাস ছিল। এই অরণ্যচারী আদিবাসিগণ কালক্রমে কৃষিজীবীতে পারণত হয়, কেউ কেউ জমির মালিক হয়। ক্রমবর্দ্ধমান সরকারি খাজনার চাপ, জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণের ফলে সাঁওতালদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কয়েকজন গোষ্ঠী-পতির প্ররোচনায় দামিন কোই থেকে সাঁওতালেরা সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়ে বহু দারোগা ও মহাজনদের হত্যা করেছিল। স্থানীয় ব্যক্তিদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে করতে বীরভূম মুর্শিদাবাদের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। সাঁওতাল দের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ছিল অত্যাচারী জোতদার, মহাজন ও দারোগা হত্যা। মহাজনেরা সাঁওতালদের অসময়ে টাকা ধার দিয়ে শতকরা প্রায় ষাট টাকা সুদ নিত। সাঁওতালদের উপদ্রব শান্ত করতে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করতে হয়। সাঁওতালদের আক্রমণে বহু ব্রিটিশ সৈন্ত প্রাণ হারায়। অবশেষে সরকার পক্ষ থেকে সামরিক আইন জারী করা হয়। এই হাঙ্গামায় বিদ্রোহের নেতা সিধু ও কানুকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। পনের থেকে পঁচিশ সহস্র সাঁওতাল বিদ্রোহী এই বিদ্রোহে নিহত হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন বলবৎ ছিল।*

সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ কলকাতায় পৌছানোর পর ইউরোপীয় সংবাদ পত্রগুলি সরকারকে কঠোরতম বল প্রয়োগ দ্বারা এই সাঁওতালদের ধ্বংস করার জন্য উত্তেজিত করেছিল। এই সময়ে সাঁওতালেরা বহু দেশীয় মহাজন, জোতদার ও জমিদারদের হত্যা করে গ্রাম লুণ্ঠন করতে করতে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর-

* সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :
 Santal Insurrection—K. K. Dutta, Calcutta-1940
 Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter 1868
 সাঁওতাল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ—গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৩৮১

হচ্ছিল। হরিশ্চন্দ্র দরিদ্র সাঁওতালদের দেশবাসী বলেই ভাবতেন। যদিও তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অনেকেই এই বিদ্রোহী সাঁওতালদের প্রতি একটি বিজাতীয় ঘৃণা মনে মনে পোষণ করতেন, কারণ সাঁওতালদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি হিন্দু জোতদার, জমিদার ও মহাজন। এদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে এরা যুদ্ধে নেমেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ যে অর্থ নৈতিক শোষণ এই সত্যটি হরিশ্চন্দ্র সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই হিন্দু-পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন—"শান্তিপ্রিয় ও সৎ স্বভাবযুক্ত এই সাঁওতাল জাতি যে এইভাবে বিদ্রোহ করেছে তার যথেষ্ট কারণ আছে।····· শোনা গিয়েছে যে এদের জোর করে রেলপথ তৈরির কাজে খাটানো হয়েছে, এদের ক্ষোভের আর একটা কারণ এদের মেয়েদের সতীত্ব হানি। সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা এদের কাছ থেকে বল পূর্বক আদায় করা হয়েছে। এই ধরণের অভিযোগগুলি যে স্থানীয় শাসকদের অজ্ঞাত ছিল তা নয়, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে, এখন বিদ্রোহ জেগে উঠায় এদের হুঁস এসেছে।·····নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা অনুমোদন যোগ্য আমরা আশা করব যে কমিশনার মিঃ বিড্‌ওয়েল যা দেখেছেন বা বিশ্বাস করেন তা যথার্থ ভাবে জানাবার মত সৎ সাহসের পরিচয় দেবেন। আমরা এই আশা করব যে যাদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও অমার্জনীয় নিষ্ঠুরতার আঘাতে একটি শান্তিপ্রিয় জাতিকে বিদ্রোহী করে তোলার জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি এদেরই প্রাপ্য, বিদ্রোহীদের নয়। ··· সাঁওতালেরা তাদের 'ঠাকুরদের' (নেতাদের) রাজা বানাতে এই বিদ্রোহ করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজেদের বনজঙ্গল ও উপত্যকার মধ্যেই এদের চিন্তাধরা সীমাবদ্ধ, এরা রাজত্ব লাভের কথা ভাবে না। এরা শুধু চায় অরণ্যভূমি ও উপত্যকার মধ্যে থেকে গৃহ-সুখ, দাম্পত্য-জীবন যাপন, ও ইচ্ছামত পরিশ্রম। এরা যা চায় না তা হল খাজনা আদায়কারীদের জুলুম এবং জমিদার এবং ইউরোপীয় দুর্বৃত্তদের অত্যাচার। ডিসরেলীর 'সিবিল' উপন্যাসে বর্ণিত খনি শ্রমিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে এই সাঁওতাল হাঙ্গামার তুলনা করা যেতে পারে, এটা তার বেশী কিছু নয়। অত্যাচার এদের মনে প্রতিহিংসা স্পৃহা এনে দিয়েছে। মর্ম বিদারী অত্যাচারের ঘটনাগুলিই এদের মনে স্বাধীনতা অর্জনের একটা অস্পষ্ট ধারনার জন্ম অবশ্য দিয়ে থাকতে পারে—["They (the santhls) are however described by all who know them to be peacable and honest race, and they must have been driven to the present insurrection by substantial injuries . . It is stated that compulsory labour has been exacted of the santhals, but what seems to have exacted

their patience is the violation of their women ..The exaction of oppresive rent also forms an item in the list of their grievances. It appears that the existence of this cause of complaint was known to the local authorities, but was treated with indifference by them until the movement became general......The insurrection no doubt, will be quelled in a few days, we may all most say, hours. It will then be the duty of govt to enquire fully into the motives and causes which led to the rising. We are glad that Mr. Bidwell, the commissioner of the Nuddeah Divn. has proceeded to the spot. A perfectly impartial investigation and report cannot in such cases be hoped for from officials connected with the district. We hope Mr. Bidwell will boldly speak out all that he may learn and come to believe as true and that punishment may be awarded rather to those who drove, by repeated and unforgivable injuries, a simple race to insurrection than those who can hardly be held moral agents, in this lamentable affair. It is a misuse of terms to call the rising a rebellion. The santhals have no more idea of making their thakoors the sovereign of their hills and judges than they have of installing them in the premiership of England. Their intellectuals like thier physical vision does not extend beyond their woods and valleys. What they want is that they may enjoy them and their homes, their wives and the freedom of labouring as they choose, without let or hindrance from revenue officials, land lords and European black guards. We can liken this movement to nothing so much as the rising the miners described in D'ysraelis' splendid novel of "Sybil". Oppression is the cause, revenge and motive, and object of the insurrection a vague undefined idea of freedom from sorely felt annoyances. H. P.—19.7.1855]

সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুডের একটি প্রতিবেদন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে দুজন সাঁওতাল নেতা সাঁওতালদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তারা সাঁওতালদের দেবতার কাছথেকে এই আদেশ পেয়েছে

যে ব্রিটিশদের যেন এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরা সাঁওতালদের তাদের অধীনে সংগ্রাম করতে প্ররোচিত করেছিল। সাঁওতালদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে খাজনা কমে যাবে এবং ঋণ শোধ করতে হবে না, তাছাড়া আরও অনেক সুযোগ সুবিধা তারা পাবে। মিঃ টুগুডের এই প্রতিবেদনের সমালোচনা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বিদ্রোহের যে কারণ মিঃ টুগুড্ দেখিয়েছেন, তা আংশিক সত্য হতে পারে, তবে সবটাই ঠিক নয়। তিনি লেখেন যে উচ্চাভিলাষী নেতাদের প্ররোচনায় শান্তিপ্রিয় সাঁওতালেরা একটা উন্মাদনার শিকার হয়েছিল এটা সম্ভব কিন্তু শুধু মাত্র কতকগুলি প্রলোভনের মোহে তারা বিদ্রোহ করেছিল এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, এর আরও গভীর কারণ থাকা সম্ভব—["Mr. Toogood's account of the origin of the insurrection is evidently incomplete. There is no doubt that the simple race have been led away from their peaceful habits by fanaticism infused into them by ambitious leaders ; but it is impossible to believe that the disposition to join the standard of revolt was created solely by the promise of the benefits enumerated by Mr. Toogood. H.P. (9. 8. 1855)]

এই বৎসরেই নভেম্বর মাসে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করা হয়। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে এই সামরিক আইন জারীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি লেখেন যে ভারত প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজের প্ররোচনাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের সাধারণ আইনই সাঁওতাল হাঙ্গামা দমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন যে আবার একটা সামরিক আইন কেন ? আমাদের সৈন্য বাহিনীর কর্তারা ত এমনিতেই সাঁওতাল দেখা মাত্র গুলি করে মারছে, সাঁওতাল গ্রামও জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এই কাজকে পাকাপাকি ভাবে আইন সম্মত করে নেওয়ার জন্যই কি সামরিক আইন জারী জরুরী হয়ে পড়েছে ?

এক্ষেত্রে সামরিক আইন জারী করে যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে সেইটাই যে বে-আইনি হয়েছে হরিশ্চন্দ্র তা দেখিয়ে দেন—["It is evident that the writer of the proclamation laboured under the confusion of ideas drawn from an imperfect knowledge of Bengal Regulation, English Constitutional and Indian Parliamentary law"] হরিশ্চন্দ্র তাঁর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষে লেখেন যে ভারতীয়দের এই আওতায় এনে এই আইন কার্যকর করার ভার ইউরোপীয়দের হাতে দেওয়া হলে এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে—এই প্রসঙ্গে তিনি সিংহল (বর্তমান শ্রীলংকা) এর অন্তর্গত কাণ্ডিতে সামরিক আইন কি ভয়াবহ নৃশংসতায় পরিণত হয়েছিল

তার উল্লেখ করেন। ["All of us can recollect the abuses of rampant military power which a few years ago followed by proclamation of Martial law in Kandy in Ceylon and will admit that measures of this kind tolerated amongst an Indian population and executed by European officers are rife with dangers of the most serious description. The Proclamation of Martial law in the Santhal districts—H.P. (15. 11. 1855)] ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হয়েছিল। পনের থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে প্রাণ হারিয়েছিল। দলপতিদের ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়েছিল। ৬ই মার্চের হিন্দু-পেট্রিয়টে অন্যতম দলনেতার ফাঁসিকাঠে মৃত্যু সংবাদ হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়েছিল—["Kanoo Majhee, the Santhal Chief was executed at his native village Bhoghnondee on 23rd February. He maintained his firmness to the last and said, he will reappear in six years to head another insurrection. There were some fears entertained of rescue, and a strong guard of infantry and cavalry escorted the chief to the place of his execution."]

বিদ্রোহের অবসানে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সাঁওতাল পরগণা জেলা গঠিত হয়েছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় কোন সংবাদপত্রই যখন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায়নি, তখন একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই এই সাঁওতালদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

THE HINDOO PATRIOT

।। হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এর প্রথম পৃষ্ঠা।

৬.

লর্ড ডালহৌসি ও হিন্দু পেট্রিয়ট

হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রকাশ কালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড ডালহৌসি (১৮১২-[illegible])। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তখন এঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৬ বৎসর। লর্ড ওয়েলেসলী অধীনতা মূলক মিত্রতার নীতি উদ্ভাবন করে কয়েকটি দেশীয় 'আশ্রিত' রাজ্যকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিবাজীর এক বংশধর মহারাষ্ট্রের সাতারায় রাজত্ব করতেন, ইনি অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি একজনকে দত্তক নিয়েছিলেন। ডালহৌসি এই দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা দখল করে এটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি ঝাঁসি, নাগপুর, বেরার ও আউধ গ্রাস করে সরাসরি এগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ানেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদন ভার পেয়ে হরিশ্চন্দ্র লর্ড ডালহৌসির এই রাজ্য গ্রাস নীতির (Annexation Policy) কঠোর সমালোচনা শুরু করেন। কোন ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে সর্বশক্তিমান গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসির এই কাজের সমালোচনা তৎকালে কল্পনাতীত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের এই দুঃসাহস সরকারী ও বেসরকারী মহলকে চমকে দিয়েছিল। ডালহৌসির দেশীয় রাজ্য গ্রাস নীতি ভারতবাসীকে ক্ষুব্ধ করেছিল, কিন্তু এই ক্ষোভকে ভাষায় প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। হরিশ্চন্দ্র দেশবাসীর সেই অব্যক্ত বেদনাকে শুধু ভাষায় প্রকাশ করেন নি, তার সঙ্গে, তীব্র প্রতিবাদও ব্যক্ত করেছিলেন। ঝাঁসি অধিকার' (Confiscation of Jhansi) শীর্ষক হিন্দু-পেট্রিয়টের এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন যে বলপূর্বক সন্নিহিত রাজ্যগ্রাসের যে নির্লজ্জ নীতি লর্ড ডালহৌসি গ্রহণ করেছেন তা শয়তানের পক্ষেও লজ্জাজনক। অত্যাচারী রুশ সম্রাট (জার) নিকোলাস তার কাছে হার মানবেন। নাগপুরের ন্যায়সঙ্গত অধিকারীর কাছ থেকে তাঁর দেশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখন আবার দেখা যাচ্ছে একজন সুশিক্ষিত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ (লর্ড ডালহৌসি) ন্যায়, ধর্ম, বিচার শক্তি এবং পূর্বচুক্তি শর্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ঝাঁসি গ্রাস করেছেন। জার নিকোলাস তুরস্ক যাবার পথে একটি ভূখণ্ড অধিকারে উদ্যত..., জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে আক্রান্ত তুরস্কের অধিকার রক্ষার জন্ম শান্তি প্রহরীরূপে ইংলণ্ড ফ্রান্স রুশের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ দিকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল কলমের এক খোঁচায় একটি প্রাচীন রাজবংশের অধিকার লোপ করতে চাইছেন। সমুদ্রের কল-কোলাহলের কারণে অত্যাচারিতের আর্তক্রন্দন সমুদ্র পারের সেই স্বাধীন দেশে (ইংলণ্ডে) পৌছবে না। নাগপুর অধিকার যৎপরোনাস্তি নিন্দনীয়, তবে ঝাঁসি অধিকার আরও ভয়াবহ।..... ["Lord Dalhousi is determined to shame the devil and beat even Nicholas hollow in the matter of forcible appropriatoin of neighbouring states without the shadow of a pretext to clour his grasping policy We have already seen by what a clumsy coup of political legerdemain the autocrat of all the Indies wrested Nagpur from the hands of its rightful Prince, and here is another instance of the enlightened British Statesman flying in the face of justice, law and treaty in order to settle his talons of Jhansi. Tha autocrat of Russia presumed to occupy a road of Turkish ground in the cause —as he maintains—of the religion of which Europe acknwledges the sway and Nemesis of invaved rights roused England and France from the sleep of peace and is sending them forth to battle. But an Indian Governor General is chartered to destroy the dynasties with a scratch of quill and the cry of the injured is smothered in the din of the roaring waters that separate him from the land of liberty. The Nagpur case was a most disgraceful one but that one of Jhansi is shocking. There is no merit in mangling a corpse but to grant life to the life less is an attribute of divinity." (H.P. May 18. 5. 1854)]

ঝাঁসি গ্রাস করার পর ডালহৌসি আউধ রাজ্য গ্রাসের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকেন। তিনি ভারতের শাসনভার পেয়েই লর্ড ওয়েলেসলীর অধীনতা মূলক মিত্রতার নীতি উদ্ভাবন অনুযায়ী যে সব রাজ্য আশ্রিত বলে পরিগণিত ছিল সেগুলি গ্রাস করার জন্য যে নূতন নীতি উদ্ভাবন করলে সেটি স্বত্ব বিলোপ বা চুক্তি ছেদ নীতি (Doctrine of Lapse) নামে আভহিত। এই নূতন নীতি ছিল এই যে কোন দেশীয় রাজ্য শাসকের মৃত্যুর পর তাঁর যদি প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকে (অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি) তবে সেই রাজ্য ব্রিটিশের অধিকারে আসবে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী দত্তক পুত্র ঔরস পুত্রের মতই যে দত্তকগ্রহীতার উত্তরাধিকারের অধিকারী, ডালহৌসি এই প্রথা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এইভাবেই তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে

নাগপুর ও ঝাঁসি দখল করেন। এর আগেই তিনি বেরার হস্তগত করেছিলেন। পূর্বতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে পূর্বতন গভর্ণমেণ্ট বিঠুরের রাজা রূপে মেনে নিয়ে তাঁকে ভাতা ও পেনসন দিত। বাজীরাও এর মৃত্যুর পর ডালহৌসি দ্বিতীয় বাজীরও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের প্রাপ্য পেনসন ও ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেন। আউধ রাজ্য গ্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ডালহৌসি দেখলেন যে তাঁর স্বত্ব বিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) আউধের ক্ষেত্রে খাটে না। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার যুদ্ধে পরাজিত অযোধ্যার নবাব ব্রিটিশ মিত্রতা তথা অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কার্যতঃ অযোধ্যার নবাব নামে মাত্র নবাব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ রেসিডেন্টই ছিলেন প্রকৃত শাসক। ইংলণ্ডের পণ্য সামগ্রী বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের পক্ষে আউধ রাজ্য ছিল ভাল বিক্রয়কেন্দ্র। নিজামের শাসনাধীন বেরার রাজ্যে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হত। ডালহৌসি কর্তৃক বেরার রাজ্য গ্রাসের সেটাই ছিল অন্যতম ব্রিটিশ বণিকস্বার্থ। বেরারের তুলোয় ব্রিটেনে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতে বিক্রির জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আউধ রাজ্যে ব্রিটিশের প্রয়োজন ছিল এই যে সেটা ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র বিক্রির ভাল বাজার। বিনা উত্তরাধিকারী অবস্থায় অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ওয়াজিদ আলি শার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাঁর অনেকগুলি সন্তান ছিল। 'ডক্‌ট্রিন অফ ল্যাপ্স' নীতি কোন দিনই অযোধ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না জেনে ধূর্ত ডালহৌসি এই ধুয়ো তুললেন যে অযোধ্যার নবাবের শাসনে সেখানে লোকের দুঃখ কষ্ট অবর্ণনীয়, ব্রিটিশ তাঁদের আশ্রিত একটি রাজ্যের প্রজাদের এই কষ্ট দেখে বড়ই মর্মাহত। সরকারী সূত্রে এই প্রসঙ্গে ব্যাপক প্রচার চলছিল। হরিশ্চন্দ্র তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলে বুঝেছিলেন যে আউধে শান্তি-শৃঙ্খলা একেবারে নেই, প্রশাসন একেবারে অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত—এই মিথ্যা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আউধ রাজ্য গ্রাস।

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে এই মর্মে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন—"অযোধ্যা সুশাসিত নয় অতএব এর স্বাধীনতা হরণ কর, হায়দ্রাবাদ সুশাসিত নয়, অতএব নিজামকে রাজ্যচ্যুত কর—এই হল ভারতীয় শাসকের নীতি। এইসব ধোঁকাবাজ রাজনীতিক পণ্ডিতদের বলা যেতে পারে যে আপনাদের এই নীতি যদি পৃথিবীব্যাপী অবলম্বিত হত, তবে পৃথিবীতে কোন একটি রাষ্ট্র কি তার পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর হাত থেকে বাঁচতে পারত। কোন একটি রাষ্ট্রে প্রজাদের বড় কষ্ট এই রকম প্রচার চালিয়ে উচ্চাভিলাষী, বিবেকহীন, পরাক্রান্ত রাষ্ট্র যে কোন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গ্রাস করে নিতে পারে। আউধ রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার যে দাবী বা অজুহাত এখন তোলা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক নীতি বিরুদ্ধ। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আউধ রাজ্যের যে চুক্তি-

রয়েছে সেটি গায়ের জোরে নস্যাৎ করে দেওয়া অনৈতিক।......একবার ইটালি দেশীয় একজন মন্ত্রীকে কোন ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে তোমাদের দেশের কোন কোন প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা খুব খারাপ। এর জবাবে ঐ ইটালি দেশীয় ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিলেন যে, 'তোমরা আয়ারল্যাণ্ডকে যে কত সুশাসনের মধ্যে রেখেছ তা আমরা জানি'। আমাদের এই এশীয় মহাদেশে এশিয়ার সব দেশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে যদি একটি সংঘ ও পরিষদ থাকত; অর্থাৎ আমাদের পেছনে যদি একটি সংঘ শক্তি থাকত তবে অযোধ্যা নবাবের পক্ষ থেকে ও সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে তোমরা তোমাদের নিজেদের এলাকায় সুশাসন বজায় রেখেছ কি? [...Oude is misgoverned, therefore annexe Oude, says the Indian Politic. Hydrabad is oppressed, away with the Nizam. But the deluded reasoners little imagine that if the arguments were allowed at full stretch, no kingdom upon earth, would be safe from the aggression of its neighbours, for a hue and cry of misgovernment will ba raised every time that it suits the purpose of the ambitious, unprincipled and powerful to destroy the rights of weak whose misfortune it may be to be the owner of a desirable object...The cry recently raised for the annextion of Oude is as unjustifiable by the general rules of international morality as by the positive engagements in force between the govt (of India) and Oude.... Had there been a comity of nations on the Asiatic Continent, as bold and as just a reply would have been given by Oude darbar to the cry of misgovernment now raised against them.—Annextion versus Enquiry H.P. of Ang. 24, 1854.]

আরও কিছুদিন পর হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে লেখেন যে আউধ রাজ্য গ্রাস করার সব অজুহাত তৈরী হয়ে গিয়েছে। .. অযোধ্যা রাজ্যের অধিবাসীদের উপর খুবই অত্যাচার হয় এই ধরনের বহু তথ্য ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। ...আউধ রাজ্যের ভূস্বামীগণের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা প্রজাগণের উপর নাকি খুব নিপীড়ন করে থাকে। আমরা বলতে চাই যে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র বঙ্গদেশে নীলকর ও জমিদারদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালরা দরিদ্র প্রজাদের উপর যে হামলা করে থাকে তার গুরুত্ব কি কম? অযোধ্যার প্রজাদের চেয়ে বঙ্গীয় প্রজাগণ কি বেশী সুখে শান্তিতে আছে? অযোধ্যা রাজ্যে গুপ্ত হত্যা ও খুন হয়ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশ কি এই উপদ্রব থেকে মুক্ত? খুন জখমের কয়েকটি স্থানীয় ঘটনার উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র আরও লেখেন অযোধ্যা

রাজ্যে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী—অতএব নবাব এরাজ্যকে নিরুপদ্রব রাখতে পারেননি। গভর্ণমেণ্ট এই যুক্তি দেখাচ্ছেন। ডাকাতি ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গদেশে কি কম? অযোধ্যায় যদি ডাকাতি একটি পেশায় পরিণত হয়ে থাকে তবে আমরা বলতে বাধ্য যে ডাকাতি বাঙলা মুলুকেও বেশ অব্যাহত, এটাও অনেকের পেশা হয়ে উঠেছে। পরিশেষে তিনি লেখেন যে এই সব অজুহাতে অযোধ্যা অধিকার হবে ঘোর অন্যায় কাজ। ["Slowly preparations are being made for a grand swoop upon Oudh…The hired lattials of Bengal indigo planters and zamindars of Bengal commit scarcely less flagrant atrocities than the devoted followers of the land holders of Oudh. Assassination and murder are as much the rule in Bengal as in Oudh Dacoity is said to be nominal crime of Bengal. We doubt if in Oudh the professional robber obtains as much room or impunity with his operation as he does in Oudh : .. its annexation will be an act of the most flagrant injustice"—H. P. of Jan 17, 1856.]

সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি একটি ঘোষণা পত্র দ্বারা লর্ড ডালহৌসি আউধ রাজ্যকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন। রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি শা'কে বন্দী করে কলকাতায় নির্বাসিত করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি হরিশ্চন্দ্র এর প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন। অযোধ্যা রাজ্যের স্বাধীনতা হরণের কয়েকদিন পরই ড'লহৌসি গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৮৫৬) তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে লর্ড ডালহৌসির আট বৎসর ব্যাপী রাজ্যকালের সমালোচনা করে হরিশ্চন্দ্র সাত স্তম্ভ ব্যাপী একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল 'মহামহিম ডালহৌসি ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় অবসর জীবন কি করে কাটাবেন'। এই প্রশ্ন তুলে হরিশ্চন্দ্র নিজেই তার উত্তর লেখেন যে, লর্ড বাহাদুর এখন থেকে হয়ত তাঁর বাড়ির আশে পাশে যারা রয়েছে তাদের বাড়ি ঘরগুলি কি ভাবে নিজের ভোগদখলে আনবেন সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন—["and if in his retreat his desire for annexation survive his abdication of his power, the acres of his neighbours will trust afford the accustomed exercise to that best cultivated of his lordship's faculties —H.P. of Feb. 21. 1856]

লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

এছাড়াও ডালহৌসি সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈতপুর ও সম্বলপুর দখল করেন। নিজাম শাসিত বেরার কুক্ষিগত করে অবশেষে ডালহৌসি অযোধ্যা গ্রাস করেন। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বহু পূর্বেই ইংরাজ শাসন পাশে বদ্ধ হয়েছিল—কিন্তু তথাপি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতের বহু অংশে ব্রিটিশ শাসন বদ্ধমূল হয় নি। চোখের সামনে পর পর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি ব্রিটিশের কবলিত হতে দেখে স্বাধীনতা-প্রেমী হরিশ্চন্দ্র প্রাণে বড়ই দুঃখ অনুভব করেছিলেন। তাঁর কাছে স্বদেশ বলতে শুধু বাংলা ছিল না, সমগ্র ভারতকেই তিনি স্বদেশ বলে মনে করতেন। এতদিন ভারতের যে সব অধিবাসী ব্রিটিশের অধীনতা মুক্ত ছিল তারাও যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে এসে গেল তখন হরিশ্চন্দ্র যে তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন, হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসিকে আক্রমণ সেই বেদনারই অভিব্যক্তি ছিল।

ডালহৌসি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি দেশের পূর্ত ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁর সময়েই ভারতে রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ডালহৌসির এইসব কাজ-কর্ম সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসিকে হরিশ্চন্দ্র ক্ষমা করতে পারেন নি। স্বাধীনতা-চ্যুত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৌন ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিবর্ষী লেখনী মুখে হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে পড়েছিল। লর্ড ডালহৌসি হিন্দু-পেট্রিয়টের এই আক্রমণে বিব্রত বোধ করতেন, কারণ হিন্দু-পেট্রিয়ট তত দিনে সাগর পারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষীয়গণ হিন্দু-পেট্রিয়টের অভিমত পার্লামেন্টে তুলে ধরতেন, এতে শাসকদলকে অসুবিধায় ফেলা যেত। লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যা দখলের ঘোষণা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যের অজুহাতে অকস্মাৎ পদত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান, এর পেছনে কি রহস্য ছিল তা জানা যায় না ; এইমাত্র জানা যায় যে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ কিছুদিন আগেই বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হিন্দ-পেট্রিয়টের তীব্র সমালোচনা যে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ডালহৌসির সহসা পদত্যাগ ও ইংলণ্ড প্রস্থানের সঙ্গে এর কিছু যে সম্পর্ক ছিল না একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। সম্ভবত ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ ডালহৌসিকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' (Father of Indian Nationalism) রূপে আখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলি' নামীয় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে লিখেছিলেন যে আউধ রাজ্য গ্রাসের সময়ে হরিশ্চন্দ্রের তীব্র প্রতিবাদ ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষকে এতদূর চিন্তান্বিত করেছিল যে তাঁরা তাঁদের বহু অভ্যস্ত দেশীয় রাজ্যগ্রাস নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ["...his empha-

tic protest against the annexation of Oudh in 1856, which roused the attention of the authorities to that measure and paved the way for a gradual reversal of the policy of annexation formerly so much in vogue.—Bengalee, dated May 29, 1899]

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে লর্ড ডালহৌসি হরিশ্চন্দ্রের মুখ বন্ধ করবার জন্য বাঙলার লেঃ গভর্ণর (ছোটলাট) মি হ্যালিডেকে ডেকে হরিশ্চন্দ্রকে একটি লোভনীয় সরকারী চাকুরি দিতে আদেশ দেন। সম্ভবতঃ তদানীন্তন কালের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যারিস্টার মিঃ মন্ট্রিয়ো (William Austin Montriou) মারফৎ এই প্রস্তাবটি এসেছিল। হরিশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। হরিশ্চন্দ্র যে লোভনীয় চাকুরির ফাঁদে ধরা দেন নি এতে অবশ্য এই স্বাধীনচেতা ইংরেজ ব্যারিস্টার মনে মনে খুশী হয়েছিলেন।

কলকাতা স্মল কজ্ কোর্টের বিচারপতি কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে হরিশের প্রতিবেশী ছিলেন। হরিশের সমসাময়িক এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে মিঃ হ্যালিডে লর্ড ডালহৌসির পরামর্শ মত হরিশ্চন্দ্রকে এক লোভনীয় চাকুরির ফাঁদে বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। *

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি তারিখের হিন্দু-পেট্রিয়টে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বহু ঘোষিত ব্যবস্থাপক সভা ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে সরকার পক্ষ থেকে রাস্তা ঘাট নির্মাণ, মেরামত কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য একটি ঋণ পত্র প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নব প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কাজের সবই গোপনে চালাবার নির্দেশ ছিল; এর গতিবিধি জনগণের জানার অধিকার ছিল না। এর ফলে জনসাধারণের সুবিধার্থে পথ ঘাট নির্মাণ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ভাল ভাল প্রস্তাবগুলি সব বানচাল হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের কাছে ঋণ নিয়ে তাদেরই উপকার করার প্রস্তাবগুলি ছলনা মাত্র। এর দ্বারা বেহিসেবী ব্যয়ে শূন্য রাজকোষের তহবিলই বাড়ানো হয়েছে, জনসাধারণের কোন উপকারই হয় নি। জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের এই তছরূপ বা অপব্যবহার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। ভারত-সরকারের সুনাম এতে বিশেষ ভাবে কলঙ্কিত হয়েছে।……বহুদিন থেকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের যে প্রস্তাব চলছে সেখানে বর্তমানের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিশন বসেছিল, তাতে অনেক নির্মম সত্য প্রকাশিত হয়েছে। এই

* General Biography of Bengal Celebrities—R. G. Sanyal, Calcutta, 1889.

ধরণের নিগ্রহ-মূলক ব্যবস্থাগুলির অবসানের ব্যবস্থা শাসন সংস্কার প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করার দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ......

... সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনা থেকে দেখা গিয়েছে যে সরকারী শাসন ব্যবস্থার গলদ কত। সবচেয়ে পূর্বে অধিকৃত বাঙলা দেশেই শাসন ব্যবস্থার সুরক্ষার অভাব দুঃখের বিষয়। এর প্রতিকার প্রয়োজন।

[..."The Public was soon convinced that the boasted legislation of 1853 was as unsound as its critics and opponents had prophesised it would prove.. One of the first measures of the India-Govt in 1855 was the announcement of its intention to prosecute on a large scale public works of utility towards the facilitation of internal communications and the promotion of agricultural industry and to open a loan in order to enable govt. to undertake the construction of such works untrammelled by the objections of ordinary state expenditure......But the system of secret govt., which was the great defect of the India act of 1853 to have left untouched, manifested its inherent viciousness of the evil results of a measure intrinsically so excellent as the one described. The promotion of public work was a mere pretence to replenish an exchequer improvised by impudent tampering with public credit. The opening of the public works loan of 1855 hence became the signal for a series of criticisms which were completed with a parliamentory condemnation and which have inflicted a permanent damage on the character of the Govt. of India............For a considerable time forward reform in Indian administration must take the character of correction of abuses rather than positive creation of benefecial institutions. The results of the commission appointed in Madras to enquire into the prevalence of torture in that presidency offered an apt illustration of this truth Santhal insurrection in Bengal prove the existence of serious defects both in the govt and the means of protection of the oldest British territorry for neither of these two evils, thus exposed, have adequate remedies been yet brought into application."—Retrospect of 1855, H.P. Jan 3, 1856]

লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পদত্যাগ করার পর এই মাসে ২৯ তারিখে লর্ড ক্যানিং (Charles John Canning) ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে যোগদান করেন। হরিশ্চন্দ্র ক্যানিং-এর কার্যভার গ্রহণ প্রসঙ্গে হিন্দু-পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে লর্ড ক্যানিং এর পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন হবে। তিনি দেখতে পাবেন রাজকোষে অর্থাভাব, সরকারের উপর সাধারণেরও কোন বিশ্বাস নেই। সৈন্যবাহিনী অপর্যাপ্ত। সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন চালাতে সক্ষম 'সিভিল সার্ভিস' এর কোন যোগ্যতা নেই। লক্ষ লক্ষ প্রজার মনে গভীর অসন্তোষ বিরাজমান, নতুন রাজ্যের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁদের মনে সন্দেহ আছে (আউধ প্রভৃতি দেশের প্রজাদের কথা মনে করে এটি লেখা হয়েছে)। গভর্ণমেণ্ট যে তাদের সম্বন্ধে সদিচ্ছাসম্পন্ন এটা লর্ড ক্যানিংকে প্রমাণ করতে হবে। এই সব অঞ্চল থেকে নৈরাজ্যের অবস্থা দূর করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক আইন কানুনগুলির সংস্কার করে তা সন্তোষজনক করতে হবে। কোথাও বিদ্রোহের ভাব থাকলে তা শান্ত করতে হবে। পূর্ববর্তী গভর্ণর জেনারেল যাদের কোন কোন রকম রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিতে অবহেলা করেছেন, তাদের দাবীগুলি মেনে নিতে হবে। ["Lord Canning's position at this outset of his viceregal career is beset with many difficulties. He will find the treasury exhausted—public credit as low as it is possible for the financial credit of the British Government to be, an army unequal to the military and a civil service unequal to the civil necessities of an empire—millions of disaffected subjects to be conciliated to a rule—yet strange to them, millions of discontented citizens to be reassured in their faith in the good intentions of the Government,—political anarchy to be removed from newly annexed states, the neglected interests of domestic legislation to be placed up on a satisfactory footing—actual rebellions to be quelled and demands of the community for an extension of its political privilleges to be met in a spirit that may contrast at least with the superciliousness and positive antipathy of his predecessor."—H. P. dated 6. 3. 1856.]

লর্ড ডালহৌসি গভর্ণর জেনারেলের কর্মভার ত্যাগ করে যাবার পর জানা যায় যে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের জন্যই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। বছরের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে লর্ড

ডালহৌসিকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পেন্সন স্বরূপ দেওয়া হবে। ডালহৌসি যে ভারতের বহু অনিষ্ট সাধন করে গিয়েছেন সেই ভারতের অর্থভাণ্ডার থেকেই এই মোটা টাকা তাঁকে বার্ষিক পেন্সন স্বরূপ দেওয়া হবে এটা জানা মাত্র এই পেন্সন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে লর্ড এলেনবরো (Lord Ellenborough) মোটেই জনপ্রিয় গভর্ণর ছিলেন না, কিন্তু এঁর তুলনায় লর্ড ডালহৌসি আরও নিকৃষ্ট ছিলেন। আমরা আশা করি আমাদের দেশবাসী আর দেরী না করে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এবং পার্লামেণ্টকে জানিয়ে দেবেন যে লর্ড ডালহৌসি এদেশের সর্বত্র ঘৃণিত মানুষ ছিলেন—এবং এর পেছনে সুস্পষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। ডালহৌসি এদেশের মাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় এদেশের মানুষ যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এটাও ভালভাবে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ["Lord Dalhousie was personally the most unpopular Governor General that ever came out to India, not excepting Lord Ellenborough himself; and we hope our countrymen will not delay to convince people and parliament of Great Britain that the unpopularity widespread and deep as it was well-deserved. We hope to see a public demonstration made of the weighty reasons which made people of India feel a relief on Lord Dalhousie's leaving this shore"—H. P. of June 26, 1856]

লর্ড ডালহৌসিকে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের তহবিল থেকে বার্ষিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড পেন্সন মঞ্জুর করার সংবাদ পেয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ, ওয়েলেসলি, লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি ভারতের গভর্ণর জেনারেলরা স্বাধীন চিত্তের মানুষ ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করে তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। লর্ড ডালহৌসি সেই ধরণের শাসক ছিলেন না, তথাপি তাঁর কাজের ধরণ কর্তৃপক্ষের পছন্দসই ছিল না, এই জন্য তাঁকে তাঁর কাজের সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চলে যেতে হয়, যার শাস্তি প্রাপ্য ছিল তাঁকে এখন ভারতের রাজকোষ থেকে বার্ষিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড পেন্সন দিয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে জনসাধারণের অর্থের তছরূপ। এই রাজকোষের যারা রক্ষক তারা জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই অর্থ মঞ্জুর করছে, এই কুকাজ লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, হিসেব নিকেশের দিন এলে এদের জবাব দিহি করতে হবে। [" the unfaithful stewards who have thus misapplied the country's funds should have the deed recorded against them—against the time for reckoning"—H. P. of 7. 8. 56.]

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন ভাবে শাসন সংস্কার কার্যকর হওয়ার পর তিনটি প্রেসিডেন্সির (বাঙলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) কর্মভার প্রত্যক্ষ ভাবে গভর্ণর জেনারেলের হাত থেকে আলাদা করে নিয়ে তিন জন লেফ্টন্যান্ট গভর্ণর বা ছোট লাটের অধীন করা হয়। আশা করা গিয়েছিল এই ছোটলাটেরা স্ব স্ব প্রদেশের কাজ কর্ম ভাল ভাবে নিষ্পন্ন করবেন। শাসন সৌকর্যের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থানুযায়ী বাঙলার ছোট লাট নিযুক্ত হন সার ফ্রেডরিক্ জেমস্ হ্যালিডে (Sir Frderic James Halliday), ইনি ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সদস্য। হ্যালিডের কার্যকাল দুই বৎসর অতীত হওয়ার পূর্বে হরিশ্চন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্র এঁর কাজের কঠোর সমালোচনা করেন। এই বিশেষ মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এ যাবৎ মিঃ হ্যালিডের প্রশাসন শুধু ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রশাসন দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করবে এমন আশঙ্কা আছে। তিনটি প্রদেশের জন্য তিনটি ছোটলাট পদ সৃষ্টির সময় শাসন সৌকর্যের যে আশা মানুষের মনে জেগেছিল সে আশা মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। মিঃ হ্যালিডের যে কোন পরিকল্পনা ও কাজের মধ্যে সর্বনাশের সম্ভাবনা থেকে যায়। ["The opinion is that Mr. Halliday's administration hitherto has proved to be failure and in future threatens to be injurious to the country. The failure has been manifested in the frustration of all the hopes that were formed when a separate government for three provinces was in view......the injury is anticipated in the function of all that Mr. Halliday projects to do"—The Lt. Governor of Bengal. H.P. 27. 11. 1856]

৭

হরিশ্চন্দ্র ও জমিদারী ব্যবস্থা

হিন্দু-পেট্রিয়টে রাজনীতির সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক অবস্থার আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হত। কৃষকপ্রজার স্বার্থরক্ষার দিকে হরিশ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম কর্মকর্তা হিসেবে অনেকসময় হরিশ্চন্দ্রকে জমিদারি স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, হরিশ্চন্দ্রের এই সমালোচনা অযথার্থ।* প্রজার স্বার্থই তাঁর কাছে সর্বাগ্রগণ্য ছিল। গভর্ণমেন্ট বনাম জমিদার অথবা জমিদার বনাম ইউরোপীয় নীলকর বিরোধের ক্ষেত্রেই শুধু হরিশ্চন্দ্র জমিদার পক্ষ সমর্থন করতেন। জমিদারের শোষণ অত্যাচারের বহু কাহিনী হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়েছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা জমিদারের হিসাব মত রাজস্ব মিটিয়ে দেওয়া সর্তে স্থায়ী ভাবে যে জমিদারি করার অধিকার দিয়েছে, হরিশ্চন্দ্র জমিদারের সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিতেন। তিনি চাইতেন যে জমিদার নিজের নিজের এলাকায় সেচ ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিতে অর্থ ব্যয় করুন, এতে প্রজার সমৃদ্ধিতে জমিদারেরও অবস্থার উন্নতি হবে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' জমিদারদের অনিশ্চিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, এতে গভর্ণমেণ্টকে দেয় খাজনার হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, প্রজার দেয় করও নির্দিষ্ট ছিল, জমিদারের পক্ষে এটা ইচ্ছামত বাড়ানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এই ব্যবস্থায় প্রজার স্বার্থ সুরক্ষিত থাকায় হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থনের একটা বড় কারণ ছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে 'রায়ত ওয়ারী' প্রথায় রায়তদের সঙ্গে সরকারের খাজনা দেওয়া নেওয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল—এর ফল ঐ অঞ্চলের প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি।

রমেশচন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের অভিমত এই যে "একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এর ফলে এদেশের লোকদের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা হয়েছিল, ১৭৯৮ সালে বিলেতে পিট যে চিরস্থায়ী ভাবে জমির কর স্থির করে দেন তার তুলনা করলে একথাটা বোঝা যায়। বিলেতে ঐ আইনে কেবলমাত্র জমিদারেরই সুবিধা হয়েছিল। এখানে

* New View Point on 19th Century Bengal—Chittabrata Palit, Calcutta—19:0

(বঙ্গ প্রদেশ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা কৃষির সঙ্গে জড়িত তাদের প্রত্যেকেই উপকৃত হন।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ইতিপূর্বে প্রতি বৎসর যে অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ শোষণ করে বিলাতে পাঠাচ্ছিলেন, সেই শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি বন্ধ হল। ইংল্যাণ্ডে এই ট্যাক্স বেঁধে দেওয়ার ফলে জমিদার সম্প্রদায় অধিকতর কর দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচলেন। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের (বঙ্গ প্রদেশের) সমস্ত জাতি দুর্ভিক্ষের হাত হতে নিস্তার পেয়েছিল। কেননা লক্ষ্য করা যায় যে ১৭৯৩ সালের পর বাংলা দেশে এমন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় নি, যাতে বহু প্রাণ নাশ হয়েছে।"* রমেশচন্দ্রের পরবর্তী কালেও এই প্রথা প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি চিন্তাবিদদের সমর্থন পেয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সমালোচনার অতীত এবং দেশের জমিদারেরা যে সব সাধুপুরুষ একথা হরিশ্চন্দ্র কখনও স্বীকার করেন নি। জমিদারের অত্যাচার কাহিনীগুলি কখনও তিনি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধের একটা প্রধান ক্ষেত্র ছিল 'লাখে রাজ' জমি (শব্দটি আরবি থেকে আগত লা-খিরাজ)। যে সব জমির জন্য জমিদার বা রাজাকে খাজনা দিতে হয় না, সেটি লাখেরাজ জমি বা সম্পত্তি। হিন্দু শাসন কালে রাজা এই নিষ্করভূমি ব্যক্তিবিশেষকে কোন বিশিষ্ট কর্ম বা সেবার জন্য দান করতেন, এই প্রাপকেরা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতেন তা নয় সর্বশ্রেণীর মানুষকেই এই লাখেরাজ জমি দেওয়া হয়ে থাকত। মুসলমান শাসনকালেও এই লাখেরাজ জমি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শাসক অনুগ্রহ-ভাজন যে কোন ব্যক্তিকেই দেওয়া হত। ইংরাজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও এই ধরণের ভূমি স্বত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর যারা জমিদারি কিনতেন তাদেরও এদের উপর খাজনা ধার্য করার অধিকার আইনে স্বীকৃত হয়নি। তবে পরবর্তীকালে এই নিয়ে প্রায় গণ্ডগোল বাধত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদার নির্দিষ্ট দিনে সরকারী রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ার জন্য জমিদারি নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করে দেওয়ার নিয়ম ছিল। নিলামে জমিদারি কিনে নেওয়ার পর নতুন জমিদারের নজর পড়ত লাখেরাজ জমির উপর। লাখেরাজ ভোগকারীকে প্রয়োজনীয় দলিল দেখাতে বলা হত। শত শত বৎসর ধরে পুরুষানুক্রমে যারা লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করত তাদের কাছে প্রায়ই দলিলপত্র থাকত না। দলিল অভাবে জমিদারেরা এই সম্পত্তি গ্রাস করে নিত। তখন

* ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—রমেশচন্দ্র গুপ্ত
(বিমলচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত) পৃঃ—১০
বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫১

এই হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রজার আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। আইন আদালতের ঝামেলা বিশেষ করে অর্থ ব্যয় করা অধিকাংশ 'লাখেরাজ'দারদের পক্ষে সম্ভব হত না, কাজেই তারা এই সম্পত্তি থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হত। অনেক সময় জমিদার মোটা রকম একটা টাকা এক সঙ্গে নিয়ে 'লাখেরাজ' ফিরিয়ে দিত, কিন্তু তেমন কোন দলিল করে দিত না, যাতে, ভবিষ্যতে আর কোন গোলমাল না হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে লাখেরাজ সম্পত্তি নিয়ে অনেকগুলি মামলা এসেছিল। হরিশ্চন্দ্র লাখেরাজ-হারাদের পক্ষ নিয়ে বহুবার হিন্দু-পেট্রিয়টে লাখেরাজ সম্পত্তি হরণের প্রতিবাদ করেন। তিনি নদীয়া জেলার গোবরডাঙার শত শত লাখেরাজদারদের দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে লেখেন যে, 'সনদ' দাখিল করার পরও লাখেরাজ-দারকে জমিদার ও তার আমলাদের পেছনে বহুদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়। অনেক সময় তাদের বলা হয় যে তাদের দলিল বা সনদ 'অসিদ্ধ'। দরিদ্র প্রজার পক্ষে আদালতে যাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই তাদের জমির স্বত্ব হারাতে হয়। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এই সব প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে তার ফলে একটি আইনের খসড়া রচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তিনি আরও লেখেন যে ইতিমধ্যে প্রজাদের মধ্যে একটি শ্রেণী যাদের পূর্ব পুরুষরা সৎকার্যের জন্য এই লাখেরাজের অধিকারী হয়েছিল তারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ["Meanwhile, a most interesting class of population is being reduced to beggary and one of the most valuable features of Indian Society namely the existence of an intelligent body of small free-holders, is in course of obliteration.—Lakhiraj Properties and Zamindary States—H.P. of 12. 3. 55]

এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন পর হিন্দু-পেট্রিয়টে লেখেন যে, লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগকারীকে বলা হচ্ছে যে 'সনদ' দেখাতে হবে, তবেই আদালত তাকে রক্ষা করতে পারবে, তা নইলে জমিদার তাকে ধ্বংস করে দেবে। হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে, শতকরা একজনের বেশি লাখেরাজ ভোগকারী 'সনদ' দেখাতে অক্ষম। লাখেরাজ সম্পত্তি গ্রাস (রিসাম্পসন্) অধিকাংশ জমিদারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিজের এলাকার সব ভূমি দখলেই যেন তার ন্যায্য অধিকার আছে। জমিদারের এই কাজে বেশ ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায়।……অধিকাংশ সময়ে এই লাখেরাজ ভোগকারী দরিদ্র হওয়ার জন্য তাকে ধনী জমিদারের সঙ্গে একটা অসম-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়……বহুস্থানে জমিদারের এই লাখেরাজ গ্রাস প্রবণতা এত বেড়ে গিয়েছে যে লোকে এখন লাখেরাজ সম্পত্তি কিনতেও ভয় পায়। ["Our readers are aware in what an unenviable relation

the Lakrajdars of Bengal stand to zamindars in whose estates their lands are respectively situated. When a Zamindary changes hand, the act which the newcomer does is to attack every piece of land situated to it. The parties holding the Lakhraj properties are required by the zamindars to produce evidence to show that they are held under valid and unexceptionable titles. This evidence, we need hardly mention is generally pronounced to fall short of being satisfactory, the lands are confiscated and the occupiers of them referred to a civil action if they persist in urging their rights. Sometimes indeed, the properties are released on payment of a sum of money in lump. Grants of an unquestiouable character do not often escape this sort of resumption although they are known to have been in the undisturbed possession of the grantees, their heirs or persons holding under them since the accession of the Co. to the Dewany in 1765. It is one in a hundred case that sunuds of such grants are preserved and without them relief either from the Zamindar or at law is simply hopeless. The resumtion of rent free lands has of late become a fashion of most Zamindars...... The Zamindar considers his duty to lay every piece of land within his reach under contribution. The absurdity of this reasoning is equalled only by the audacity with which it is maintained. The resume lakhrej lands, because these add to their profits and self interest is a more powerful stimulus for them ..... The extreme inequality of the condition of the parties in opposition greatly facilitates these acts of spoilation. The holder of the rent free tenure often happens to be one who can not be termed opulent.. ...—when he is turned out of his possession he has to maintain an unequal contest with a rich zamindar, probably unscrupulous in the selection of his means to crush up an obnoxious and unsubmissive Lakhrajdars......There are actually places where rapacity of the zamindars has so overturned the order of things that a piece of land bearing no rent is held in less value than one of

the same qualitity paying rent. This state of things is brought about in a great measure by the mode in which resumption cases are decided in our courts. H. P.—30. 8. 1955]

যে সব গবেষক হরিশ্চন্দ্রকে জমিদারদের তল্পিবাহক (errand boy of the zaminder) প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন তাঁরা হরিশ্চন্দ্রের এই রচনাগুলি কোন দিন উল্টেও দেখেননি। হরিশ্চন্দ্র জমিদারি প্রথার সমর্থক ছিলেন কারণ সরকার এই ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু জমিদারের অত্যাচার কোন দিন তাঁর সমর্থন পায়নি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর তিনি জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে লেখেন যে জমিদারেরা প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালান তার কারণ হচ্ছে তাদের অধিকার কতটুকু সেটুকু সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার উপর জুলুম চালা নার অধিকার নেই সেটা তাঁরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। ["The principal causes to which the oppression practised by zamindars upon their tenants may be traced to the ignorance····· of the precise nature of the change wrought in their respective positions by the permanent settlement and by the law's subsidiary to that measure and the abuse of the social influence in the zamindary class")

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র আরও লেখেন যে ইংলণ্ডে এক সময় জমিদার বা লর্ডগণ প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করত। কিন্তু ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা এখন এমন বদলে গিয়েছে যে অত্যাচারী 'লর্ড' সমাজে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'একঘরে' হয়ে যান। কিন্তু এ দেশে এমন জনমত গড়ে উঠেনি যাতে অত্যাচারী জমিদার তাঁর সামাজিক মর্যাদা হারান। একটি শিক্ষিত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রজাস্বার্থদ্বেষী জমিদারের স্বসমাজে স্থান না হয়। [But neither misunderstanding nor the acrimony of social disputes would have eventuated in the adoption by zamindars of such conduct as they sometimes manifest towards their tenants if public opinion—if the class opinion in which the body of zamindars are educated had been sound on these matter······ The oppressive land holder in Bengal loses no caste, he loses no society in which he loves to move, he loses no consideration in the eyes of the public and we may add, in that of Govt······"
—The Zamindar and the ryot. H P. 6. 9. 1855.]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণভাবে সমর্থন করলেও হরিশ্চন্দ্র এর অহিতকর দিকটি সম্বন্ধেও অনবহিত ছিলেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় খাজনা পরিশোধে অক্ষম প্রজার জমি নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করা বা দখল করে নেওয়ার

যে ব্যবস্থা ছিল হরিশ্চন্দ্র তারও ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি লেখে- তাঁর জমিদারের উচিত তার প্রজার বিপদে সাহায্য দান, তার পরিবর্তে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। গ্রামের মানুষ যে দুঃখ দুর্দশায় ভুগছে তার জন্য বাঙলার জমিদাররাই দায়ী। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লেখেন যে শুধু জমিদারদের এবিষয়ে দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ দেশের প্রচলিত আইন এই অত্যাচারের হাতিয়ার তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। জমিদারদের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের এত সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে অনেক সময় আশ্চর্য হতে হয় যে সকল জমিদারই তা প্রয়োগ করে না।

জমিদারদের অত্যাচারের একটি বহু ব্যবহৃত উপায় হল উচ্ছেদ প্রথা (the process of distraint)। মধ্যযুগীয় এই বর্বর প্রথা যা শুধু ইউরোপে প্রচলিত সেটিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই উচ্ছেদ আইনে প্রজার জমি বিক্রি করে দিয়ে জমিদারের খাজনা উশুল করার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। নৃশংসতার দিক থেকে এটা 'হপ্তম' (সপ্তম আইন) এর চেয়ে ভয়াবহ। ["There are undoubtedly many evils connected with the zamindary system. The agricultural population is subject to much oppression at the hands of those who should have been their best protectors. The land holders of Bengal have to answer for much of the suffering under which the rural population labours. But who is responsible for the lavish means of oppression placed within reach of the land holders or for the impunity with which he practices oppression ? It is fashionable to talk of the rapacity of the zamindar, but considering the temptation and the opportunities presented to him of oppressing his tenants, the actual conduct of the zamindary body appears marvellously moderate .. of the many modes of zamindary oppression, the one most in use in the enforcement and perversion of the process of distraint. The process, a purely feudal institution and known to the jurisprudence of European nations, was naturalised in the country about the time of the permanent settlement. Since that it has been turned into the hands of one section of the community into the greatest scourge of another." It has latterly superseded as a means of coercion even the dread huptum law.—Pumjum Outrages—H. P. 19. 3. 1857]

অতঃপর হরিশ্চন্দ্র ২৪ পরগণার জেলার সদর আমীনের একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দেখান যে এই অত্যাচার মূলক আইন কি ভাবে এই জেলার সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ করে দিচ্ছে। সদর আমীনের এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস সমর্থন করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে এই উচ্ছেদ ব্যবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে কার্যকর হয়, যে নৃশংসতা এতে প্রকাশ পায় রাত্রিবেলায় ডাকাতি যাদের পেশা তারাও এতটা নৃশংসতা দেখাতে লজ্জিত হয়। এই উচ্ছেদ কালে লুঠ-পাট, নারীর উপর বলাৎকার ও লাঞ্ছনা পুলিশের উপস্থিতিতেই ঘটে থাকে। ["Under the cloak of distraint atrocities are commi- by broad day light which a professional dacoit would shrink from. Phender, rape and insults to women are among the common incidents of a distraint in Benghl. All this is done in the presence of the police and without the slightest apprehension of risk of punishment. H. P.—19. 3. 1859]

প্রধানতঃ আন্দোলনের ফলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই কুপ্রথার অবসানের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু-পেট্রিয়টে এই ব্যবস্থা গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সদস্য জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরিশ্চন্দ্রকে অনেকে জমিদারি স্বার্থের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন একথা বলা হয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তৎকালে বাঙলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, হরিশ্চন্দ্র এই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে দেশসেবায় রত হয়েছিলেন। জমিদারের স্বার্থ রক্ষা তাঁর কল্পনায় ছিল না। হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র জমিদারদের বহু অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করেন, সম্পাদকীয় মন্তব্যেও অত্যাচারী জমিদারদের 'rapacious, (অতিলোভী) 'oppressive' (অত্যাচারী), unserupulus' (বিচারবোধ রহিত) প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেন। হরিশ্চন্দ্রের জমিদার তোষণ নীতির অপবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আইনবেত্তা ও আইন-জীবী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও স্বনামধন্য সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৫৫) মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে "তৎকালে 'খুদখাস্ত' ও 'কুদিমি' শ্রেণীর প্রজাদের অবস্থা জমিদারদের হাতে নিরাপদ ছিল না। এদের স্বার্থে যাতে আঘাত না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে হরিশ্চন্দ্র তাঁর কাগজে বহু প্রবন্ধ লেখেন। জমিদারি শোষণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। জমিদার শ্রেণী ক্রমশঃ শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল হবে এবং প্রশাসন প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচার সম্পন্ন হবে, হরিশ্চন্দ্র এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টির আশা করতেন। ১৮৫৯

খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যে 'রেভেনিউ সেল ল' বিধিবদ্ধ হয় হরিশ্চন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। শুধু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক জমিদারের স্বার্থে আঘাত হানার জন্যই হরিশ্চন্দ্র এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেননি। তাঁর প্রতিবাদের কারণ এই ছিল যে এতে সরকার পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন কোন চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছিল। এই নূতন আইনে যদি জমিদারের স্বার্থহানি করে প্রজার প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকত তবে তিনি এর প্রতিবাদ করতেন না। নূতন আইন প্রজা স্বার্থরক্ষার একটা ভান মাত্র ছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের স্বীকৃত অধিকার হরণ। এর অন্যতম প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় নীলকরদের উপর দেশীয় জমিদারদের প্রভাব খর্ব করা। হরিশ এই নূতন আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, এর পেছনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 'হুকুম' বা অনুরোধ কিছুই ছিল না। দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। তাঁর সামনে ছিল নীলকর বনাম জমিদারের স্বার্থ। এক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্র ইউরোপীয় নীলকরদের চেয়ে দেশীয় জমিদারদের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

[..... "His anxious solicitude to protect the interest of the 'khudkhast' and 'kudimee' ryots whose title was most insecure in those days finds expression in many articles (published in the H. P.)........Sale Law passed in 1859 was opposed by Harish chandra......He was aware of zamindary oppression but trusted to education and improved administratian of justice......He opposed the Sale Law for it was meant to break in upon the status given to landlords by the permanents settlement. In this act Harish discerned not an anxiety to protect the common ryot but a desire to strengthen the foot hold of European planter. He had to choose between planter and zamindar as the tyrant · And knowing what he did of planters of the day Harish entered into a strong protest against the bill from pure consideration of ihe country's good and not at the bidding of the zamindars of the British Indian Association—"From the preface of the 'Selections from the writings of Harish Chandra Mukherjee—Compiled from the 'Hindoo Patriot' Ed by N. C. Sengupta, M. A., B. L., Calcutta—1910]

কোম্পানী শাসনের অবসানে 'ব্রিটিশ ক্রাউন' কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের

প্রাক্কালে হরিশ্চন্দ্র একটি প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে এই প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন যে প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে সেটি পুনর্বিচার করে দেখার দরকার ছিল। তা করা হয়নি বলে হরিশ্চন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়টি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়তদের দুর্দশার জন্য জমিদারদের দায়ী করে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল, এতে জমিদারি ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরকারকে সোজাসুজি প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সুপারিশ করা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র জমিদার বিরোধী এই পুস্তিকার মর্মার্থ হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি, এসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও তিনি পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন। [A Renewed Permanent Settlement—H. P. 3. 4. 1856]

এর থেকে বোঝা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জগদ্দল পাথর হয়ে চিরকাল থেকে যাবে এটা হরিশের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না। একটা সাময়িক ব্যবস্থা রূপে তিনি এটা মেনে নিতেন।

বস্তুতঃ রায়তওয়ারী প্রথার বিকল্প হিসাবে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী লেখকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর পূর্বসূরী রমেশচন্দ্র দত্তের অভিমত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুতঃ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুদ্ধিজীবী মহলে স্বীকৃত ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লাউড-কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা মধ্য স্বত্ব লোপের সুপারিশ করেছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথার অবসান হয় নি। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছয় বৎসর পরে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভক্ত বঙ্গদেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথার অবসান হয়েছে। এখন কর-সংগ্রহের জন্য রায়তওয়ারি প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। বহুনিন্দিত জমিদারি প্রথার অবসানে নিজের শ্রমে চাষকারী কৃষকদের জমির অধিকারী হওয়ার কথা—তা কি তারা সত্যিই হতে পেরেছে? প্রকৃত চাষীগণ যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গিয়েছে। বহু রাজনৈতিক নেতা এই মত পোষণ করেন যে জমিদার-কৃষক বিরোধ এখন ভিন্নরূপে ভিন্ন নামে বাংলার শ্রমজীবী কৃষককুলকে উৎপীড়িত করছে, তাদের জঠর জ্বালা থেকেই গিয়েছে। শোষকশ্রেণী এখন ভিন্ন নামে নানা কৌশলে বাংলার কৃষক সমাজের রক্ত শোষণ করছে। শতবর্ষেরও অধিক কাল কেটে গিয়েছে—অসহায় কৃষক চাষীর পাশে দাঁড়াবার মত দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব এখনও অপেক্ষিত—একথা বলা অন্যায় হবে না।

পাইকপাড়া রাজবাটির রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ, উত্তর পাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের

গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এটা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক। হরিশ্চন্দ্র কখনও কোন জমিদারের অনুগ্রহ প্রার্থী হয়েছিলেন বা তাদের দ্বারা অনুগৃহীত বা উপকৃত হয়েছিলেন এমন কোন তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেননি। জমিদারী স্বার্থে যে তিনি এর বিরোধিতা করেননি, প্রজার স্বার্থে এ কাজ করেছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে তা' প্রমাণিত করে দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যটি যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। নীলকরদের লাঠিয়াল সম্বন্ধে তিনি যে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, জমিদার নিয়োজিত লাঠিয়াল সম্বন্ধেও সেই তীব্র ঘৃণা হিন্দু-পেট্রিয়টের অনেকগুলি পৃষ্ঠায় প্রকাশ পেয়েছে। হরিশ্চন্দ্রকে জমিদারদের তল্পিবাহক রূপে চিত্রিত করে নতুন কিছু বলার বাহাদুরি যাঁরা নিতে চাইছেন, হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি তাঁরা খুঁটিয়ে পড়েননি। বস্তুতঃ সাধারণ ভাবে জমিদার শ্রেণী যে তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন—তাঁর মৃত্যুর পর তাদের নানা আচরণে এটাই প্রকাশ পেয়েছিল।

৮

সিপাহী বিদ্রোহ ও হরিশ্চন্দ্র

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী একজন ইংরাজ সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করে। এটাই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। সামরিক বিচারে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি কাঠে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এর দু মাস পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহী সিপাহীরা জেল আক্রমণ করে বন্দী সিপাহীদের মুক্ত করে দিয়ে ইউরোপীয় কর্তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে ও তাদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর পর মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়ে ১১ মে দিল্লী অধিকার করে, দিল্লীর সিপাহীরাও অতঃপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর সিপাহীরা ইংরাজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাটরূপে ঘোষণা করে। দিল্লীর বিদ্রোহ তারপর তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (N. W. Province) মোটামুটি বর্তমান ইউ. পি, মধ্যভারত ও বিহারের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের মূল কেন্দ্রগুলি ছিল দিল্লী, বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বিহারের জগদীশ পুর ও মধ্য ভারতের ঝাঁসি। এই বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতা ছিলেন নানা সাহেব, আজিমুল্লা খান, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের কুমার সিং, লক্ষ্ণৌ এর হজরতমহল, মৌলভী আহম্মদউল্লা ও খান বাহাদুর খাঁ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়—এবং প্রায় দুই বৎসর পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মারাঠী বিদ্রোহী নায়ক তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ নিঃশেষে নির্বাপিত হয়। বাস্তব পক্ষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটি ঘোষণার পরই সিপাহী বিদ্রোহের উপর যবনিকা নেমে এসেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল কারণ সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোঝাপড়া বা সহযোগিতার যেমন অভাব ছিল, কোন পূর্ব পরিকল্পিত কর্মসূচিরও তেমনি অভাব ছিল। সমগ্র ভারতের অল্প সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষ সিপাহী বিদ্রোহ কালে হয় ইংরাজের সপক্ষে ছিল নতুবা নিরপেক্ষ ছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে একটি গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিতে পারেনি,

যদিও সেই সুযোগ বর্তমান ছিল। গণ-অভ্যুত্থান যেখানে যেখানে দেখা দিয়েছিল তা ছিল সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। ক্ষেত্র বিশেষে জনসাধারণ ইংরাজের বিরুদ্ধে যোগ দিলেও, দেশকে ব্রিটিশ মুক্ত করা অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় বিদ্রোহী নেতাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অতি অল্প সংখ্যক নেতাই এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে যারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, জমিদার ও মহাজন হত্যা, কোর্ট কাছারিতে আগুন দিয়ে বাকী খাজনার নথি পত্র নষ্ট করে ফেলা প্রভৃতি অপকর্মের দ্বারা এরাও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেছিল। সিপাহীদের জুলুমের ভয়েও বহুক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হয়েছিল। গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের দেশীয় নৃপতিগণ ইংরাজের পক্ষ নিয়েছিলেন। শিখ ও নেপালী সৈন্যেরা সিপাহীদের পক্ষ নেয়নি, বস্তুতঃ বিদ্রোহ দমনে এরা ইংরাজদের প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের কিছু কিছু ব্যক্তি অবশ্য নিছক দেশভক্তির প্রেরণায় বিদ্রোহে যোগ দেয় কিন্তু এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল, অধিকাংশ নেতারই উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থ সিদ্ধি এবং ইংরাজ-রাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত-অপমান ও ক্ষতি-জনিত প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে যাঁকে ভারত সম্রাট রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেই বৃদ্ধ ও অব্যবস্থিত চিত্ত দ্বিতীয় বাহাদুর শা, তাঁর পুত্রগণ ও বেগম জিন্নৎমহল বিদ্রোহ চলা কালে শত্রু স্থানীয় ইংরাজ সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখতেন। ইংরাজের কাছ থেকে নিজেদের ভাতা ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেলে এঁরা বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করবেন, তাঁদের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত এমন তথ্যও পাওয়া যায়। ইংরাজেরা জানত যে, দিল্লীর পুনরুদ্ধার আসন্ন তাই তারা বাহাদুর শাহের প্রস্তাবকে কোন আমল দেয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেব ছিলেন পেশোয়া বাজীরাও এর দত্তক পুত্র। লর্ড ডালহৌসি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য পেন্সন ও জায়গীর থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেন। মর্যাদা ও পেন্সন বঞ্চিত নানা সাহেব কানপুরে বাস করে ওখাকার ইংরেজ কর্মচারীদের অনুগ্রহ ও আস্থাভাজন হন। মীরাটে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিলে কানপুরের ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ নানাকে সেখানকার কোষাগার ও অস্ত্রাগার রক্ষার ভার দেন। নানা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেন। কানপুরে বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ইংরাজেরা একটি অস্থায়ী গড়খাই বা দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিল্লীর পথে কল্যাণপুর থেকে প্রত্যাগত বিদ্রোহীগণ ইংরাজদের যে দুর্গ অবরোধ করে তাদের নেতা ছিলেন নানাসাহেব। ইংরাজেরা আঠারো দিন এই দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় নানাসাহেব তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ যাবার অনুমতি দেন। ইংরাজেরা নৌকায় উঠার পর

সিপাহীরা তীর থেকে গুলি বর্ষণ করে এদের হত্যা করেছিল। মাত্র চারজন ইংরাজ এই হত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই ঘটনার পর নানা নিজেকে পেশোয়া রূপে ঘোষণা করেন। ১৫ই জুলাই নানার নির্দেশে কানপুরের 'বিবিঘরে' বন্দী নারী শিশু সহ ২১১ জন ইংরাজকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনার দুইদিন পর হ্যাভলক নামক ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহীদের পরাজিত করে কানপুর পুনরধিকার করেন। নানাসাহেব প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করেন। এর পর থেকেই নানার পলাতক জীবন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত নানা নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিদ্রোহান্তে নানা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এই মর্মে আবেদন করেছিলেন যে সিপাহীরা জোর করে তাঁকে তাদের দলভুক্ত করে ছিল এই জন্য তিনি অবশ্যই ইংরাজের ক্ষমার যোগ্য। নানা ইংরাজের ক্ষমা পাননি। তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে তিনি ধরা পড়েননি।

বিদ্রোহকালে এর প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষ অনুভূত হয়নি। শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪ নং পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল। ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয়ে এরা মণিপুরে পলায়ন করেছিল। এদের ধরে এনে সাজা দেওয়া হয়। ২২ নভেম্বর ঢাকার যে সৈন্য বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, তারা পরাজিত হয়ে উত্তর বঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

যাই হোক, সিপাহী বিদ্রোহ ইংরাজদের যৎপরোনাস্তি চিন্তিত ও বিব্রত করে তুলেছিল। ইংরেজ রাজ্যের সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার সমস্ত শক্তি এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হয়েছিল। সিপাহীরা ইংরাজদের উপর যে অত্যাচার করেছিল প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ব্রিটিশ শক্তি অজস্র নিরীহ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার চালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে কলিকাতা মহানগরী ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আর লর্ড ক্যানিং ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। সিপাহী বিদ্রোহ কালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাঙালী জীবনকেও নাড়া দিয়েছিল কিন্তু এই বিদ্রোহের প্রতি সাধারণ বাঙালী সহানুভূতি সম্পন্ন হতে পারেনি। এটা সমগ্র ভারত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একমাত্র আউধ (অযোধ্যা) রোহিলখণ্ড ও বিহারের দু একটি জেলা ব্যতীত কোথাও 'জনগণ' সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। বাঙলার রাজধানীর বাঙালী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একটি দ্বিভাষিক বাঙলা-হিন্দী সংবাদপত্রে সিপাহীদের কিঞ্চিৎ সমর্থন করা হয়েছিল, এইজন্য এই কাগজটির বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছিল, তবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এখানে বলা প্রয়োজন যে,

'সমাচার সুধাবর্ষণ' এর প্রচার সংখ্যা নগণ্য ছিল, প্রধানতঃ দৈনিক বাজারদর প্রকাশই এর লক্ষ্য ছিল। চাট্‌নি হিসেবে কিছু মজাদার সংবাদও দেওয়া হত। এটি একটি সুপরিচালিত দায়িত্বশীল পত্রিকা ছিল না। ভারতবাসী পরিচালিত কলিকাতার দুটি ফার্সী দৈনিক 'দূরবীন' ও 'সুলতান-ই-আকবর' পত্রিকা দুটি বিদ্রোহীদের দিল্লী ঘোষণা প্রকাশ করায়, সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হয়। দুঃখ প্রকাশ করে এই দুই পত্রের সম্পাদক অব্যাহতি পান।

সিপাহী বিদ্রোহ কালে বাঙালী এই বিদ্রোহের পোষকতা করেনি এর জন্য অনেকে তৎকালীন বাঙালী প্রধানদের ওপর দোষারোপ করে থাকেন। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব তথ্যাবলীর ভিত্তিতে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালীর ঔদাসীন্যের যথেষ্ট কারণ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে বর্তমান শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রূপে পরিগণিত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিম্ন বর্ণিত মতামত প্রনিধান যোগ্য—"ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামই হোক না কেন তাকেই যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় তবে সিপাহী যুদ্ধকে অবশ্যই স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে সিপাহী যুদ্ধকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করতে হলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পিণ্ডারীদের যুদ্ধ এবং পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহবিদের যুদ্ধকেও স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে অভিহিত করতে হবে। নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল পিণ্ডারী ও ওয়াহবি বিদ্রোহের উৎস, সিপাহী বিদ্রোহও ছিল এই ধরণের বিদ্রোহ। নিঃস্বার্থভাবে শুধু স্বদেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এরা কি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল? দু একটা ছোটখাট ঘটনায় বা দু একটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে—কিছু স্বদেশ প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বিচারে একথা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার চিন্তাই ছিল এই বিদ্রোহের মূল কারণ। বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করা বেশ কষ্ট সাধ্য, এটাকে একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রূপে মেনে নেওয়াটাও শক্ত।"

["It would thus appear that the outbreak of civil population in 1857 may be regarded as a war of Independence only if we take that term to mean only any sort of fight against the British. But then the fight of the Pindaries against the British and the fight of the Wahabis against the Sikhs in the Punjab

should also be regarded as such. Those who demur to it should try to find out how much the rebels in 1857 were prompted by motives of material interest and religious consideration, which animated the Pindaries and the Wahabis and how much by the disinterested and patriotic motive of freeing the country from the yoke of foreigners. Apart from individual cases, here and there, no evidence has yet been brought to light which would support the view that the patriotic motive of freeing the country formed the chief incentive to the general outbreak of 1857 as a war of Independence far less a national movement of this type, at least in the present state of our knowledge"—P. 624. Vol IX, History & Culture of the Indian People.—Dr. R. C. Majumdar, Bombay, 1963.]

যাই হোক ঐতিহাসিক ডঃ মজুমদার এটা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে "বহু গলদ থাকা সত্ত্বেও সিপাহী ও তাদের সমর্থক সাধারণ মানুষ সংখ্যার জোরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছিল। ব্রিটিশের ভাগ্য একটা সুতোর উপর যেন ঝুলছিল। ভারতীয়দের অদৃষ্ট যদি একটু অনুকূল হত, তা হলে এই বিদ্রোহের পরিণাম অন্য রকম হতে পারত।"* ডঃ মজুমদার অবশ্য মঙ্গল পাণ্ডেকে ভারতের প্রথম শহীদ রূপে আখ্যাত করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পূর্ব পরিকল্পনার অভাব ছিল। তাদের সাহস ও ও শৌর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল আধুনিক ধরণের অস্ত্রের। ব্রিটিশের এন্‌ফিল্ড রাইফেল্‌স-এর বিরুদ্ধে তারা পুরানো আমলের বন্দুক অথবা তলোয়ার দিয়েই শুধু যুদ্ধ করেছিল। তাদের কোন বেসামরিক সংগঠন ছিল না, শুধু সামরিক সংগঠন একটা যুদ্ধ জয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় এ জ্ঞান তাদের ছিল না। মধ্য বা নিম্নস্তরে কোন নেতৃত্ব তারা গড়ে তুলতে পারেনি। দখলীকৃত স্থানে কোন প্রশাসন তারা গড়ে তুলতে পারেনি, স্থানীয় জনসাধারণের ধন সম্পদ লুঠ করে তাদের যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করতে হত। সিপাহী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন

*** Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (P 227) Dr. R.C. Majumdar Calcutta—1957,**

স্থানে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় ও সাহায্য প্রেরণের কোন ব্যবস্থাও ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের সেনাধ্যক্ষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরাজ বাহিনীর ভূতপূর্ব কর্মচারী কিন্তু এরা কেউই রণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। আশ্চর্যের বিষয় যে সিপাহী বিদ্রোহ পরিচালনায় যাঁরা সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন—এদের মধ্যে ঝান্সির রাণী, ফিরোজ শাহ, বিহার জগদীশপুরের কুঁয়ার সিং, তাঁতিয়া টোপী ও ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ শাহের নামই শুধু উল্লেখযোগ্য। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে হরিশ্চন্দ্র অতি স্থির মস্তিষ্কে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সামনে তিনি সাধারণ ভারতবাসী যে সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থক নয় সে কথা বুঝিয়ে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা সংযত করতে চেয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থন না করেও তিনি ইংরেজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের মূলে রয়েছে ব্রিটিশের দীর্ঘ অপশাসনের ইতিহাস, এই অপশাসনের প্রতিকার প্রয়োজন।

এনফিল্ড রাইফেলে দাঁত দিয়ে কেটে যে টোটা ব্যবহারের আদেশ সিপাহীদের দেওয়া হয়েছিল তার মোড়কটি গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো এই জনরব থেকে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। তাদের মনের মধ্যে তখন থেকেই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্র এই সময়ে গভর্ণমেন্টকে সিপাহীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ প্রশমনের উপদেশ দেন। তিনি বলেন শুধু দমন-নীতি কোন কাজে আসবে না। এপ্রিল মাসে বিদ্রোহ পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দু-পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে বন্দুকের টোটায় গরুর চর্বি ব্যবহার দ্বারা ধর্মনাশের সম্ভাবনায় এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেনি। সিপাহীদের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ গভীর অসন্তোষই এর কারণ ["...it was neither fat of oxen nor the dread of proselytism but a deep seated cause of estrangement that led to to these mutinious outbreaks."—H. P 2.4.'57]

এই মন্তব্যটিতে আরও বলা হয় যে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীতে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা ভর্তি হয়, ভারতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থা এমন নয়। ভারতীয় সিপাহী ভর্তি করার সময় তাদের সামাজিক অবস্থা বিচার করেই তাদের নেওয়া হয়, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষেরা সাধারণ ভাবে চরিত্রবান ও সৎ বলে ভারতীয় সিপাহীদের মনে সুস্থ প্রভাব বেশ ভালভাবেই পড়ে থাকে। গুরুতর ধরণের নিপীড়ন অথবা তাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ ধ্যান-ধারণার উপর আঘাত ব্যতীত দেশীয় সিপাহী কখনই তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অথবা কর্তব্য লঙ্ঘন করতে পারে না।

…তবে কি কারণে সিপাহীদের মধ্যে তাদের ইউরোপীয় সেনাপতিদের উপর বিশ্বাস ও আস্থায় চিড় ধরেছে? এর উত্তর একটাই আছে, সিপাহীদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের অভাব অভিযোগ দেখার ভার যাদের উপর ন্যস্ত তারা তাদের উপর ন্যস্ত পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে অবহেলা করেছে ··অতি দ্রুত বিনা কালব্যয়ে গভর্ণমেন্টের উচিত সিপাহীদের এই মনোভাব শান্ত করা···বিলম্বে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ["Nothing short of grievous oppression or the most flagrant disrespect of substantial prejudices can drive the native soldiery to conduct foreign to their obligations and their duty. Without the utmost provocations to insubordination the sepoy scarcely ever raises his hand against his superior. It is not his constitution to do so. The precepts of his religion forbid his perpetrating such a deed …What then has loosened the ties that hitherto held them to cordial military union with their European leaders? The answer is easy to give. Those whose province is to look to their interest and give heed to their complaints are singularly neglectful of their high and important trust···the aspect of affairs is by no means encouraging and the wisdom of the government will not be wasted in devising prompt and efficient measures for arresting the progress of the evil whilst yet the disease may be cut out…" The Mutinies—H.P. 2.4.1857]

ব্যারাকপুর বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার পর ১৯ নং পদাতিক বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। ৯ই এপ্রিল একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশচন্দ্র লেখেন যে এই ব্যাপারটিতে সিপাহীরা ভয় পেয়ে যাবে, বিদ্রোহ শান্ত হয়ে পড়বে—কর্তৃপক্ষের এই আশায় ছাই পড়েছে...মনে হচ্ছে সিপাহীদের আনুগত্যকে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। …সবগুলি বারুদ সিপাহীদের চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেললেও তাদের মনের অসন্তোষ দূর করা যাবে না। তাদের অসন্তোষের কারণ তাদের মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে।…এরাই একদিন ইংরাজের হয়ে লড়াই করে তাদের পক্ষে ভারত জয় সম্ভব করে দিয়েছিল। সিপাহীদের মনে আজ একটি স্থায়ী পরিবর্তন এসেছে···["…The disaffection is too deep rooted to be removed…Such feeling has not been engendered in a day and they can not be cured in a day. It is admitted on all hands that a permanent change on in the

relations of the men to their officers, and in the spirit of thc army…" The Mutinies, H.P. 9.4.57.]

সিপাহীগণ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের কয়েকদিন পর ২১মে হিন্দু-পেট্রিয়টের একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে "অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞের মত এই যে মাত্র তরবারির সাহায্যে ইংরাজের পক্ষে ভারত শাসন সম্ভব…ভারত গভর্ণমেণ্টের পেছনে গণ-সমর্থনের অভাব কতখানি গত কয়েক সপ্তাহের দুঃখজনক ঘটনাবলীই তা দেখিয়ে দিয়েছে। গভর্ণমেণ্টের বেতনভুক যে সিপাহীরা ভারত গভর্ণমেণ্টের শক্তি-স্তম্ভ তারা বিদ্রোহ করে বসেছে, এটা আর 'মিউটিনি' স্তরে নেই, এটা এখন 'রিবেলিয়েন' (ব্যাপক বিদ্রোহ)। সম্প্রতি সঙ্ঘটিত বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ দেশবাসীরও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরি নিয়েছে শুধু এই জন্যই সিপাহীগণ তাদের নাগরিক অধিকার ও জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করবে এটা কেমন করে আশা করা যায়? তারা বিশ্বাস করেছে যে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়েছে; এই ধর্ম বিশ্বাস তাদের কাছে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আনুগত্যের চেয়েও মূল্যবান। এই কারণে তারা তাদের জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ সৈনিক জীবনের সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে বিপদ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং ভারতবাসী তাদের একটা পবিত্র ও জাতীয় উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ সংগঠন রূপে গ্রহণ করে অনেকে নিজেরাও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। ভারতের পুরাতন রাজধানীর দিকে তারা ছুটে গিয়েছে, এবং প্রাচীন রাজবংশের একজনের প্রতিই তারা আনুগত্য স্বীকার করছে।…সিপাহীদের অসন্তোষ দূর করার কোন চেষ্টা এ যাবৎ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে করা হয়নি…" অতঃপর হরিশ্চন্দ্র লিখেছেন যে সম্প্রতি একটি ঘোষণায় গভর্ণর জেনারেল জানাচ্ছেন যে সিপাহীদের অথবা জাতীয় জনগণের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানা বা তাদের ধর্মনাশ করার কোন দুরভিসন্ধি গভর্ণমেণ্টের নেই, কতকগুলি লোক শুধু অন্যায় ভাবে লোকের মনে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে।

গভর্ণমেণ্ট যে দেশের লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন—এতে কলকাতার ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা এই ধরনের সরকারী বিবৃতিকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দুর্বলতার চিহ্ন রূপে নিন্দা করেছিল। হরিশ্চন্দ্র ভারতবাসীর ক্ষোভ শান্তির জন্য গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান জানিয়ে লেখেন যে ভারতের অধিবাসীরা একটি সুসভ্য জাতি। এই সুসভ্য ও শক্তিমান জাতির মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা রাখলে তবেই ব্রিটিশ রাজত্ব টিকতে পারবে নচেৎ এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কারণ ভারতবর্ষে এমন একটি মানুষ নেই যে ব্রিটিশ শাসনজাত বহু দুঃখ কষ্ট ভারে পিষ্ট নয়। এই দুঃখ দৈন্য বিদেশী শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে বিজড়িত। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রই জানে যে

বিদেশী শাসনের নাগপাশে তাদের কোন উচ্চাশাই সাফল্যের পথ খুঁজে পাবে না। এই মুহূর্তে প্রতিটি দেশীয় ব্যক্তির মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যই হল এদেশের মানুষের ধর্মনাশ করে তাদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দান। শিশু এবং নারীদেরও এই ধারণা, পুরুষদের কথা বলাই বাহুল্য। ইউরোপীয় সভ্যতার গুণ-মুগ্ধ মুষ্টিমেয় বাঙালী বাবু ছাড়া সবাই গভর্ণমেণ্টের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। ["That England's dominion over India is upheld by the sword is an essential article of political creed of many, if not a majority of British politicians. That it shall have no other support but the sword is, unfortunately the result, if not the object, of the labours of a no small section of British politicians. How slight is the hold the British government has acquired of its Indian subjects has been made painfully evident by the events of the last few weeks. The native mercenaries who constitute the chief portion of the physical strength of the Govt, have for sometime been in mutiny, open or concealed. It is no longer a mutiny but a rebellion. Perhaps, it will be said that all mutinies when they attain a certain measure of success, rise to the dignity of a rebellion. But the recent mutinies of Bengal army have one peculiar feature—they have from the beginning drawn the sympathy of the country. The Sepoys who in accepting service under the British Govt. neither relinquished the rights of citizenship nor abnegated national feelings, have been led to believe their national religion in danger. They have rebelled against their authority which they have sworn to obey, and the for-sworn men are deemed by their countrymen justified in sacrificing a minor obligation to a paramount one. They have hazarded all their most valuable interest, and their countrymen view them as martyrs to a holy cause and a great national cause. The mutineers have been joined and aided by the civil population. They have hastened towards the ancient capital of the country where resides the remnant of the former dynasty to which are turned in times of political commotion the eyes of all legitimists…(Referring to the proclamation of the Governor

General)…There may be those who will construe this declaration of the Govt. of India into an act of concession, a confession of weariness. With such critics and politicians we have no common ground of thought or sympathy……There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule. There is not one among the educated classes who does not feel his prospects circumscribed and his ambition restricted by the supremacy of that power. At the present moment, the conviction is ineradicably strong in the mind of every native—save the small circle in Bengal of those who have been indoctrinated into the mysteries of European civilization—that the British government is actuated by a fixed purpose of destroying the religion of the native races, and of converting them to Christianity. Women and children talk of it…We hold of no small value, every frank declaration which the Govt. may at the present time be impelled to make of the nature now promulgated. The Govt. of British India can afford to lay open its imost thought on occassions of such evil" ……The Country and the Government—H. P. 21. 5. 1857]

কলিকাতার আর্মানী, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ যে মাসের শেষ দিকে লর্ড ক্যানিং এর নিকটে একটি আবেদন করেন যে কলকাতা শহর বিপন্ন, একে রক্ষা করার জন্য তাদের একটি রক্ষীবাহিনী গড়তে অনুমতি দেওয়া হক। ক্যানিং এই প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করেন নি, তবে তিনি পরে এদের রক্ষী বাহিনী বা 'ভলণ্টিয়ার গার্ডস' গঠনে সম্মতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্র কলকাতায় আতঙ্ক (Panic in Calcutta) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন—"কলকাতা শহর কি সত্যই বিপন্ন? মাত্র দু'হাজার সিপাহী যদি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী লুট করতে সক্ষম হয় এবং যদি তারা তরবারির ভয় দেখিয়ে বিনা বাধায় কলকাতার সব বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে তবে ধরে নিতে হয় যে শুধু কাপুরুষে পূর্ণ এ নগরীর বঙ্গোপসাগরের নীচে নিমজ্জিত হওয়াই শ্রেয়। [“… …We seriously ask, is Calcutta really in danger? If two thousand sepoys can loot the metropolis of British India, put every citizen to the sword and burn or pillage without let or

hindrance then the metropolis of British India has no business to encroach upon the map of the country and the Bay of Bengal would perform a grateful service by washing away the doomed city into the Indian Ocean." Panic in Calcutta—H. P. 28.5.57]

শান্তিরক্ষার অজুহাতে কলকাতার বেসরকারী ইউরোপীয়দের উদ্যোগে গঠিত 'ভলন্টিয়ার গার্ডস' বাহিনীর কাজকর্মের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ তীব্র জাতি বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছে। ভারতবাসী মাত্রকেই এরা সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং ভারতীয় মাত্রেরই উপর নিপীড়ন চালাতে এরা গভর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করছে। এদের দ্বারা সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী রক্ষী বাহিনী ভেবেছে যে তারা সরকারী লোক, কোন আইন মেনে চলার দায়িত্ব তাদের নেই, যে কোন দেশীয় ব্যক্তিকে নির্যাতন বা হেনস্তা করার অধিকার যেন এরা পেয়ে গিয়েছে। এদের দৌরাত্ম্যে রাত্রিবেলা যে কোন ভারতীয় তা তিনি যতই সম্ভ্রান্ত ও চরিত্রবান্ হোন না কেন পথে বেরোলেই এদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে থাকেন। [The Metropolis and its Safety. H. P. 18.6.57, 25.6.57]

সিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি তীব্র ভারত বিদ্বেষ প্রচার শুরু করেছিল। তারা চেয়েছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসা উঠিয়ে দেওয়া হোক, ইউরোপীয় ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (Volunteer Guards) গঠিত করে তাদের হাতে শান্তি রক্ষার ভার দেওয়া হোক, দেশীয় দারোগাদের বরখাস্ত করে পেন্সন প্রাপ্ত ইংরাজ অথবা ফিরিঙ্গি সার্জেন্টদের এই পদে বসানো হ'ক। সমস্ত বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হক, ভবিষ্যতে যে কোন বাঙালী যেন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে না বসতে পারে তারও ব্যবস্থা নেওয়া হ'ক। দেশের যে সিভিল সার্ভিস রয়েছে সেখানে নীলকরদের অথবা তাদের শ্বেতকায় কর্মচারীদের বসানো হ'ক। এই সব আব্দার অভিযোগের সঙ্গে বাঙালীদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিও কটাক্ষ করা হত। যে সব কাগজে এই তীব্র দেশীয় বিদ্বেষ বিশেষ করে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করা হত সেগুলির মধ্যে ছিল 'ইংলিশম্যান' 'বেঙ্গল হরকরু' ও 'ফিনিক্স'। হরিশ্চন্দ্র দিনের পর দিন এই সময় ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলির মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্রিটিশ ভারত জয় করে নিয়েছে। একদিন না একদিন বিজিত ভারতবাসীর বিক্ষোভ ফেটে পড়া স্বাভাবিক এবং বর্তমানে তাই ঘটেছে। মুঘল সম্রাট্‌কে তারা এই জন্য ভারতের সিংহাসনে বসিয়েছে। ["The British

empire in India is now for instance, passing through a crisis the occurrence of which some day or other was certain……… conquest begot legitimacy and legitimacy has begotten sedition……It is only a matter of wonder that so many years should have passed before an armed effort should have made to reseat the Great Moghul on the throne of India……"The English Press and the Natives 9. 7. 1857]

ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি বিশেষ করে ফিনিক্স কাগজে একটি সুপারিশ করা হয়েছিল যে দেশীয়দের যে উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের ব্যবস্থা আছে (unconvenanted service) সেখানে শুধু ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গিদের নেওয়া উচিত কারণ এই পদে যে বাঙালী রয়েছে তারা সব অযোগ্য কারণ 'নেটিভরা' নেটিভ ছাড়া আর কিছু নয়। হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্যটিকে ধৃষ্টতা ও অবিবেচনা প্রসূত (audacity, not to say the impudence) আখ্যা দিয়ে লেখেন যে মোটা বেতনের 'আনকভেনেণ্টেড' চাকরীতে ইউরোপীয় ও এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান অযোগ্য ব্যক্তিদেরই সংখ্যাধিক্য রয়েছে। বাঙালী ও অন্যান্য দেশীয়রা ওদের চেয়ে অনেক বেশী কর্মদক্ষ। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র এই ভবিষ্যদ্বানী করেন যে একটা দিন খুব বেশী দূরে নেই যখন উচ্চ পদে নিয়োগের কালে যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। তখন আর সাদা চামড়ার যুগ থাকবে না, ভারতীয়েরাই অধিক সংখ্যক পদগুলি যোগ্যতার গুণে দখল করে নেবে (H. P., 9. 7. 57)। ঐ দিনই আর একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে বাঁদরের হাতে অস্ত্র দিতে নেই, বাংলায় এমনি একটি প্রবাদ আছে। 'ভলন্টিয়ার গার্ড' বাহিনী গড়তে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন। ["There is a Bengali proverb 'Don't put a spade into the hands of a monkey'. We beleive that the putting of authority into the hands of amateur soldiers is much more flagrant act of impudence."—H. P. 9. 7. 1957]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গভর্ণর জেনারেল একটি আইন জারী করে আতঙ্ক সৃষ্টি কারক অথবা রাজদ্রোহ জনক রচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজগুলি (ইংলিশম্যান, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল হরকরু) ও ঢাকা থেকে ইউরোপীয় পরিচালিত 'ঢাকা নিউজ' প্রভৃতি দিনের পর দিন আতঙ্ক জনক গুজব প্রচার করছিল, এরা চাইছিল বাংলায় অবিলম্বে সামরিক আইন জারী করা হোক। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহের সময়ে যথেষ্ট ধৈর্য রেখে চলেছিলেন, অযথা দমন নীতি গ্রহণেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। এদিকে কলকাতার ইউরোপীয় ও অ্যাংগ্লো

ইণ্ডিয়ান সমাজ ইংলণ্ডে ক্যানিং-এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। ৫ই জুন তারিখে হিন্দী ও বাংলায় প্রকাশিত 'দৈনিক সমাচার সুধাবর্ষণ' একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল যে লর্ড ক্যানিং এতদূর ভয় পেয়ে গেছেন যে রোজ সকালে তিনি ব্যারাকপুরে ও দমদমের সৈন্য নিবাসে গিয়ে সিপাহীদের সেলাম করে আসেন। এই সব কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন লর্ড ক্যানিং-এর পূর্ব কথিত য়্যাক্ট জারী হয়, এর কার্যকাল বা মেয়াদ ছিল একবৎসর। এই য়্যাক্ট ইউরোপীয় ও দেশীয় পরিচালিত দুই ধরণের সংবাদপত্রের প্রতিই প্রযোজ্য হওয়াতে ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি লর্ড ক্যানিং এর উপর খুব বিরক্ত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র এই 'গ্যাগিং য়্যাক্ট' এ ভীত হননি, তিনি লিখেছিলেন যে বাস্তবে এই আইনের কবলে আমরা পড়ব কিনা জানিনা, তবে এই আইন আমাদের এই পত্র পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাদের ইংরাজী সহযোগীরা এই য়্যাক্টের বিরুদ্ধে খুবই উত্তেজিত হয়েছে, এদের এই ইচ্ছে ছিল যে এই আইন শুধু দেশীয় কাগজের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হ'ক। কিন্তু কার্যত সকলকেই এই আইন মেনে চলতে হবে। ["Our English contemporaries are dissatisfied with this measure...... Their great grievance is that the native press alone was not subjected to its operation"—H. P. 18. 6. 57]

সিপাহী বিদ্রোহের শুরু থেকেই কলকাতার ইউরোপীয় ও য়্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান ও দেশীয় খ্রীষ্টানেরা সম্মিলিত ভাবে আতঙ্ক ছড়াতে ব্যস্ত ছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কলকাতার নিরীহ হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উপর দমন নীতি চালাতে এরা গভর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করেছিল। লর্ড ক্যানিং বিচক্ষণতার সঙ্গে এই শ্রেণীর পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন। অবশ্য কলকাতায় তিনি ভলন্টিয়ার গার্ডস গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং এই সুযোগে এরা কলকাতার নিরীহ দেশীয় নাগরিকদের উপর জুলুম চালিয়েছিল। ১৮ জুলাই তারিখে কলকাতার 'গ্রাণ্ড-জুরী' গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি আবেদনে জানিয়ে ছিল যে মহরম আসন্ন, এই সময় কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের দেশীয় মানুষদের কাছে যে অস্ত্র শস্ত্র আছে তা কেড়ে নেওয়া হ'ক এবং এদের কাছে বন্দুক, রাইফেল বা টোটা ইত্যাদি বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হোক্। হরিশ্চন্দ্র এই আবেদনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। গভর্ণমেণ্টও এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তবে এমন একটি আইন প্রবর্তনের কথা বলা হয় যে অতঃপর যার কাছে বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র আছে তা 'রেজিষ্ট্রী' করাতে হবে এবং এর ব্যবহারেরর উপর ও বিধিনিষেধ আরোপিত হবে। ২৫ জুলাই এর এই সরকারী ঘোষণায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এর ফল দেশীয় লোকদের বাড়ি থানা তল্লাসী করা হবে। যদি এই আইন প্রবর্তন করতে হয় তবে যেন এই কাজের ভার দায়িত্বজ্ঞান

সম্পন্ন মানুষের উপর দেওয়া হয়। ["It may be the most innocous of the many plans suggested on the present occasion. It may be turned into an instrument of as much annoyance as a law authorising the search of houses for arms. Whatever be the course adopted we trust that the execution of the measure may be entrusted to hands accustomed to the responsible discharge of such delicate tasks." The disarming question—H. P. 30. 7. 1857]

বেসরকারী ইউরোপীয় ও ইঙ্গ ভারতীয়দের দ্বারা উত্থাপিত সামরিক শাসন জারীর দাবি লর্ড ক্যানিং অগ্রাহ্য করলেও তিনি একটি নূতন আইন জারী করেন (Act16 of 1857)। এই নূতন আইনে যে কোন দুষ্কৃতিকারীর তাৎক্ষণিক বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা হয়। হরিশ্চন্দ্র এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিহারের যে কয়টি জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে সেখানে সামরিক আইন চালু করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই প্রেসিডেন্সিতে ষোড়শ আইন (Act 16) চালু করার অর্থ এই যে বিদ্রোহের সঙ্গে সংস্রব শূন্য বাঙালী ও বিহারী জনসাধারণের উপর অযথা অত্যাচারের পথ খুলে দেওয়া হল। কারণ এই আইনে শুধু দোষীরই শাস্তি হবে এমন আশা কম, বহু নির্দোষীরই উপরেও নিপীড়নের খড়্গ নেমে আসবে। ["It will not do to say that the present measure will affect the guilty alone. It is of the essence of coercionary laws of the character of the one under which were are now put that in the administration, promptitude of action should be preferred to fulness of deliberation. The form of law which compel a tribunal to hear patiently and judge discriminiately are swept away, not without largely increasing the chances of misdecision, and misdecision specially on the side of vigour. Under any circumstances much oppression and some injustice are sure to follow the active operation of such laws. But in the pecular circumstances of this country, the evils are likely to assume extraordinary proportion." Terrorism in Bengal, H. P. 6. 8. '57]

এই প্রবন্ধটিতেই হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এখন ধান ও নীল বোনার সময়। নীলকুঠির সাহেব ও তার লোকজন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য করতে চাইবে, প্রজারা তা মানবে না; সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ করবে। তখন নীলকুঠির গোমস্তা, নীলকুঠির একটা চালাঘরে আগুন লাগিয়ে প্রজাদের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের

অভিযোগ আনবে। তারপর সে জেলার সহঃ ম্যাজিস্টেটের কাছে ছুটে যাবে। এই সহকারী ম্যাজিস্টেটে'র হাতে ষোড়শ আইন প্রয়োগের অধিকার দেওয়া আছে। নীলকরদের বন্ধু এই ম্যাজিস্ট্রেট স্বভাবতই দেশীয় লোকদের প্রতি বিদ্বিষ্ট, তিনি তাঁর অবাধ ক্ষমতা বলে এই দরিদ্র নিরীহ প্রজাদের বেশ কয়েক বছর শ্রীঘর বাসের আদেশ দিয়ে দেবেন। আমাদের কল্পিত এই কাহিনী বাস্তবে যে অনেক ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র সরকারের নিকট এই প্রার্থনা জানান যে সুস্পষ্ট রাজদ্রোহ বা বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছাড়া যেন অন্য কোন ব্যাপারে এই ষোড়শ আইন ব্যবহৃত না হয়। অন্য কোন শান্তি ভঙ্গের ঘটনাগুলি যে ভাবে বিচার হয় সেই ভাবেই যেন বিচারের ব্যবস্থা হয়। দমনমূলক ষোড়শ আইন গভর্ণমেণ্ট যদি চালু রাখতেই চান তবে এই বিচারের অধিকার শুধু মাত্র যেন জেলার সেসন জজকে দেওয়া হয়।

পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র ব্যঙ্গ করে লেখেন যে আমাদের শাসন কর্তাগণ আশাকরি চাষীদের লাঙ্গলের ফাল ও কাস্তেগুলিকে ব্রিটিশ রাজ উচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃতব্য মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ["...Our legislators will, we hope, at least see the necessity specifically excepting plough shares and pruning knives from the list of dangeous arms putting the British Indian Govt. in danger"—H. P. 6. 8. 57]

সিপাহী বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের কয়েকমাস পর আগস্ট মাসে কলকাতার ইংরেজ, য়্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান ও দেশীয় খ্রীষ্টানেরা অত্যন্ত গোপনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। এঁরা ২৫৩ জনের স্বাক্ষরিত এই দরখাস্তে দেখাতে চেয়েছিলেন যে বর্তমান ধাঁচের ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক ধাঁচের এই সরকার (constitutional govt.) ভারতে অচল, এখানে চাই জবরদস্ত সামরিক শাসন, ভারতবাসী বর্তমানে মত—প্রকাশের যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা তুলে নিতে হবে। এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন রোধ করতে হবে ইত্যাদি। এই আবেদনে লর্ড ক্যানিংকে গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে অপসারণের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিছুকাল পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়গণ তাদের এই দরখাস্তটি আবেদনকারীদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে গভর্ণর জেনারেলের মাধ্যমে প্রেরিত না হলে এই আবেদনটি গ্রহণ করা হবে না। যাইহোক এই দরখাস্তের মূল বক্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় এই মন্তব্য করেন যে দরখাস্তকারীরা খুবই হুঁশিয়ার ও সেয়ানা কারণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের শাসন ব্যবস্থা উন্নত করার একটা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বানচাল করাই এর উদ্দেশ্য। যে সব ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতা ভারতে উন্নততর শাসন ব্যবস্থা

প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক তাদের মন ভারতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেবার জন্ত সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাগুলি অতিমাত্রায় বিকৃত ও বীভৎসরূপে চিত্রিত করে এঁদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে এমন বহু সৎ লোক আছেন, যারা এই অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এই দরখাস্তকারীদের বোঝা উচিত যে ভারতবর্ষের মত বিরাট একটা দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষকে দুর্দশাগ্রস্থ ও বঞ্চিত রাখার পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। এই দরখাস্তকারী ভারতবিদ্বেষী ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষে বাস করে থাকে, কিন্তু তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে এরা উদাসীন, ভারতে থেকেও এরা ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করতে চায় না। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র এদের ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভারতের মানুষের সঙ্গে এক হয়ে ভারতের স্বার্থের জন্ত সংগ্রাম করতে এমনকি নেতৃত্ব করতেও আহ্বান জানান। ["···Let them join the people—and they will have lead and all that is justly due to British Indian no British Ministry can deny" [The Rebellion, H. P. 13. 8. 57]

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাকালের কয়েকমাস পর এলাহাবাদ ও বারাণসীতে বিজয়ী ইংরাজ সৈন্তরা এই দুই স্থলেই, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও গণ হত্যায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে লর্ড ক্যানিং ৩০ জুলাই একটি ঘোষণায় এই ধরণের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেন। ক্যানিং এর নির্দেশে প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief) তাঁর অধীন সেনাপতিদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দেন। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষেরা যেন মনে রাখেন যে বিদ্রোহ অন্তে এদেশের শাসন দায়িত্ব ইংরেজদের হাতেই থাকবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে যদি তাদের বহু প্রিয়জনের হত্যাও জায়া-জননী বা কন্থার উপর অত্যাচারের কাহিনী স্মৃতি গাঁথা হয়ে যায় তবে ইংরেজদের দেশ শাসনের কাজ আরও অনেক বেশী দুরূহ হয়ে উঠবে। ["Our military commandars ought to remember that after the rebellion is over, the country will have to be reoccupied and regoverned. It will not add to the facility or efficiency of the work of administration to have among the people thousands of men brooding over the number (as they will continue to think it) of innocent relatives or the dishonour of their mothers, sisters and wives···"—Discipline and Revenge H.P. 13. 8. 57.)

১০ই সেপ্টেম্বর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ক্যানিং উপদ্রুত এলাকার প্রশাসন কাজে নিযুক্ত রাজ কর্মচারীদের কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন এই নির্দেশগুলি একশ্রেণীর ইউরোপীয়-

দের দ্বারা কঠোর ভাবে নিন্দিত হয়েছে। লর্ড ক্যানিং জানেন যে বিদ্রোহ অন্তেও ব্রিটিশ রাজকে দেশ শাসন করতে হবে, কাজেই প্রতিহিংসার পথ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি লেখেন যে প্রচুর ব্রিটিশ সৈন্য এদেশে আমদানি করা হয়েছে, এরা বিদ্রোহ প্রশমিত করতে পারবে কিন্তু উত্তর ভারতের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে বেয়নেটের গুঁতো অথবা ফাঁসি কাঠে ঝোলোনোর মত সংখ্যাধিক্য কি তাদের আছে? 'ব্রিটিশ সৈনিকেরা একাজ রুচিকর মনে করবে কি? যদি ধরা যায় যে ব্রিটিশ সৈনিকদের পক্ষে যে কোন নৃশংসতার কাজ সম্ভব তবুও তাদের পক্ষে একটি একটি গুণে গুণে নব্বই লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা, নির্বাসিত করা অথবা জেলে বন্দী করে রাখা কি সম্ভব হবে? সম্ভব হোক বা না হক 'রক্ত চাই' ধ্বনি-বাজরা বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ ও তাদের মুখপত্র সমূহ তাই চাইছে, লর্ড ক্যানিং এর নীতি তাদের পছন্দ নয়।

হরিশ্চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও লেখেন যে বিদ্রোহ দমনে একটু সাফল্য আসতে না আসতেই বিদ্রোহীদের উপর যে নির্মম প্রতিহিংসা নেওয়া হচ্ছে কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। ৬ জুন থেকে ১৬ জুলাই এর মধ্যে এলাহাবাদে ৮০০ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। একজন 'শিখ' সৈন্যকে সিপাহীরা হত্যা করেছিল, তার জন্য সমগ্র বাহিনীকে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য এলাহাবাদ শহরের অধিবাসীদের উপব ঝাঁপিয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার নেইলের (Brig. Neil) বেনারস থেকে এলাহাবাদ প্রত্যাবর্তনের পথ নিবীহ গ্রামবাসীদের মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, এই গ্রামবাসীরা সকলেই যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে এসেছিল এমন নয়। নদীর দুধারে মাইলের পর মাইল ধরে অবস্থিত সমস্ত গ্রামের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সামান্য সংখ্যক বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করতে বহু জনের উপর অত্যাচার হয়েছে এবং এত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও বিদ্রোহ শান্ত করা যায় নি। লর্ড ক্যানিং-এব ঘোষণায় ব্রিটিশ সৈনাধ্যক্ষ ও সাধারণ প্রশাসকদের জনসাধারণের উপর অত্যাচার সংযত করাব নির্দেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখেন এই ঘোষণাটি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মর্যাদাসূচক ["The course suggested in the minute is not unsuited to the dignity of the Govt., and it has many recommendations..." The Policy for the Times, H. P. 10. 9. 57]

লর্ড ক্যানিং এর ঘোষণা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্রতিশোধ স্পৃহা সংযত হয়নি। 'সামরিক প্রভুত্ব' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন দানাপুরে ১০ সংখ্যক পদাতিক বাহিনীর সৈন্যেরা বিনা প্ররোচনায় বহু গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লে: গভর্ণর জে পি

গ্রান্ট হুকুম জারী করেছিলেন যে গভর্ণর জেনারেলের বিনা সম্মতিতে যেন কোন ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা না করা হয়। তা সত্বেও জেনারেল নীল বহু লোককে স্বইচ্ছায় ফাঁসি দিয়েছেন। এই জেনারেল কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের বন্দী করে রেখেছেন এই উদ্দেশ্তে যে সিপাহীরা যদি লক্ষ্ণৌ এ অবরুদ্ধ ইংরাজ মহিলাদের উপর কোন অত্যাচার করে তবে এর বদলা হিসেবে এই বন্দিনী ভারতীয় মহিলাদের ইংরাজ সৈন্যদের হাতে তাদের লালসা তৃপ্তির জন্য বিলিয়ে দেওয়া হবে। হরিশ্চন্দ্র ঘটনাগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই অমানুষিক অত্যাচারগুলি বন্ধের দাবী জানান। এই সঙ্গে তিনি লেখেন যদি লেঃ গভর্ণর গ্রান্টের আদেশের পরোয়া না করে জেনারেল নীলকে যা খুসি তাই করতে দেওয়া হয় তবে মিঃ গ্রান্টকে মেকি রাজ প্রতিনিধি রূপে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে না রেখে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা উচিত। এই যুদ্ধে যদি প্রতিহিংসা ও খতমের নীতিই শিরোধার্য হয় তবে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং রাজ্য শাসনভার একদল কষাই বা ঘাতকের হাতে দিয়ে নিজে যেন সরে দাঁড়ান। ভারত যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি হয় তবে যুদ্ধ দেবতার চেয়ে করুণা দেবীর উপাসনাই এখন কর্তব্য। উত্তর ভারতের অসামরিক জনতাকে নির্বিচারে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। ["We regret to perceive that revenge has been set up as an idol in the place of civilized mercy...

The 10 foot army at Dinapur assasinated in cold blood men who resisting every temptation, setting a noble example of loyalty to an army where mutiny had become the rule...J. P. Grant the Lt. Gov. issues an order prohibting military Commanders from hanging men without the previous order of the G. G. General Neil set the order in defiance and proceeds to add to the law obtained by the seizure of respectable native females in gross imitation of the savages...It is said that General threatens to give up these females to the licentiousness of his soldiery should any of the English women in Lucknow be maltreated ...We hope Govt. will adopt stringent measures for vindicating the discipline of its European soldiery at the present crisis and protect such of its native subjects...Mr. Grant's authority should either be upheld against the bravado of General Neil or Mr. Grant should be at once recalled from his mock viceroyalty. If the present war be a war of revenge and exter-

mination, then Lord Canning and the members of the council should abdicate their functions in favour of a Committee of Butchers. But if India be still looked upon as the brightest jewel in the crown of England let Themis overrule Mars and the non military population of upper India be saved from capricious and unlimited hanging"—Military Dammation, H.P. 17.9.1857]

সিপাহী বিদ্রোহ কালে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্পষ্ট ভাষণে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। 'ভারতবাসীর মুণ্ড চাই বা রক্ত চাই' ভারতবাসী ইংরাজ ও ইংলণ্ডের একশ্রেণীর ইংরাজদের এই আবদারে লর্ড ক্যানিং সাড়া দেননি। বিদ্রোহ দমনের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন. কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে তাঁর সম্মতি ছিল না। বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে নিরীহ ভারতবাসীর প্রতি যাতে অত্যাচার না হয় সেদিকে তিনি যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর ৩০ জুলাই এর ঘোষণাটির জন্য ইংলিশম্যান কাগজই তাঁকে ব্যঙ্গছলে Clemency Canning (দয়াময় ক্যানিং) আখ্যা দিয়েছিল।

ভারতবাসী পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিশেষতঃ ইংরাজি সংবাদপত্র রূপে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু-পেট্রিয়ট একক ভাবে ইউরোপীয় সমাজের এই জিঘাংসা প্রবৃত্তির তীব্র সমালোচনা চালিয়েছিল। নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে প্রত্যহ বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীপুরে লোক পাঠিয়ে লর্ড ক্যানিং অনেকগুলি হিন্দু-পেট্রিয়টের সংখ্যা সংগ্রহ করতেন। এই সময়ে বুধবার সন্ধ্যাবেলা পেট্রিয়ট প্রকাশিত হত। এই সংগৃহীত কাগজগুলির মধ্যে ছয়টি 'কপি' ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের কাছে পাঠানো হত। লর্ড ক্যানিং দেশীয়দের মনোভাব 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' থেকে জেনে নিজের শাসন নীতি নির্ধারণ করতেন। ক্যানিং এর নীতি সমর্থন করার জন্য হরিশ্চন্দ্র ইউরোপীয় সমাজেরও বিশেষ বিদ্বেষ ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট ও তার সম্পাদকের মুণ্ডপাত এই সময় ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলির নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২৬ নভেম্বর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন যে দেশীয় মানুষেরা কি চায় সে সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের এবং শাসকদের অবহিত করাই 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। এই অনর্থ প্রতিরোধের চেষ্টাতেই 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পরিচালিত হয়ে থাকে। তিনি আরও লিখেছিলেন যে বহু ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্বেও বহু বিষয়ে বিশেষতঃ সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে হিন্দু-পেট্রিয়টে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে

তার প্রেরণা হচ্ছে ভারতীয় সমাজের স্বার্থ রক্ষা, ইউরোপীয় বিদ্বেষ প্রচার নয়। হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র গুলি হিন্দু-পেট্রিয়টকে যে সব গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, তার একটি হচ্ছে ইউরোপীয় সমাজের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য-প্রকাশ (insolence)। এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন যে 'আমরা মনে করি যে আমাদের কাগজ দেশের একটা বিরাট জন সমষ্টির প্রতিনিধি। এই জনগণের সমর্থনের জোরেই হিন্দু-পেট্রিয়ট তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করে। ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় সমাজ অতি ক্ষুদ্র অথচ তাদের কাগজগুলি এমন একটা ভাব দেখায় যে যা কিছু বলার আছে শুধু তারাই বলবে, আর কেউ কিছু বলতে গেলে তারা রক্ত চক্ষু দেখিয়ে থাকে। তারা ভুলে যায় যে হিন্দু-পেট্রিয়ট যাদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা ভারতের বেসরকারি ইউরোপীয়দের চেয়ে কম নয়।' ["We must once for all explain to our European friends that they must excuse us if we donot estimate the social or political importance of their class as they do it themselves, and if our language in speaking of them should not be uniformly so deferential as some of them desire it to be, it is because those whose organ the 'Hindu Patriot' conceives itself to be donot feel themselves at all inferior to the class of non-official Europeans in India in much that constitutes social and political importance···As it is, the paper is under no obligation to speak in terms of less than national weight and authority upon all affairs affecting the public interest and upon the conduct of all handling the public interest. For a journal thus situated and with such claims to public regard, to utter its sentiments in language, however strong···can never be justly charged as 'insolent'." —The European Community and Ourselves, H. P. 26. 11. 57]

এই সময় ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' কে সরকারী প্রচারপত্র রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল, কারণ হরিশ এদের মত ক্যানিং বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন নি। এই অপপ্রচার সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র লেখেন 'পেট্রিয়ট' সরকারী কাগজ হলে এর মালিকদের খুবই সুবিধা হত। তবে পেট্রিয়টের এক বছরের চারশটি পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দেবে যে 'পেট্রিয়ট' বহু ক্ষেত্রেই গভর্ণমেন্টের নীতির বিরোধিতা করেছে।

'সরকার সমর্থক' এই সম্মান পেতে চাইলে আমাদের কাগজের পৃষ্ঠাগুলিতে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাবে যা আমাদের এই দাবী নাকচ করে দিতে যথেষ্ট ["...but we know that our four hundred pages of typography will rise in evidence against us if we were to pretend that honour"]; হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে কিছুকাল মাত্র আগে 'পেট্রিয়ট' নীতি বিগর্হিত ও অদূরদর্শী শাসন ব্যবস্থার সমলোচনায় সকল সংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রণী ছিল। তিনি ইউরোপীয় সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন যে জনহিত সাধন ও ভারতীয়দের উপর অত্যাচার নিবারণ করাই হিন্দু-পেট্রিয়টের একমাত্র অভীষ্ট। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কোন পদক্ষেপ নিলে হিন্দু-পেট্রিয়ট গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন ও সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে। ইউরোপীয় সমাজ যখনই কোন শুভ উদ্যোগ নিয়েছে তখনি পেট্রিয়ট তাদের সমর্থন করেছে। বর্তমানে প্রশাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্বের সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় স্বার্থ জড়িত হয়ে আছে। এই জন্যই পেট্রিয়ট বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সমর্থন করছে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ অন্যদিকে এই প্রশাসনকে ধ্বংস করতে চাইছে। ["And when as now, we find our national interests bound up with those of the administration of the day, our duty is to render it our humble support" H. P. 16. 11 57]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টম্বর সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী ইংরাজ কর্তৃক পুনরধিকৃত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ শহরটিও দীর্ঘ অবরোধের পর পুনঃ উদ্ধারিত হয়েছিল। বস্তুত. এই দুটি ঘটনার পর কার্যতঃ সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হয়। তবে উত্তর প্রদেশের তালুকদার গণ ও মারাঠী বিদ্রোহী নেতা তাঁতিয়া টোপী এই বিদ্রোহকে আরও কিছুকাল সক্রিয় রেখেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ডের পর এই বিদ্রোহানল একেবারেই প্রশমিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবস্থা কিছু আয়ত্তে আসার পরও ইংরাজ তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। ক্যানিং এর দয়ালু নীতি সর্বক্ষেত্রে তাদের সংযত রাখতে পারেনি। বিদ্রোহ কিছু শান্ত হওয়ার পর হিন্দু-পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র ইংরাজের এই প্রতিহিংসা পরায়ণতার দৃষ্টান্তগুলি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি লেখেন যে সিপাহীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনীগুলি অসম্ভব রকম বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে ইউরোপ আমেরিকায় বিশেষতঃ ইংলণ্ডে প্রচার করা হয়েছে। ......ইংল্যাণ্ডের মানুষ ভারতবাসীর উপর এতদূর ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়ে আছে, যে ইংলণ্ডের যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য বাহিনী ভারতে এসে পৌঁছেছে তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে তারা শুধু ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব রক্ষা করতেই আসেনি, তারা এসেছে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং

গত জুলাই মাসে যে ঘোষণা প্রচার করেন সেই ঘোষনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল যে ব্রিটিশ বাহিনী কি নির্মমতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করছে। এথেকে অনেক সাধু প্রকৃতির ইংরাজের কাছে এটা ধরা পড়ে গিয়েছে যে ব্রিটিশের নিষ্ঠুরতার পরিমাণ সিপাহীদের থেকে কম নয় বরং বেশী। শোনা গিয়েছিল এ সম্বন্ধে তাঁরা একটা তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ...... যারা সিপাহীদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের আকাশ বাতাস বিষিয়ে দিয়েছিল পার্লামেণ্টে তর্ক বিতর্ক কালে তাদের প্রতিনিধিগণ এই আমানুষিক অত্যাচারের বিষয়ে কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। অন্য দিকে পার্লামেণ্টের এক সদস্য মিঃ রস্টন পার্লামেণ্টে বুলান্দিরের রাজাকে নৃশংসতা সহকারে কি ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করেন। বুলান্দিরের এই রাজা বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন না, বিদ্রোহীরা বিজয় গর্বে উন্মত্ত হয়ে এলাহাবাদ থেকে হিসারের পথ অতিক্রম কালে রাজাকে তাদের খাদ্য ও সাহায্য যোগাতে বাধ্য করেছিল। রাজা প্রাণ ভয়ে তাদের সাহায্য করেন। সিপাহীদের পরাজয়ের পর সিপাহীদের সাহায্য করার জন্য এই সম্রান্ত ব্যক্তিকে ফাঁসি কাঠে ঝোলান হয়েছিল। এই নিবন্ধের শেষে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে সমসাময়িক কালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকে যে চোখে দেখা হয়েছে আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যৎ কালে তা পরিবর্তিত হবে। ভবিষ্যৎ কালে যে এর নবমূল্যায়ণ হবে তার সম্ভাবনা এখনই বিদেশে দেখা দিয়েছে। ইংল্যাণ্ডবাসী ইংরাজদের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে একটা সময় আসবে যখন স্পষ্ট ধরা পড়বে যে সিপাহীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত তথাকথিত ভয়াবহ অত্যাচরের কাহিনীগুলো ছিল মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত। অপরদিকে ইংরাজের অত্যধিক জিঘাংসা মূলক ঘটনাগুলি ছিল বাস্তব সত্য। দয়ালুরূপে ধিকৃত ক্যানিং কিছু ভারতবাসীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর এই কাজের দ্বারা তিনি সমগ্র ইংরাজ জাতির নামকে কলঙ্ক কালিমায় মণ্ডিত হতে দেননি। ["History will, we conceive, take a very different view of the facts of the great Indian Revolt of 1857 from what contemporaries have taken of them. What the verdict of the posterity is likely to be may, in some measure, be anticipated from judgement of foreign nations and revulsions already taking place in English feelings. At no distant date it will be found that while the 'atrocities' were in most instances unreal creations of morbid imaginations, the retributive excesses were sad realities. "Canning's clemency" will then prove the salvation

of the English name as it has proved the salvation of many Indian lives"—The Atrocities and Retribution H. P. 6. 5. 1858]

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ জুলাই একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ইংলণ্ডে সম্প্রতি সরকারী ভাবে একটি বিবৃতির মারফৎ বিদ্রোহকালে নিহত ইউরোপীয়ানদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এটা এক পক্ষে ভালই হয়েছে কারণ এতে নিহত ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণী দেখিয়ে দিচ্ছে যে ইউরোপীয়দের যে পরিমাণ প্রাণহানি হয়েছিল বলে প্রচার করা হয়েছিল সেটা ছিল বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। ইউরোপ আর আমেরিকার জনগণ এই অতিরঞ্জিত বিবরণে বিশ্বাস করে ভারতের অধিবাসী মাত্রকেই নৃশংসতার অবতার বলে ধরে নিয়েছিল। বলা হচ্ছে যে ইউরোপীয় বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দিয়ে ভারতীয় হত্যাকারীরা (সিপাহীরা) পরে তাদের হত্যা করেছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না" (কানপুরে নানাসাহেব কর্তৃক অনুষ্ঠিত)। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র আধুনিক ইতিহাস বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে দিয়ে বলেন যুদ্ধ ও বিপ্লব কালে এমন ঘটনা ঘটেই থাকে। অতঃপর জনৈক ইংরাজ সেনাপতি প্রদত্ত একটি বিবরণের উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র দেখিয়ে দেন যে ইংরাজ সেনাপতি ও সৈনিকেরা বিনা প্ররোচনায় বহু ক্ষেত্রে নির্বিচার হত্যা ও নারীর উপর বলাৎকার চালিয়েছে। মাইলের পর মাইল জনবসতি ও শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, শত শত লোককে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েছে। যাদের প্রাণে মারা হয়নি এমন বহু মানুষের উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সুশিক্ষিত প্রশাসক ও সেনাধ্যক্ষেরা এমন কাজ যখন করেছে তখন তাদের অধীন অশিক্ষিত গোরা সৈন্যেরা যে কি করেনি তা বলা কঠিন। অতঃপর এক ইংরাজ সেনাধ্যক্ষের বিবরণ হরিশ্চন্দ্র এই ভাবে তুলে ধরেন—'আমাদের ঘাঁটি থেকে কয়েকদিন আগে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে যমুনার তীরে বিদ্রোহী জাঠ অধ্যুষিত একটি গ্রামে ক্যাপ্টেন পণ্ডের নেতৃত্বে ৮৮ জন গোরা সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। এদের সঙ্গে ৩০ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও দুটি কামান ছিল। এরা গ্রামটি আক্রমণ করে চারশজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল। এদের কেউ কামানের গোলায় আঘাতে রাস্তার উপর মরেছিল পলায়নকারী কিছু লোককে তরবারির আঘাতে মারা হয়েছিল। আমার লিখতে বেশ দুঃখ হচ্ছে যে এরপর আমাদের সৈন্যেরা মেয়েদের ধর্ষন শুরু করেছিল। এর পর সমস্ত গ্রামটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। একজন গোরা সৈন্য বহু লোক হত্যা করেছিল এবং চীৎকার করে সবাইকে উত্তেজিত করার জন্য বলে ছিল—কানপুরে আমাদের মেয়েদের অবস্থা কি

হয়েছিল, সেটা ভুলো না।' এই উক্তি দিয়ে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে এই ধরণের ঘটনাগুলি যখন প্রকাশ পায় তখন যারা এগুলিকে বীরত্বের পরিচায়ক বলে অভিনন্দিত করেছিল তারাই আজ ইংরাজের এই অত্যাচারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কহীনতা প্রতিপন্ন করতে চাইছে। যে ঘটনার কথা বল হল এর অনুরূপ বহু অত্যাচার কাহিনী আমরা গত তের মাসের সংবাদপত্রগুলি থেকে সংকলন করে দিতে পারি। হরিশ্চন্দ্র আরও লেখেন যে মেজর ইউ গল স্যার হিউ রোজকে (Sir Hugh Rose) * এমন একটি চিঠি লেখেন যার মর্ম ছিল—"আমি সমগ্র গ্রামটি জ্বালিয়ে দিয়েছি - গ্রামের প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করেছি।" রোজ এই রিপোর্ট পেয়ে পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর এই সন্তোষের বিষয়টি কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। লর্ড ক্যানিং এর উদার নীতির বিরুদ্ধে যে ইউরোপীয়গণ বিলাতে আবেদন পত্র পাঠান, আলোচ্য সংবাদপত্র সম্পাদক তাঁদের অন্যতম। [The Atrocities, H. P.-8. 7. 1858]

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্য লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'টাইমস' পত্রিকা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রাসেল (W. H. Russel) নামের এক সাংবাদিককে ভারতে প্রেরণ করেন। ইনি ইতিপূর্বে ক্রিমিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদদাতা রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রাসেল ভারতে এসে নির্ভীকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ পাঠাতে থাকেন। একটি সংবাদে তিনি জানান যে গঙ্গা যমুনার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি শহরে ঢুকে এক বিদ্রোহী নেতা ভয় দেখিয়ে জোর করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়েছিল। ইংরাজেরা তখন শহরের ধারে কাছে ছিল না, সবাই ভয়ে পালিয়েছিল। ক'দিন পর প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরাজেরা শহরটি পুনর্দখল করে। বিদ্রোহীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করার অভিযোগে ঐ শহরের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হয়। অপর একটি পত্রে রাসেল লেখেন যে বিদ্রোহের চরম অবস্থায় আমরা বহু অনুগত প্রজাকে বিদ্রোহীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে পারিনি, অরাজক অবস্থায় বিদ্রোহীদের ভয়ে যারা তাদের সমর্থন ও সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সংখ্যাও কম নয়। এই বিরাট জনসমষ্টিকে শাস্তি দেওয়া বা তাদের ঘরবাড়ি ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের চোর-ডাকাতে পরিণত করা সমীচীন হবে না। রাসেল তার প্রতিবেদনে আরও লিখেছিলেন যে সব দেখে শুনে তাঁর ব্যক্তিগত মত এই যে ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে যে শত্রুভাবোধ দেখা দিয়েছে তার জন্য আমাদের নিজেদের অসাধুতা ও দুর্ব্যবহার অনেক পরিমাণে দায়ী। হরিশ্চন্দ্র রাসেলের এই প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করে লেখেন যে মিঃ রাসেলের এই সত্যভাষণের জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। প্রথমতঃ তিনি

* ইনি মধ্য ভারতে ঝান্সীর রানী ও তাঁতিয়া তোপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।

এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে সিপাহী কর্তৃক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের কাহিনী গুলি অতিরঞ্জিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বীকার করেছেন যে ইংরেজরা বড় বেশী প্রতিশোধস্পৃহার পরিচয় দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে এটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ তিনি চেয়েছেন যে ভারতের জনসাধারণ যা কিছু অন্যায় করেছে সেটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ["It is by testimony on these three points that Mr. Russel has done the service we do highly appreciate. First, the stories of massacre and outrage have been exaggerated, and the work of retribution has gone for enough if not too far; third, the people of India deserve to have allowances made for this conduct" 'The Times' special correspodence.—H. P. 26. 8. 1858]

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা কাল থেকে হরিশ্চন্দ্র এই বিদ্রোহের কারণ, এবং এই বিদ্রোহ প্রশমনের উদ্দেশ্যে শাসকদের কর্তব্য সম্বন্ধে একক ও নির্ভীক ভাবে যে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করে এসেছিলেন একজন সত্যসন্ধ ইংরাজ সাংবাদিকের প্রতিবেদনে সেই অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। রাসেল তাঁর ভারতভ্রমণের দিনলিপি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর এই পুস্তকে (My Diary in India) হরিশ্চন্দ্রের নামের কোন উল্লেখ নেই। তবে হরিশের পরমহিতৈষী সুহৃদ ও উপরিতন কর্মচারী কর্ণেল চ্যাম্পনীজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ আছে। এই সময় চ্যাম্পনীজ মিলিটারী অডিটর জেনারেল পদে আসীন ছিলেন। কারণ সিপাহীযুদ্ধের সূচনাকালে অডিটর জেনারেল কর্ণেল গোল্ডি কানপুরে সিপাহীদের হাতে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন কর্ণেল চ্যাম্পনীজের কাছ থেকে মিঃ রাসেল হিন্দু-পেট্রিয়ট ও তার সম্পাদকের বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। রাসেলের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় না হওয়ার আর একটি কারণ থাকতে পারে। তখনকার দিনের নব্যবঙ্গ রূপে পরিচিত অনেকেই 'সাহেব-ঘেঁষা' ছিলেন, হরিশ সামাজিকভাবে ইংরাজদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। কর্ণেল চ্যাম্পনীজ, ম্যালিসন ঐতিহাসিক ও পরবর্তীকালে ক্যালকাটা রিভিউ সম্পাদক) ও তদানীন্তন কালের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যারিষ্টার মণ্টিয়োর সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব ছিল; এছাড়া আর কোন ইংরাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জানা যায় না। ইংরাজ চরিত্র হরিশ্চন্দ্র বেশ ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সাহেবদের সঙ্গে প্রচুর মেলামেশা করতেন, তাঁদের বাড়িতে সাহেবদের ভোজ লেগেই থাকত, অথচ এই দুই বিশিষ্ট বাঙালীকে বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য হতে দেওয়া হয়নি। ব্ল্যাক য়্যাক্ট সমর্থনের জন্য রামগোপাল ঘোষকেও ইংরেজরা অপমানিত করেছিল। হরিশ্চন্দ্র

সাদা চামড়ার গর্বে গর্বিত ইংরাজদের প্রকৃত মনোভাব অবগত ছিলেন বলেই সামাজিক ভাবে ইংরাজের সংস্পর্শ তিনি এড়িয়ে চলতেন। সিপাহীবিদ্রোহকালে ভারতীয় সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সভাসমিতির আয়োজন করতেন। হরিশ্চন্দ্র সাংবাদিক হিসেবে এই সব অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন পেট্রিয়টে প্রকাশ করতেন, তবে এ সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করতেন না। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে বিদ্রোহীদলের একজন সুবেদার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হরিশ্চন্দ্র বেঙ্গল আর্মির সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ কি ভাবে রোপিত হয়েছিল, তা দেখিয়ে দেন। তিনি লেখেন যে আফগান যুদ্ধ চলার সময় যে হিন্দু সৈনিকদের ঐ 'ম্লেচ্ছ' দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে ব্যক্তিগতভাবে তারা যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত তাতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। আফগান যুদ্ধে মুসলমান সৈনিকদের তাদের সমধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল, কিন্তু বেঙ্গল আর্মির সৈনিকদের কথা চিন্তা করা হয় নি। বেঙ্গল আর্মির অধিকাংশ সৈনিক ছিল অযোধ্যা-প্রদেশের মানুষ। অযোধ্যার বাদশাহকে রাজ্যচ্যুত করায় এই সৈনিকেরা মর্মাহত হয়েছিল। অতীতে সরকার অযোধ্যার বাদশাহের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল সেই চুক্তি ডালহৌসি লঙ্ঘন করে ওয়াজিদ আলি শাকে রাজ্যচ্যুত করে কলকাতায় নির্বাসিত করেন। এই বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাটি সরকারের উপর সিপাহীদের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছিল। তারপর ছিল চর্বিযুক্ত টোটার আমদানি ও ব্যবহারের আদেশ। সিপাহীরা হয়ত এই ঘটনাটিকে এত বড় করে দেখত না যদি আগে থেকে তাদের মনে সরকারের উপর আস্থা নষ্ট না হয়ে যেত।

["The greased cartridge came next. The unfortunate blunder ignited the mass of combustions which the more serious crime had collected. It is strange that there should have been any military department in India so ignorant of the feelings of the native army as to believe that a combination like a greased cartridge would be received for use by the native soldiery. But the thing might have passed off at any other season withont doing much harm, had the suspicion of the sepoys not been provoked by previous acts. H. P— June 1858]

বিদ্রোহ যত স্তিমিত হতে থাকে বিজয়ী ইংরাজ ততই হিংস্রভাবে বিদ্রোহ দমনের নামে শুধু পর্যুদস্ত বিদ্রোহীদের নয় স্থানীয় জনসাধারণের উপরেও নিপীড়ন চালাতে থাকে। ক্যানিং এর বহু-ঘোষিত দয়ালু নীতি লঙ্ঘন করার

মত ধৃষ্টতা বিজয়ী সেনাধ্যক্ষেরা দেখিয়েছিলেন। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' যেমন নিয়মিত ভাবে বিদ্রোহ, তার অগ্রগতি অথবা তার অবনতির সংবাদ প্রকাশ করত ঠিক তেমনি ভাবে বিজয়ী ইংরাজের অত্যাচার কাহিনীগুলিও তুলে ধরত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে মথুরা জেলায় বহু লোককে বিদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে. বহু গ্রাম বিদ্রোহীদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় ১৫০টি গ্রামের তালুকদারের হাত থেকে তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত করে, নতুন লোকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্যবলে বলীয়ান ইংরাজ সরকার এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরে কোটি কোটি ভারতীয়ের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে। এই দেশীয় সৈনিকদের সাহায্য ছাড়া তারা এই সুযোগ ভোগ করতে পেত না। যে সম্ভ্রম-বোধের উপর দেশীয় সৈনিকেরা ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল সেই সম্ভ্রমবোধকে ইংরাজদের দুর্ব্যবহার ও অদূরদর্শীনীতি টলিয়ে দিয়েছিল, তাই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিদ্রোহ প্রশমিত করে ইংরাজদের উচিত ছিল শুধু প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ফিরিয়ে আনা। সরকার অযোধ্যায় সে পথে চলেনি, নির্বিচারে তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে, তার উপর আবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নতুন করে বেশি টাকার বিনিময়ে বিলি করে অন্যায়ভাবে সরকারী আয় বাড়ানো হচ্ছে। সরকার সম্পত্তিচ্যুত এই সব তালুকদারদের জীবিকার জন্য চুরি ডাকাতিতে অভ্যস্ত হতে বাধ্য করেছেন।

["Would the sufferers deprived of everything they possessed in the world and the possession of which provided them with a competency quitely settle down to till the land they had lately lorded over and offer homage to interlopers ? Rather than submit to such degradation they would betake themselves to the highways and live by rapine and plunder. The guerrila warfare which has but just commenced would be protracted through a series of years, and the extermination of the marauders would cost ten times more than the value of all the confiscations put together"—Confiscation of the Property of the Rebels. H.P.—May 20, 1858]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল সিপ্রী নামক স্থানে তাঁতিয়া টোপীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে মৃত্যুকালে তাঁতিয়া টোপীর জবানবন্দী অনুসারে প্রকাশ পেয়েছে যে কানপুরের ইংরাজ বন্দীদের হত্যায়

ঘটনায় তাঁর কোন রকম দায়িত্ব ছিল না। তাঁতিয়া টোপী সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে যুদ্ধের পূর্বঅভিজ্ঞতা-হীন এই ব্রাহ্মণ সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হিসেবে অসাধারণ প্রতিভা, রণকৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিঃস্বার্থপরতা ও উদারতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। অকারণ নিষ্ঠুরতাই তাঁর চরিত্রের একমাত্র কলঙ্ক ছিল। কুঁয়ার সিংহ যুদ্ধে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন, ক্ষত দূষিত হয়ে যাওয়াতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে পূর্ব অভিজ্ঞতা-হীন কুঁয়ার সিংহ সেনাপতি হিসেবে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন, তাঁর দলের প্রতিটি সৈনিকের আনুগত্য তাঁর প্রতি শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, তিনি প্রকৃতই বীর ছিলেন। বিদ্রোহের তৃতীয় রণদক্ষ হিসেবে তিনি ঝাঁসির রানী সম্বন্ধেও সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন (হিন্দু-পেট্রিয়ট, ২৮ ৪. ৫৯) ইংরাজের এই তিন পরম শত্রুর প্রাপ্য প্রশংসা অর্পণে হরিশ্চন্দ্র কোন কার্পণ্য করেননি। এটা তাঁর নিজের দুর্জয় সাহসিকতার পরিচায়ক। হরিশ্চন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম দিকে এটিকে mutiny রূপে উল্লেখ করতেন, পরে কখনও Rebellion কখনও বা 'war' রূপে উল্লেখ করতেন। সিপাহীরা যখন দিল্লীর সম্রাটকে ভারত-সম্রাট রূপে ঘোষণা করে তখন এই বিদ্রোহকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভ্যুত্থান রূপে চিহ্নিত করে অন্যদের এই বিদ্রোহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়। এই সময় হরিশ্চন্দ্র এই বিদ্রোহকে হিন্দু মুসলমানের মিলিত অভ্যুত্থান রূপে বর্ণনা করেন। সিপাহীদের ঘোষণা পত্রটিকে তিনি একটি 'State paper' রূপে বর্ণনা করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁর কাগজে বিদ্রোহীদের কাজের সমালোচনা করেন, কিন্তু বিদ্রোহের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বড় একটা করেননি। তিনি বরাবর লিখেছেন যে এই বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং ইংরাজের অপশাসনই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী। সিপাহী বিদ্রোহ ইংল্যাণ্ডের এবং এদেশে বসবাসকারী সুবুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজদের চিন্তিত ও বিচলিত করে তুলেছিল, বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার অল্প কিছু দিন পূর্বে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যবহারজীবী জে বি নর্টন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন। এটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নর্টন লেখেন ভারতে ইংরাজের অপশাসনের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখা উচিত। এক ব্রাহ্মণ (হরিশ) যে মনোভাব চিন্তাশীলতা ও বস্তু-নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি রচনা করেছেন তা বিশ্বের যে কোন সাংবাদিকের পক্ষেই গৌরবজনক রূপে বিবেচিত হতে পারে।

["We dream that the spoilation of a kingdom, the reduction of a royal family to the miserable dependency of pensioners, the most often treaty breach, the absorption of vast states...

can now be carried on with as complete impunity, attract as little notice, and cause as little discussion as at a period when there was not a public journal and scarce a printing press. We fancy the people do not see our shortcomings in all the objects of good government, education, policy and justice. We have given the people a standard whereby to measure us, and we are weak enough to suppose they will not use it. Let the sceptical study the leading articles of Hindoo Patriot, written by a Brahmin with a spirit, degree of reflection and acutenes which would do honour to any journalism in the world...... Now this is true opinion, compounded of knowledge and reflection, or at least it is every day more and more nearly approxi mating to a true opinion, to which it must come at last. And this leaves us necessarily, but one path to follow, that of truth and justice on which alone can we preserve in the opinion of the natives, a character which will induce them to give us their voluntary, cheerful and loyal support...''—The Rebellion in India ; How to Prevent Another-J. B. Norton London July, 1857, P. 63 64]

সিপাহীবিদ্রোহ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে সেই অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র গত আঠারো মাসে সমস্ত ভারতের উপর যে বহ্নিবন্যা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, সে সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন যে পৃথিবীতে যখন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যায়, তখন দেখা যায় যে ঘটনাটা ঘটার প্রয়োজন ছিল, কারণ ঘটনাটি মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায় যাতে ভবিষ্যতের জন্য মানুষ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা এমনি কিছু শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে, এটাই হল একটা লাভ। ভাবতে আগত নির্বোধ অথচ উদ্ধত ইংরাজেরা এটা কি বিশ্বাস করত যে এদেশে এমন একটা জাতির বাস যারা এদের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়? তারা কি বিশ্বাস করত যে কতকগুলি চিরায়ত ধ্যান-ধারণার প্রতি ভারতবাসীর যে আনুগত্য সেটা শুধু এ্যাংলো স্যাকসন জাতের মধ্যেই থাকা সম্ভব। তারা কি স্বীকার করত তাদের যেমন সভ্যতা আছে, তার চেয়েও উন্নত সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা এদেশে ছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে দুর্ভাগ্যক্রমেই ভারতবাসীকে এসে পড়তে হয়েছিল। ইংরাজেরা কি জানত যে তাদের পার্লামেন্টই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা নয় এবং অত্যাচার সহ্য করারও একটা সীমা আছে? ইংরাজেরা যদি

এসব জানতে পারত বা বিশ্বাস করত তাহলে বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহ দেখা দিত না, ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলও শান্ত থাকত।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজ রাজপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী যে সুসভ্য জাতি এটা অস্বীকার করে এসেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক পূর্ব থেকেই প্রাচীন হিন্দু জাতির উন্নত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁদের এই মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। এখন যাদের উপর ভারত শাসনের দায় ন্যস্ত তাদের এটা জেনে নেওয়া উচিত। ইংলণ্ড ভারতে যে অত্যাচার ও লুণ্ঠন লীলা এতদিন চালিয়ে এসেছে সিপাহীবিদ্রোহ সেটাকে অতর্কিত ভাবে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে। এ বিদ্রোহ তাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে ভবিষ্যতে ভারতবাসীর সঙ্গে মেলা মেশায় এবং আইন কানুন প্রবর্তনের কালে ইংরাজ যেন ভুলেনা যায়যে তারা একটি সুসভ্য দেশ ও জাতিকে সেবা করার জন্যই এদেশে প্রেরিত হয়েছে। আমাদের শাসন ভার যে রাজনৈতিক নেতাদের উপর ন্যস্ত তারা সিপাহী বিদ্রোহের এই শিক্ষা কতটুকু এবং কি ধরণের মানসিকতা সহকারে গ্রহণ করেছেন ভবিষ্যতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

["Did Englishmen who came to India in their foolish arrogance believe in the possible existence of another race equal in intelligence to them but more passionately attached to old institutions than the Anglo-Saxon. Could they be brought to admit that there were other forms of civilisations besides their own and other social organisations in which people lived as happily contended as in the one wherein their lot was cast, and could they be brought to learn that there were other limitations to despotism than Lords and Commons, there would have been no mutiny of the Bengal army and no rebellion in the North West.

We firmly believe that the recent evils of the country were brought on by the systematic ignoring of Indian officials of the civilization of the people....European scholars have long ago acknowledged in terms of surprise and laudation the high refinement of the Hindu mind. It remains for those with whom is entrusted the immediate Govt. of the country to learn it. To teach them this, to remind them that in their future intercourse with and legislation for the natives they may never forget that they have a civilized people to deal with is, we believe

the mission of the mutinies and the meaning of the sudden interruption to England's mission. That lesson has been taught. The future will show how our statesmen have profited by it and with with what docility they have received it."—The Mission of the Mutinies H.P. Nov. 1 1858]

'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকা দেশের ঘোর দুর্দিনে ভারতবাসীর পক্ষে একক ও নির্ভীকভাবে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। সমগ্র ভারতে ভারতবাসীর পক্ষাবলম্বন করতে পারে এমন একটিও ইংরাজী সংবাদপত্র তখন ছিল না। এই দুঃসময়ে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত দু তিনটি গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় ব্রিটিশের সমালোচনা প্রকাশিত হত। এই পত্রগুলি দেশীয় ভাষায় লিখিত বলে এর প্রচার সীমিত ছিল। এর বক্তব্যগুলি সরকারী মহলে বিবেচিত হত না, বিশিষ্ট ভারতবাসীর কাছেও তা পৌঁছাত না। ইংরাজী ভাষায় লিখিত হিন্দু-পেট্রিয়ট, সমগ্র ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে আদৃত ছিল। সরকারী মহলেও এর সমাদর ছিল। বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং হিন্দু-পেট্রিয়টের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দিতেন এটা সরকারী সূত্র থেকেই জানা যায়। ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতারাও পেট্রিয়টের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। ভারতবাসী ইংরাজ ও ইংল্যাণ্ডের ভারত বিদ্বেষী ইংরাজদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি যে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ ছিল হরিশ্চন্দ্রের লেখা হিন্দু পেট্রিয়টের নিবন্ধাবলী। এগুলি ইউরোপ আমেরিকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের মর্ম স্পর্শ করেছিল। কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ সিপাহী বিদ্রোহ কালে যে নিন্দনীয় জাতিবিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র নির্ভীকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—এতে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্রের কাছে একটি বেনামী চিঠি এসেছিল। চিঠিটি এইরূপ ছিল।

"To the Editor, Hindoo Patriot, you nigger-I see you wont' mend your manners. I am an Anglo-Saxon and have a destiny. That seems to be to murder you and then he hanged-An Anglo-Saxon" হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য সহ চিঠিটি প্রকাশিত করেন "Oh no. In death as in life we shall give you the benefit of a diseased spleen-Ed. H.P 12.5.1859.

একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে হরিশ্চন্দ্র অন্তত: প্রকাশ্যভাবে এই বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তিনি ইংরাজ-শাসকদের শুধু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই বিদ্রোহের পেছনে আছে দীর্ঘ অপশাসনের ও অত্যাচারের ইতিহাস

এবং এটা বিজিত ও অত্যাচারিত ভারতীয় জাতির ক্ষোভ ও মর্মবেদনার বহিঃ-প্রকাশ। তিনি জানতেন যে এই অসংগঠিত সিপাহীবিদ্রোহ দেশের কোন কল্যাণ-সাধন করতে পারবে না বরং নানাদিকে এর ফলে দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে। সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে একটা দৃঢ় বদ্ধ পরিকল্পনা ছিল না এবং এদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এ সম্বন্ধে তিনি বেশ অবহিত ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ কালে মনীষী কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করার পর মার্কস ভারতীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে ৩০ জুন ও ১৭ জুলাই (১৮৫৭) দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ দুটি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় যে হরিশ্চন্দ্রের মত মার্কসের দৃষ্টিতেও সিপাহী বিদ্রোহের দুর্বলতা ধরা পড়েছিল. এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে দুজনের মতের একটা মিলও লক্ষণীয়। বিদ্রোহ দমনে অনেক বেশি সংগঠিত ও উন্নত অস্ত্র-সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর সাফল্য সম্বন্ধে মার্কস কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষা গোষ্ঠির সিপাহীদের নিয়ে গঠিত এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ এমন একজন নেতা খুঁজে পায়নি, যার উপর বিদ্রোহের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যায়। এই ত্রুটির জন্য সিপাহীদের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালানো সম্ভব হবে না মার্কসের মনে এই চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক দিল্লী পুনর্দখল নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে সিপাহীরা ব্যর্থ হবে এই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এটা মাত্র সিপাহী নয় এটা ভারতের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত ক্রমবর্দ্ধমান ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। সিপাহীরা অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত ভারতীয় জনতার প্রতিনিধি মাত্র। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ লাভবান হয়নি অথচ তাদের যা ছিল তা' তারা হারিয়েছে। বর্তমান দুর্গতি তাদের মনে একটি বিষণ্নতা এনে দিয়েছে।° হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি যত্ন করে পড়লে দেখা যাবে যে হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৭-৫৯ এই দু বছর ধরে এই ধরণের মন্তব্যই প্রকাশ করেছেন। হরিশ্চন্দ্রের এই দু সাহসিক ভূমিকা তৎকালে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, 'পরিত্রাতা' রূপে তিনি তৎকালে সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ ভাজন হয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয় বামপন্থী চিন্তাশীল গবেষক রূপে বিখ্যাত. অধুনা পরলোকগত বিনয় ঘোষ সিপাহীবিদ্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকাকে বিকৃত ভাবে চিত্রিত করে, তাঁকে ও তাঁর জীবনীকারকে, ধিক্কার জানিয়ে তাঁর মন্তব্য রেখে গিয়েছেন। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের ফাউণ্ডেশন বৃত্তি পেয়ে শ্রীঘোষ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি

সংকলন করেন। এই সংকলনের প্রায় দশটি খণ্ড এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডগুলির তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ডে অন্যান্য ইংরাজী কয়েকটি সংবাদপত্র ব্যতীত হিন্দু-পেট্রিয়ট থেকে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে সিপাহী বিদ্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্র লিখিত হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সংকলনে শ্রীঘোষ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন বলে মনে হয় না; 'এলোমেলো' ভাবে অশ্রদ্ধার সঙ্গেই এগুলি নির্বাচিত হয়েছে এমন মনে করার কারণ আছে। হরিশ্চন্দ্রের বহু 'অগ্নিগর্ভ' প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পায়নি। শোনা যায় এই কাজে বিনয়বাবু কিছু সংখ্যক বেকার ও আধাবেকার ব্যক্তিকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন, কারণ একাজে তিনি বেশ মোটা অঙ্কের ডলার অর্জন করেছিলেন। শ্রী বিনয় ঘোষ সম্পাদিত আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম 'The Myth of Clemency Canning'। শ্রীঘোষ তাঁর এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই মত প্রকাশ করেছেন যে হিন্দু-পেট্রিয়ট কাগজের লেখাগুলি পড়লে পাঠকের মনে এই ধারণা হবে যে হরিশ্চন্দ্রের সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল অতি ক্ষীণ, সেই তুলনায় তিনি ছিলেন একজন সরব ক্যানিং সমর্থক (Canningite) ["The much talked of Hindoo Patriot, virtually (not formally) edited by Harish Chandra is no exception. Scanning the writings on Mutiny in H. P, one feels that Harish Mukherjee was more a vociferous 'Canningite' than even a whispereing sympathiser of the mutineers. In 1857-58 Harish filled the columns of H. P for conjuring up the myth of Clemency Canning".]

অতঃপর নীলবিদ্রোহ কালে হরিশের নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উল্লেখ করে শ্রীঘোষ এমন ইঙ্গিত রেখেছেন যার অর্থ এই যে নীল-চাষীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অনেকটাই ছিল মেকি। তাঁর এই মন্তব্যটি বিস্তৃত না করে তিনি পাঠককে আশ্বাস দিয়েছেন যে বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁর সংকলনের পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করবেন। অতঃপর শ্রীঘোষ লিখেছেন ভারতীয় সম্পাদিত কোন ইংরাজী বা বাংলা সংবাদপত্রে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির সংবাদ পাওয়া যায় না, হিন্দু-পেট্রিয়টেও নয়। অতঃপর হিন্দু-পেট্রিয়ট সহ দেশীয় সম্পাদিত কাগজে সিপাহী বিদ্রোহী সম্বন্ধে সংবাদ গোপন অথবা সংবাদ বিকৃত রূপে পরিবেশনের অভিযোগও তিনি এনেছেন। সিপাহীবিদ্রোহকালে হরিশ্চন্দ্র সিপাহীবিদ্রোহের অজস্র কারণ ব্যাখ্যা করে বহু প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্রোহদমনের অজুহাতে সিপাহী ও জনসাধারণের উপর ব্রিটিশের নির্মম অত্যাচারের বহু কাহিনী পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্যে এর তীব্র প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। এমনি একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে গভর্ণর জেনারল ক্যানিং ভারতের সর্ব-

মর কর্তা হয়ে যদি ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি ব্রিটিশ বাহিনীর অত্যাচার সংযত করতে না পারেন তবে গভর্ণর জেনারেল পদে কোন কষাই বা butcher কে বসিয়ে নিজে পদত্যাগ করে তাঁর স্বদেশ প্রস্থান করাই উচিত। শ্রীঘোষের সংকলনে এই ধরনের প্রবন্ধগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। সামান্য যে দু একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সম্ভবত সেগুলি পড়েও দেখার সময় তিনি পাননি। যাই হোক হরিশ্চন্দ্রকে হেয় করার জন্য তিনি হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন (৩০ এপ্রিল ও ৭ মে, ১৮৫৭)। বলা বাহুল্য এ দুটি সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়—'সেনাবাহিনী সংস্কার' (Army Reform) শীর্ষক প্রবন্ধের দুটি কিস্তি। মনে রাখা প্রয়োজন যে এগুলি ব্যারাকপুর বিদ্রোহের অব্যবহিত কালে প্রকাশিত, মীরাটের সিপাহীদের বিদ্রোহ, তাদের দিল্লী অভিযান বা দিল্লী দখলের ঘটনা তখন অনাগত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ তখন শুধু মাত্র ব্যারাকপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাই হোক ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ গভর্ণমেণ্টকে চিন্তান্বিত করেছিল এবং গভর্ণমেণ্ট সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধনে ব্যস্ত হয়েছিলেন। বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাশের জন্য এই পদক্ষেপ জরুরী ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে সামরিক বিভাগ সংস্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। হিন্দু-পেট্রিয়টেও এই ধরণের একটি প্রবন্ধ দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটিতে সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে খুঁটি নাটি এমন তথ্য আছে যার থেকে অনুমান করা যায় যে এটি কোন সমর-বিশেষজ্ঞ সেনাধ্যক্ষের রচনা। শ্রীবিনয় ঘোষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটি হরিশ্চন্দ্র যে মিলিটারী অডিট্ আপিসের কর্মচারী ছিলেন, সেই আপিসের কোন ইংরাজের রচনা। হরিশ্চন্দ্রের আপিসের উচ্চতমকর্তা মেজর চ্যাম্পনীজ আগে সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পরে 'ক্যালকাটা রিভিউ' এর সম্পাদক ম্যালিসনও সিপাহী যুদ্ধের সময়ে এই আপিসে কর্মরত ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি এঁদের একজনের রচনা হতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে সিপাহীদের অভাব অভিযোগগুলির দিকে লক্ষ্য রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া উচিত, সৈন্য-বাহিনীতে আরও অধিক ইংরাজ সৈন্য ভর্তি করা উচিত, অভিজ্ঞ ইংরাজ সেনানায়কদের সংখ্যাবৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। সেনাবাহিনীর সংস্কারের জন্য সমর বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশ করে হরিশ্চন্দ্র কোন গুরুতর অপরাধ করেছিলেন বলে মনে হয়না। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করলে যে দেশে ক্ষতি হবে লাভ বিশেষ হবে না, এ ধারণা তখনকার দিনে সব শিক্ষিত ভারতবাসী মনেই ছিল, কাজেই তিনি এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। অনুরূপ ধরণের আলোচনা তদানীন্তন কালের সকল ইংরাজী সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করার আর একটি কারণ সম্ভবতঃ

ছিল। শত বৎসরেরও অধিক কাল ধরে ভাড়াটিয়া ভারতীয় সিপাহীদের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ ভারত জয় করেছিল এবং তাদের উপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এটি বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল। সিপাহীবিদ্রোহ শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে ভারত সচিব সার চার্লস উড সমর বিষয়ক একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য পেশ করেন। এতে প্রস্তাব করা হয় যে ভারতের সামরিক বাহিনীতে মোট ৩৬,০০০ ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য থাকবে, এর মধ্যে ৬০০০জন 'ডিপো'র কাজে নিযুক্ত থাকবে। ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যা হবে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ । হরিশ্চন্দ্র এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন যে 'একটা বিজিত দেশকে সেই দেশের থেকেই আহৃত সৈন্যদের দ্বারা দমিয়ে রাখার নীতি, ইংরাজের কাছে এতই সুবিধা-জনক উপায়, যে এই উপায়টি তারা সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পরও ছাড়তে রাজী নয়। আমরা জানতে চাই এই দুই লক্ষ সিপাহীদের কার হুকুমে চলতে হবে এবং কারা এদের সেনাপতি হবে?' (The Officering of the Native Army. H. P. 10.9. 1859)।

শ্রীঘোষ এই বলে তাঁর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে হরিশ্চন্দ্র কর্ণেল গোল্ডির অধীনে এই সময় ৪০০ টাকা বেতনে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, মিলিটরী অডিটর পদে কাজ করতেন। ২৫ টাকা বেতনের সামান্য কেরানীর পদ থেকে তিনি এই পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সামরিক বিভাগের সংস্কার, ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে অধিকতর ইউরোপীয় নিয়োগের প্রস্তাব প্রকাশ করার পুরস্কার স্বরূপ তাঁর এই পদোন্নতি। (He rose to this position from a petty clerk, with a monthly salary of abuut Rs.400. This was a reward from his British masters) বিনয়বাবু জানতেন না যে আলোচ্য প্রবন্ধ লেখা বা প্রকাশের দু বছর আগে কর্ণেল গোল্ডি কানপুরে ছুটি ভোগ কালে সপরিবারে বিদ্রোহীদের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন। বিনয়বাবুর মন্তব্য থেকে মনে হবে ২৫ টাকা মাইনের সামান্য কেরানী হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে 'ঝপ.' করে ৪০০ টাকা মাইনের চাকুরিতে প্রমোশন' পেয়ে যান। এককালের পরিশ্রমী এই গবেষক, সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় একটু ক্লেশ স্বীকার করে যদি অনুসন্ধান চালাতেন তবে কিছু পুরাতন কাগজ পত্র ঘেঁটে তিনি জানতে পারতেন যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিশের মাইনে ছিল ২৫০ টাকা। মৃত্যুর ৭।৩ তিন মাস পূর্বে তাঁর মাইনে নিয়ম মাফিক বেড়ে ৪০০ দাঁড়িয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র যে ২৫ টাকার কেরানী হয়ে জীবন আরম্ভ করেন, সেটা অস্বীকার করা যায় না, তবে সেটা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭ বৎসর চাকুরীর পর তাঁর মাইনে ৪০০ টাকা হয়েছিল। ২৫ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৭৫ বা ১০০, ১০০ থেকে ১৫০ বা ২০০ এইভাবে ধাপে ধাপে তাঁর মাইনে বেড়েছিল। লোকোত্তর প্রতিভা সম্পন্ন হরিশ্চন্দ্র এই আপিসের কাজ

ছেড়ে অন্য কাজে নিযুক্ত থাকলে আরও অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। আজীবন দারিদ্র্য পীড়িত দরিদ্র হরিশ্চন্দ্র নিজের আর্থিক উন্নতির বহু সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রের দেশ প্রেম, নির্ভীকতা ও নিঃস্বার্থপরতার মর্ম অনুধাবন করা ডলার-স্রোতে-ধৌত-মস্তিষ্ক (brain washed) কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তা তিনি যত বড় খ্যাতি মান পণ্ডিতই হন না কেন।

হরিশ্চন্দ্রের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে শ্রীঘোষ হরিশের জীবনী লেখক বেচারী রাম গোপাল সান্যালের মুণ্ডপাত করেছেন। রামগোপাল সান্যালের নামে তিনি অভিযোগ এনেছেন যে তিনি সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে হরিশের ভূমিকাটি বিকৃত করে দেখিয়েছেন, আসলে হরিশ্চন্দ্র ক্যানিং ও তাঁর সহকর্মীদের কঠোর ভাবে বিদ্রোহ দমনে প্ররোচিত করেছিলেন। বিনয়বাবুর এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এটি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা যেতে পারে স্বয়ং বিনয়বাবুর সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ধারণা কি ছিল। এক সময়ে তিনি লিখেছিলেন-"সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙালীদের উৎসাহিত ও আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। হিন্দুস্থানী ও রাজপুত সিপাহীদের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বর্ম ভেদ করে বাঙালীরা যদি সেদিন মর্মস্থলে স্বদেশ প্রেমের হোমাগ্নির কোন সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলে তার জন্য তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। "বাংলার সিপাহী বাহিনীতে বঙ্গ-সন্তান ছিল না, কৃষক সন্তানও নয়ই। অবাঙালী যারা ছিল, তাদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দু ছিল বেশী। বাংলার ওয়াহবী বিদ্রোহ বা নীল বিদ্রোহের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, কারণ এগুলি হল বাংলার কৃষক বিদ্রোহের সমসাময়িক রূপ। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছেন, ইংরেজ ভক্ত হয়েও।"* শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের মতে সিপাহী বিদ্রোহটির প্রকৃতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং এই সংগ্রামের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা হত সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী স্বাধীনতা। সুতরাং বিদ্রোহের ব্যর্থতা সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রত্যাবর্তন থেকে রক্ষা করেছে।

শ্রীঘোষের দৃষ্টিতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হরিশ ব্রিটিশ প্রভুদের স্বার্থ দেখেছিলেন। জমিদার প্রভাবিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন উৎসাহী সক্রিয় সদস্য হিসেবে নীল বিদ্রোহের সময় চাষীদের চেয়ে তিনি জমিদারি স্বার্থেরই সেবা করেছিলেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস, হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণা তা শুধু 'মীথ'। সুপণ্ডিত বিনয়বাবুর জানা উচিত ছিল যে রামগোপাল সান্যাল প্রমুখ পরবর্তীকালের জীবনী লেখকদের 'মীথ' সৃষ্টির কোন প্রয়োজন হয় নি, জীবদ্দশাতেই হরিশ্চন্দ্র 'নিজেও' সৃষ্টি করে

* বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ—বিনয় ঘোষ, নতুন সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৪

গিয়েছেন। সমসাময়িক কালে হরিশ্চন্দ্রকে কি চোখে দেখা হত, তার মাত্র দুটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাক্ষী নানাভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত সেই সময় মধুসূদন মেদিনীপুরে বাসকারী বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন-"শুনছি পেট্রিয়টের বেচারা হরিশ মৃত্যু শয্যায়। এটা বড়ই বেদনা-দায়ক সংবাদ। বর্তমানে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের উপর তাঁরই প্রভাব সবচেয়ে বেশীভাবে কার্যকর হয়েছে। আশাকরি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি মারা গেলে দেশের খুব ক্ষতি হবে, তবে এই ক্ষতি আমাদের সাহিত্যে হবে না, হরিশ 'ফিরিঙ্গি' ইংরাজী লেখেন। আমাদের দেশে মানসিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার ধারা প্রবাহিত হয়েছে সেই ধারাটি ব্যাহত হবে"। একমাত্র নিজেই ভাল ইংরাজী লেখেন আর কেউ পারেন না এই ধরণের একটা আত্মম্ভরিতা মাইকেল মধুসূদনের ছিল। যাই হোক্ হরিশের চিন্তা ধারা যে দেশের মন ও চিন্তাধারায় একটু মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দিয়েছে এটা মধুসূদন অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন।

["They say poor Harish of the patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature for he writes fringishly' but to the progress of independence of mind and thought.]"*

হরিশের মৃত্যুর পর খিদিরপুর থেকে প্রেরিত রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত আর একটি পত্রে মধুসূদন লিখেছিলেন, "হরিশ মারা গিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষা নিয়ে সকলে খুব হৈ চৈ করছে। প্রস্তাব উঠেছে ওর নামে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। দূর ছাই, ওর একটা মর্মর মূর্তিই তো প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাই হোক্ আমি চাঁদা দেব আমি ওকে ভালবাসতাম, তার গুণগ্রাহীও ছিলাম"।

["....Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a scholarship. Fie ! why not a statue ? However, I shall subscribe....I loved and valued the man"]

হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা জাতির মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটা যে 'মীথ' ছিল না, হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন মনীষী কবি মধুসূদনের উক্তিই তার প্রমাণ। বিনয় বাবু তাঁর রচনা সংকলনের পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদকীয় মন্তব্যে নীলবিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখে-

* মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত্র (পৃ ৪৮৪) ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৩২

ছেন যে হরিশ্চন্দ্র ব্যক্তিগতভাবেও পেট্রিয়ট সম্পাদক-রূপে নীলচাষীদের প্রবল ভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এই সমর্থন ও সহানুভূতি মনে একটা সংশয় এনে দেয়। তাঁর লেখাগুলি পড়লেই মনে হবে রায়তদের অপেক্ষা জমিদারদের দিকেই তাঁর সহানুভূতি বেশী ছিল।...তাঁর সমসাময়িক কালের বাংলা কাগজের সম্পাদকেরা নীলবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের বিষয়টি আরো ব্যাপক ও জোরালো ভাবে প্রচার করেন।

["While, it must be admitted that Harish, as editor of Hindoo Patriot and as a man, was an ardent supporter and sympathiser of the oppressed ryots during the indigo agitations, it is indeed difficult to decide in exactly what 'this sympathy and support consist. It becomes a real puzzle when the writings of Harish in H. P. clearly reveal his greater sympathy for the native zamindar than for the ryots and when, in expressing the sympathy he surpassed the reservations shown by other Bengali journalists of his time and of his social class.

In fact, the tyranny and expolitation of the British planters was exposed in more lucid detail in Bengali papers than in Harish's Hindoo Patriot in 1859-61—Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal, Vol V (Editorial) pp VII-VIII.]

নীলবিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত হবে, বিনয়বাবুর মন্তব্যটি যে বিদ্বেষ-দুষ্ট এই অধ্যায়ে তা' স্বতঃই প্রমাণিত হবে। আপাততঃ বিনয়বাবু কর্তৃক নীল বিদ্রোহ সমর্থনের জন্য প্রশংসিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে যে হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নীলবিদ্রোহ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকার স্বরূপ কি ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মন্তব্যটি দ্বারকানাথ সম্পাদিত সোমপ্রকাশের ১৭ জুন ১৮৬১ সংখ্যায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর তিন দিন পর প্রকাশিত হয় "তিনি একাকী নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাঁহার এত উদ্যোগ এত চেষ্টা ও পরিশ্রম ছিল যে আমরা সেই অত্যুক্তি দোষ স্বীকারেও অসম্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।" হরিশ্চন্দ্র প্রসঙ্গে বিনয়বাবু আরও লিখেছেন যে হরিশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার লক্ষ্য ছিল বাঙালী জমিদারদের স্বার্থরক্ষা। বাঙালী কৃষকের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির চেয়ে জমিদারি স্বার্থ রক্ষাই তাঁর কাছে বড় ছিল।

["Harish's economic and political thinking was focussed more on the defence of Bengal Zamindars and Zamindary system than on the basic ecnonomic problem of the peasants —ibid pp XI-XII]

হরিশ্চন্দ্র জমিদারি স্বার্থের রক্ষক ছিলেন কিনা এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

শ্রীঘোষ সম্পাদিত—"Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal" গ্রন্থের যে আটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তার ৩য়, ৪র্থ,৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' থেকে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডের সম্পাদকীয়গুলি প্রধানতঃ হরিশ্চন্দ্রের ভাবমূর্ত্তি কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। ৩য় খণ্ডে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' থেকে উদ্ধৃতি থাকলেও বিনয়বাবু দয়া করে এই খণ্ডের (১৮৪৯-৫৬) সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্রকে রেহাই দিয়েছেন। এই খণ্ডে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ও 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার' থেকে সংবাদ ও মন্তব্য প্রসঙ্গে বিনয়বাবু তাঁর নিজস্ব সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর জীবনী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র, নব্য-বঙ্গখ্যাত যুবক নেতৃবৃন্দ এমন কি পুণ্য-শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির প্রতিও তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। বিনয়বাবু লিখেছেন পুরাণ-কারেরা পৌরাণিক চরিত্রে নায়কদের বিশ হাত দৈর্ঘ্য সম্পন্ন বলে উল্লেখ করে পুরাণ পাঠকের সম্ভ্রম উদ্রেক করার চেষ্টা করতেন (kings thirty feet high.)। কিশোরীচাঁদ প্রমুখ জীবনী লেখকেরাও তেমনি তাঁদের নায়কদের উপর সেই দৈর্ঘ্য বা মহত্ব আরোপ করেছেন যা তাঁদের ছিল না। বাঙলার নব জাগরণের নায়কদের জীবনী আলোচনা করে বিনয়বাবু খ্যাতি প্রতিপত্তির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি নিজেই নিজের পূর্বমতগুলি পরিত্যাগ করে নমস্য ব্যক্তিদের তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং একথা লিখতে কুণ্ঠিত হননি যে তিনি আগে যা লিখেছেন তার সবটাই ভুল।* বাঙলার নবজাগরণ সম্বন্ধে তিনি একটি সাময়িকপত্রে এই মন্তব্যও প্রকাশ করেন—'যাকে আমরা বাংলার জাগরণ বলে মনে করি সেটা একটা ধাপ্পাবাজিতে পরিণত হয়েছিল।'**

একদা ইংরেজ প্রভুরা আমাদের শিখিয়েছিলেন বা শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অসভ্য বর্বর ছিলেন, ইংরাজ আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় এনে ফেলেছে। ইংরাজ ভক্ত অনেক দেশবাসীরও এই ধারণা ছিল।

ক্রমে এই ভুল ভেঙে যায়, আমরা নতুন ভাবে 'ভারত আবিষ্কার' করি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে বহু ইউরোপীয় মনীষী আমাদের এই ভুল ভাঙার কাজে সাহায্য করেছিলেন। এখন আবার বিনয়বাবুর মত প্রগতিশীল গবেষকরা আমাদের অব্যবহিত পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন।

বস্তুতঃ বাংলার জাতীয়জাগরণ সমগ্র ভারতেও জাগরণ এনেছিল। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর "ডিসকভারি অফ. ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ যে পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করে দিয়েছিল তা স্বীকার করে লিখেছেন "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় কতকগুলি অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মেছিলেন, এঁরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে সমগ্র ভারতেরই নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের প্রযত্নেই ভারতে একটি নূতন জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে তার রূপ পরিগ্রহণ করেছিল—"

["...A number of very remarkable men rose in Bengal in the nineteenth century who gave the lead to the rest of India in cultural and political matters and out of whose efforts the new nationalist movement ultimately took shape"]*

বাংলার নবজাগরণের পুরোধাগণকে বুর্জোয়া, ইংরাজের দালাল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হলেও বহু দেশী বিদেশী মার্কসবাদী বাঙলার নবজাগরণের নায়ক-দের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কি সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়াতেও বাংলার নবজাগরণকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (Vol 3, pp 166-8)**

এককালে ইংরাজ আমাদের অতীতকে চাপা দিতে চেয়েছিল। এখন আবার বিনয়বাবুর মত কিছু পণ্ডিতম্মন্য গবেষক তাঁদের চেয়ে বহুগুণ মনীষাসম্পন্ন ও চরিত্রবান উনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য মহাপুরুষদের বামমাকৃতি করে দেখাতে চাইছেন। এই ধোলাই-মস্তিষ্ক পণ্ডিতগণ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মেরও মস্তিষ্ক ধোলাই করতে চাইছেন এই আশংকা বোধহয় অমূলক নয়। হরিশ্চন্দ্র এঁদের অন্যতম লক্ষ্য। এই পক্ষপাতদুষ্ট গবেষকদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই এই অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক প্রসঙ্গের অবতারণা। বিনয় বাবু 'Selections from the English Periodicals of the Nineteenth Century" খণ্ডগুলি সংকলন করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ এই সংকলন গুলি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-জিজ্ঞাসুদের কাজে লাগবে। তবে এই সংকলন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যগুলি অভিসন্ধি-প্রসূত বিবেচনায় বিশেষ ভাবে অশ্রদ্ধেয় ও অগ্র

১০

কোম্পানী শাসনের অবসান ও হরিশ্চন্দ্র

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূলতঃ ছিল একটি বণিক সংস্থা। এই বণিকেরা বাণিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে ভারত জয় করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এদেরই ভারত শোষণের অর্থে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব অর্থাৎ নূতন নূতন কল কারখানার সৃষ্টি হয়েছিল। এই কল-কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বেশ কমদামে ভারত থেকে পাওয়া যেত এবং আবার এই কাঁচামালের থেকে উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের বাজারেই বেশ চড়া দামে বিক্রি হত। এই কারণে ইংলণ্ডে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে সমৃদ্ধ ইংরাজ-জাতির মধ্যে বহু শিল্পপতির উদ্ভব হয়েছিল। একদল বণিক ভারত-শাসন করবে এই চিন্তা বহু দিন থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পার্লামেণ্টে এই শ্রেণীর শিল্পপতিদের প্রতিনিধিগণ প্রতিনিয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি হ্রাসের চেষ্টা চালাত, এরই ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের উপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের 'চার্টার' কোম্পানী শাসনের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি, যদিও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টারের মেয়াদ কুড়ি বছর সুনির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল। সিপাহীবিদ্রোহ কালে, পার্লামেণ্টের কোম্পানী-বিরোধী গোষ্ঠী ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী তোলা সুরু করেছিল। এমনি একটি বিলের আলোচনা কালে হরিশ্চন্দ্র পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের জন্য শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে সব প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা হচ্ছে সেই ভারতবাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানার কোন চেষ্টা না করে প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে কি? এর উত্তর হচ্ছে—পার্লামেণ্টের এই অধিকার নেই। এমন একটা সময় প্রায় এসে পড়েছে যখন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা ভারতবাসী নিজেরাই করে নেবে, (অন্যের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বা অধিকার থাকবে না)। ভারতীয়দের বিদ্রোহ ইংরেজ জনসাধারণকে কি ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দেয়নি যে ভারতবাসীর মতামত না নিয়ে শাসন নীতি পরিচালন করতে গেলে তার পরিণাম কি হতে পারে?

["Can a revolution in the Indian Goverment be autho- rised by Parliament without consulting the wishes of the vast millions of men for whose benefits it is proposed to be made? The reply must be in the negative. The time has nearly come, when all Indian questions must be solved by Indians. The Mutinies have made patent to the English public what must be the effects of polities in which the native is allowed no voice. The sympathies between the governing and governed must be more free and firm before England can propose to govern India fully, sufficiently and properly. The Europeasa- tion of the race can not be said to be complete while there remains a single bar to the expression of political wishes of the Indian people on a single obstacle to the unstinted diffu- sionof their political sentiments"—The Future of Indian Govt, H.P. 14. 1. 58]

ভারতের স্বাধীনতালাভের নব্বই বৎসর আগে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে যখন শিক্ষিত ভারতবাসীরা ভারতের স্বাধীনতার কথা স্বপ্নে ও কল্পনায় আনতে পারত না, শত বৎসর ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় শৃঙ্খল-বদ্ধতার মধ্যে থেকেও হরিশ্চন্দ্র সেই দিনে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে সেদিন আসছে যে দিন ভারতবাসী নিজেরাই ঠিক করে নেবে, তাদের শাসনতন্ত্র কি ধরণের হবে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তবে সেটা সার্বভৌম স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলের নিয়োগপত্রটি ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে এসেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করেছিল। এটা অবশ্য দয়াদত্ত ছিল না। ব্রিটিশের পক্ষে ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব ছিল না। তবে শেষ আঘাত হিসেবে তারা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে গিয়েছিল, 'পাকিস্তান' ব্রিটিশ কূটনীতির সন্তান। যাই হোক ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রস্তুতি রূপে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণ-পরিষদ বা Constituent Assembly স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব নিয়ে স্থির করেন যে ভারতবর্ষ হবে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic)।

এই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রাণ হরিশ্চন্দ্র

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সেদিন আসছে যেদিন ভারতবাসী অন্য নিরপেক্ষ ভাবেই শাসনতন্ত্র রচনা করে নেবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রকে সত্য-দ্রষ্টা বা Prophet আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে না।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পার্লামেন্টের আলোচনা থেকে এটা বোঝা গিয়েছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসনের দায়িত্ব ভার সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে চলে যাবে এবং ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়াই হবেন ভারতের মহারানী। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখেন, যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামটাই শুধু লোপ পাবে, ভারত শাসন ব্যবস্থায় নীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিচার বিভাগের উন্নতি হবে না, কর-আদায়ের কঠোরতা হ্রাস পাবে না, সরকারী বড় চাকুরিগুলিও ইংরাজদের হাতেই থাকবে। ভারত শাসন ব্যবস্থার সকল দোষ ত্রুটি শুধু গভর্ণমেণ্টের নাম পরিবর্তদের দ্বারাই ধামা চাপা দেওয়া হবে। আমাদের দেশবাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান যদি বেশ লাভের ব্যাপার বলে মনে করেন তবে খুব ভুল করা হবে ("It will be fault of our countrymen if they accept it as adequate") হরিশ্চন্দ্র আরও লিখেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসন ভার কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নানা রকম আইন কানুন বিধিবদ্ধ করবে। এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনের নীতি কি হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তিনি লিখেছিলেন যে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট তীব্র দমন মূলক নীতি অবলম্বন করবে। অবশ্য একশ পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তাদের নিপীড়িত করা কতদূর সম্ভব হবে, সেটা অন্য কথা। দেশীয় সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হবে, দেশীয়দের অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে, সিপাহী বিদ্রোহ এলাকায় কার্যকর সামরিক আইন (Martial Law) দেশের সর্বত্র প্রসারিত করা হবে. মোটা মাইনের পদগুলি শুধু ইংরাজদের হাতেই থাকবে। হরিশ্চন্দ্র এইগুলির উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে দমন মূলক এই শাসন নীতি কখনই চিরস্থায়ী করা যাবে না। এখানে তিনি অপ্রত্যক্ষ ভাবে দেশবাসীকে এই দমননীতির সম্মুখীন হয়ে এগুলি প্রতিরোধের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান করতে চেয়েছিলেন ("..but all these measures though eminently rigorous, coercionary and repressive will not constitute a policy. That can be expedient of the time. They can not be perpetrated") অতঃপর হরিশ্চন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করে লেখেন যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে একটি তদন্ত কমিশন প্রেরণের যে পরিকল্পনা প্রথমে নিয়েছিল, তা পরিত্যক্ত হয়েছে।

অনেকগুলি সমস্যা তলিয়ে বোঝার প্রয়োজন ছিল সে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অনবহিত বা অনাগ্রহী থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, ভারত শাসন আইনের খসড়াকে প্রস্তাব রূপে গ্রহণ করতে চলেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তর ভারতের মানুষেরা দিল্লীর বাদশাহের অবস্থা কি ভাবে দেখছে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের পক্ষে তার অনুসন্ধান প্রয়োজন ছিল। রাজ্যচ্যুত পেশোয়া পরিবার সম্বন্ধে মধ্যভারতের মানুষদের মনোভাবও জানা উচিত ছিল, সিপাহীবিদ্রোহকে এই মনোভাব কতদূর প্রভাবিত করেছিল তাও জানা উচিত ছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা কতদূর দুঃসহ,··· এই সব ব্যাপারগুলি অনুসন্ধান করারও প্রয়োজন ছিল। দেশের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল না রায়ত-ওয়ারি ব্যবস্থা ভাল এটি ভাল করে বিচার বিবেচনা করা এবং দেশের জন প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপক সভায় স্থান দেওয়ার কথা ভাবা উচিত ছিল। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে কোম্পানী শাসনের অবসানে দেশবাসী যেন তাদের আসন্ন সংগ্রামের কথা ভুলে না যান, কারণ নূতন ব্যবস্থায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা আরও বেশী থেকে গেল। ব্রিটিশ জনসাধারণের বহু অন্যায় আব্দার কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেকটরস্দের প্রতিবন্ধকতায় অতীতে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এখন ব্রিটিশ জন-সাধারণ ভারতবর্ষে অবাধ বসবাস ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ সুবিধা চাইবে। এইভাবে হরিশ্চন্দ্র প্রতিটি পরিস্থিতির উপর দেশবাসীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে তাঁর মন্তব্য শেষ করেন। ["The abolition of the independent existence of the board of directors will remove a powerful barrier that interposed between the ignorance of British public and the interests of the British India. Impossible theories of colonization and evangelization will be officially countenanced and much mischief will thence follow upon the country. It is to this aspect of the question that we would particularly direct the attention of our countrymen, and we conjure them not to view it with apathy or indifference"—The Future of the Indian Government, H.P 25.2.1858]

ভারতবর্ষের শাসন পরিবর্তনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে আলোচনা কালে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী পার্লামেণ্টে একটি আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনে বলা হয়েছিল যে কোম্পানী একশত বৎসরের অধিককাল ধরে ভারতে তাদের অধিকার বিস্তৃত করেছে এবং সেই দেশের অধিবাসিদের একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়েছে। সম্প্রতি ভারতে যে বিদ্রোহ ঘটেছে তার জন্য কোম্পানীকে দায়ী করে তাদের হাত থেকে শাসন ভার কেড়ে নিতে পার্লামেণ্টে

প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে। কোম্পানীর পরিচালকেরা এই আবেদনে আরও জানান যে ভারত শাসন বিষয়ে কোম্পানীর একচ্ছত্র দায়িত্ব ছিল না, ব্রিটেনের মন্ত্রিমণ্ডলীর একজনের উপর কোম্পানীর কাজকর্ম তদারকির ভার ন্যস্ত ছিল, কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করতে পারত না। বহু ক্ষেত্রে কোম্পানী এই মন্ত্রীর নির্দেশে তাদের পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেনি। পরিস্থিতি যখন এই প্রকার তখন কোম্পানীর তরফে ভারত শাসনে কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে সেই দায়িত্ব তার একার নয়, ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাও সমভাবে এই ত্রুটির জন্য দায়ী। অথচ এখন একমাত্র কোম্পানীকে দায়ী করে তার হাত থেকে শাসন ভার ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ চলছে। কোম্পানী ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ জাতিকে যে কত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে সেটা এখন আর ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না। কোম্পানীর এই আবেদনের উপর হরিশ্চন্দ্র একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে (১১. ৩ ৫৮) হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এই আবেদনটি একটি ঐতিহাসিক দলিল, কোম্পানীর আবেদন পত্রটি যুক্তিপূর্ণ, ভারত শাসনে কোম্পানীর শৈথিল্য ঘটে থাকলে কোম্পানী তার জন্য একা দায়ী নয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব ছিল। হরিশ্চন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন প্রবর্তনও তাঁর কাছে অধিকতর বাঞ্ছিত ছিল না। হিন্দু-পেট্রিয়টের সূচনা কাল থেকে যে হরিশ্চন্দ্র কোম্পানী শাসনের তীব্র সমালোচনা করে এসেছে, কোম্পানী শাসন অবসানের সম্ভাবনা কালে সেই হরিশ্চন্দ্রের কোম্পানী শাসনের সপক্ষে লেখনী ধারণ একটু আশ্চর্য-জনক মনে হয়। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে হরিশ্চন্দ্র কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ-শাসন প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। হরিশের মনে সম্ভবতঃ এই ধারণা কার্যকর ছিল যে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী ও সমগ্র ব্রিটিশ জাতি তথা ব্রিটিশ সিংহাসনের রাজা বা রানী এর মধ্যে পরাধীন ভারতবাসীকে যদি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় যে সে কার অধীনে থাকতে চায় তবে ভারতবাসীর উচিত দুর্বলতম কোম্পানী শাসনকেই বেছে নেওয়া। রাজনৈতিক শিক্ষায় উন্নত হয়ে ভারতবাসী যে একদিন কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটাতে পারবে হরিশ মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন, সিপাহী বিদ্রোহ তাঁর মনে এই আশা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। তিনি ভেবে ছিলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের মত এমনি দুচারটি অভ্যুত্থান ঘটলেই ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে দুর্বলতর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবিচ্ছিন্নতা এই জন্য হরিশ্চন্দ্রের কাছে তুলনায় বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। কোম্পানী শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার সপক্ষে হরিশ্চন্দ্রের মনে আর একটি ধারণাও সক্রিয় ছিল।

ভারত-প্রবাসী বিশেষতঃ কলকাতার বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীগণ এই সব বেসরকারী ইউরোপীয় বিশেষত: ইংরাজদের সুনজরে দেখত না। 'রাজার জাত' হিসেবে এরা কোম্পানীর কাছে যে সব বিশেষ সুযোগ সুবিধা চাইত, কোম্পানী তা দিত না, এদের রক্তচক্ষুকেও কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ প্রায়ই উপেক্ষা করত। বেসরকারী ইংরাজদের ঔদ্ধত্য সংযত রাখার জন্য কোম্পানী সাধারণ ভাবে তৎপর ছিল। 'কলোনিজেসন' নীতি পার্লামেন্ট কর্তৃক সমর্থিত হওয়া সত্বেও কোম্পানী বেসরকারী ইংরাজদের এদেশে বসবাসে ও ধনার্জনে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। হরিশ্চন্দ্র মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন যে কোম্পানী শাসনের অবসানের পর সরাসরি ব্রিটিশ রাজের শাসন ভারতবাসীকে আষ্টে পৃষ্ঠে এমনি নাগপাশে বেঁধে ফেলবে যে সেই নাগপাশ ছিন্ন করে ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভ সুদূর পরাহত হয়ে উঠবে। কাজেই দুটি মন্দের মধ্যে তুলনায় কম মন্দ কোম্পানী শাসনকেই হরিশ্চন্দ্র বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কাল থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিষ্ঠুর নিপীড়নের ইতিহাস। ইংরাজ ভারত থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু ভারত ত্যাগ করে গিয়ে তারা এই উপমহাদেশে পারস্পরিক চিরস্থায়ী বৈরিতা ও অশান্তির সম্ভাবনার বীজ বপন করে গিয়েছে। ব্রিটিশ রাজের সরাসরি ভারত-শাসনের প্রস্তাবে হরিশ্চন্দ্রের যে সম্মতি ছিল না, এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

পেট্রিয়টের পরবর্তী একটি সংখ্যায় (৮. ৪. ৫৮) "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ও তার পরিণাম" (Abolition of the E. I. Co—One Probable Result) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁর পূর্বসূরী লর্ড পামারস্টোনের মতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারত শাসনের অধিকার কেড়ে নিতে উৎসুক। তাঁর নেতৃত্বে 'বিল'টি যে ভাবে আলোচিত হচ্ছে তাতে মনে হয় কোম্পানীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি আসন্ন। অতঃপর হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবেদন নিয়ে আমরা তার সারবত্তা সমর্থন করেছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবেদনে বলা হয়েছে যে তারা ভারতীয় অধিবাসীদের ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের অত্যাচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, এটা তাদের বিরুদ্ধে ইংরাজ জনসাধারণের একটা মস্ত অভিযোগ। হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়াটা অপ্রীতিকর হলেও এটা বলতে হবে যে সব সময় কোম্পানী ভারতবাসীকে ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি বা রক্ষা করতে চায়নি। বাংলার লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের নাম উল্লেখ করে তিনি লেখেন অতি কর্মদক্ষ ও প্রভূত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই রাজ-পুরুষও বাঙালী সমাজকে বেশ

ভাল করে চেনেন। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যমণি বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটি সমস্তার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। তিনি ভালভাবেই জানেন যে ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে বাঙালীরা কেন সবচেয়ে অসন্তুষ্ট। তত্রাচ তিনি বাঙালী জমিদার ও প্রজাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীদের (নীলকর) খুশী করার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এমন নির্লজ্জ ভাবে নীলকরদের তোষণ করেনি। এর পর হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে চলতি সময়ে মফঃস্বলে নিযুক্ত ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটরা যারা সভ নিযুক্ত তারা সবাই দেশীয় ব্যক্তি মাত্রের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করে থাকে, দেশীয় সমাজে যাঁদের বেশ সম্মান আছে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিও ম্যাজিস্ট্রেটগণ অশিষ্ট আচরণ করে থাকে। আগ্রা ও পাঞ্জাবে সাদা চামড়ার লোক দেখলেই দেশীয় ব্যক্তিদের তাদের প্রতি 'সেলাম' জানাতে হয়। স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের মত সজ্জন শাসককে ইংরাজ 'পাব্লিক' এর চাপে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তবে এর পরই হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে কোম্পানী যে এই 'ইংরাজ পাব্লিক' কে বহু ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করেছে এটা মেনে নিতেই হবে। কোম্পানী শাসনের অবসান ইংরাজ 'পাব্লিকের' সোরগোলেরই পরিণাম। ভারতীয় বিদ্বেষী এই 'ইংরাজ পাব্লিক' কোম্পানী শাসনের অবসানে আরও উদ্ধত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সিপাহী বিদ্রোহের রেশ এখনও দেশ থেকে মিলিয়ে যায়নি, এই সময়ে কোম্পানী শাসনের অবসান না করে আরও কিছুকাল তাদের শাসন অব্যাহত রাখা উচিত ছিল ["But whatever the authors of that bill may intend, the community of 'Independent Britons' in India will view it in the light of concession to their clamour. They will henceforth learn to deem that clamour is almighty. In a moment of triumph they may even assume to take the law in their own hands and assert a political superiority over their native fellow subjects which has no foundation in fact and was never countenanced by law. These are probable consequences, and when they occur those politicians in England who have now declared against the company from motives of philanthrophy will regret that they had not reserved their cry for calmer times—H. P. 8. 4. 1858.]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান ও ও ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থা বিষয়টি নিয়ে পার্লামেন্টে দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিতর্ক চলেছিল। হরিশ্চন্দ্র এই বিচার বিতর্কগুলি পরম যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করে পেট্রিয়ট-এ নিয়মিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করতেন। এর কিছু কিছু অংশ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ডিজরেলী, লর্ড এলেনবরো প্রভৃতি এই ক্ষমতা হস্তান্তর বিতর্কে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ গ্ল্যাডস্টোন (William Ewart Gladstone 1819-1898) একটি বিতর্কের সময় এই মত প্রকাশ করেন যে "ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—এর ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে ভারতবাসীর স্বার্থ এতে উপেক্ষিত হচ্ছে। এঁদের কেউ কেউ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের হাতে সর্ববিধ ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশ করছেন। প্রাচ্যদেশের স্বৈরাচারী নৃপতির মত গভর্ণর-জেনারেলকে যথেষ্ট ভাবে ভারত শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। ইনি ইচ্ছামত যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন, প্রজাদের উপর যা খুসী নির্যাতন চালানোর অধিকারও এঁর থাকবে। অতঃপর মিঃ গ্ল্যাডস্টোন পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে সকাতরে অনুরোধ করেন যেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেলদের সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ না করেন। ভারতবাসীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হলে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে গভর্ণর-জেনারেল সংযত ভাবে দেশশাসন করেন। শাসিতের উপর অত্যাচার হলে কি ফল হয় ভারতীয় সিপাহীদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ তা দেখিয়ে দিয়েছে। কমন্স সভার সদস্যদের এ সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন"। এই উক্তি কালে গ্ল্যাডস্টোন ব্রিটিশ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। পরবর্তী কালে চারবার তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। মহামতি গ্ল্যাডস্টোনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে ইংল্যাণ্ডে জীবিত রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ গ্ল্যাডস্টোনের বক্তব্যকে মেনে নেওয়া প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন কমন্স সদস্যেরই উচিত ["And what sensible man with a knowledge of India, the proceedings of its rulers and the sufferings of its people will not lend his thorough support to this policy of one of the greatest and noblest living statesman of England. If his recommendations are not listened to, we sincerely believe England will place India in that predicament which will fulfil Lord Metcalfe's prophecy" India in the House of Commons (IX), HP 1858.]

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি আইন (য়্যাক্ট) এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান করে ভারত শাসন ভার ব্রিটিশ রাজের উপর (ক্রাউনের) অর্পিত হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ডের 'ক্রাউন' পদে অধিষ্ঠিত মহারানী ভিক্টোরিয়া (Queen Victoria) ভারতের রানী বা সর্বোচ্চ শাসক রূপে ঘোষিত হন। ইনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের

অধিকারিনী হন। তখন এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর একজন সদস্য বিশেষ ভাবে ভারত শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। এই পদাধিকারীর নাম হবে সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া (ভারত সচিব)। একটি কাউন্সিল বা পরিষদ ভারত সচিবের পরামর্শ দাতা রূপে কাজ করবে। পার্লামেন্টে ভারত শাসন বিল গৃহীত হওয়ার সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লর্ড ডারবি। ১৮৫৯ জুন মাস পর্যন্ত ইনি এই পদে ছিলেন। লর্ড ডারবির অধীনে তাঁর পুত্র লর্ড স্টান্লী (Lord Stanley) ভারত সচিবের পদ লাভ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ৯ই সেপ্টেম্বর (১৮৫৮) একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র এ বিষয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন যে সকল দিক বিবেচনা না করে, ভারতবাসীর ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে লক্ষ্য না রেখে অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো করে এই ভারত শাসন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদিচ্ছা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করছে। ["...there is no Indian who must not have been scandalized at the conduct of the parliament. With whatever eclat Her Majesty's direct reign over the country may be ushered in there is in all minds impervious to the cry and congratulation of the action, an invincible distrust—a feeling of insecurity"—The Transfer, H. P. 9.9.1858]

পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে মিঃ গ্ল্যাড্স্টোনের মত অভিজ্ঞ ও ভারতের প্রতি সদিচ্ছা-সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞরা ভারত শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয়নি।

এলাহাবাদে এক দরবার আহ্বান করে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১ নভেম্বর মহারানীর একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণা পত্রে বলা হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে সব চুক্তি করেছিলেন—সেগুলি নূতন গভর্ণমেণ্ট মেনে নেবেন। দেশের প্রাচীন রীতি নীতি মেনে চলা হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। ব্রিটিশ-প্রজা হত্যার অপরাধে লিপ্ত নয় এমন বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতানুসারে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হবে।

বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রতিটি জেলা শহরে এই ঘোষণা পত্রটি প্রচারিত হয়। সাধারণ ভারতবাসীর মনে এই ঘোষণা পত্রটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। অশেষ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে কোন আনন্দ উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেন নি। মহারানীর এই ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর হরিশ্চন্দ্র ৪ নভেম্বর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে শুধু লেখেন যে মহারাণীর ঘোষণায় যে সব কথা বলা হয়েছে

সেগুলি কাজে পরিণত করার ভার যাদের উপর, তারা এই দায়িত্বগুলি ঠিকমত পালন করছে কিনা তা আমাদের লক্ষ্য করে যেতে হবে [...."It remains to be seen whether the executors of the sovereign's commands can raise themselves to the height of their charge and render into their royal master a faithful account of the manner in which they shall have administered her gracious behests"—The Proclamation, H. P. 4. 11. 58]

মহারানীর ঘোষণাটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি লিখেছিলেন যে বেয়নেট, গুলি বন্দুকের জোরে বিদ্রোহ প্রশমিত করা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন তখন দেশে ছিল না। সেনাপতিদের ইচ্ছা মতই দেশ শাসিত হয়েছে (How long is this state of things to last....we say the bayonet has done its duty).

গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাইলের পর মাইল রাস্তার দুধারের গাছগুলিতে গ্রামবাসী কৃষকদের বিদ্রোহী সন্দেহে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিপাহীদের নৃশংসতার প্রতিশোধ বেশ ভাল ভাবেই নেওয়া হয়েছে। ইংরাজের সম্মান ত বেশ ভাল ভাবেই পুনরুদ্ধার করা হয়ে গেছে। এখন জনসাধারণের প্রতি উৎপীড়ন বন্ধ করলে, সেটা সরকারের দুর্বলতা বলে লোকে বিচার করবে সরকারী মহলের এই ধারণা। মহারানী রাজ্যভার গ্রহণ ঘোষণা করতে চলেছেন এই মুহূর্তে একটা ক্ষমারনীতি গ্রহণ করা উচিত। ["The Govt. of India has struck down armed opposition wherever it has dared to raise its head. Opposition now escapes only by flight. An amnesty, judiciously discriminating between different grades of criminals would now calm many troubles. And when could there be a better time by a grand act of mercy than the hour at which by a fortunate accident the sovereign of the realms has an opportunity to proclaim her reign in her own person over the greater portion of the empire"—The Pacification of the Country XII, HP 1.11. 58]

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন ডিকিনসন নামে একজন ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ Indian Reform Society নামে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ৩৯ জন সংস্কার পন্থী (Radical) সদস্যদের নিয়ে একটি উপদল গঠন করেন। এই দলটির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ করে ভারতে শিল্প বিস্তার। জন ব্রাইট (John Bright) এই দলের সভাপতি ছিলেন। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন অবসানে এই দলের বিশেষ হাত ছিল। মহারানীর রাজ্যভার গ্রহণের পরও এই দল

থেকে ভারতে শাসন সংস্কারের নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ত। এই দলের প্রস্তাব গুলি নানাক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে হিতকর হ'ত, কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যেত।

হরিশ্চন্দ্র মহারানীর কার্যভার গ্রহণের পর পার্লামেন্টে ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যেকটি আলোচনার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন ও এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক পার্লামেন্টের হাউস অফ্ কমন্সে আলোচনার জন্য একটি দীর্ঘ আবেদন প্রেরিত হয়, এই আবেদনে ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সংস্কার, বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগ, শিক্ষার উন্নতি, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয়গণের দাবীগুলি তালিকা ভুক্ত করা হয়। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, হরিশ্চন্দ্র এই আবেদনেরও খসড়া করেন।*

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন একটি সভা আহ্বান করে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিবাদ স্বরূপ একটি আবেদনও পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই দাবীগুলি সমর্থন করে দিনের পর দিন পেট্রিয়টে বহু সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে জন ব্রাইট, ভারতের এই দাবীগুলি তিনটি বিলরূপে পার্লামেন্টে উপস্থিত করেন। বহু কাটছাঁটের পর এই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত হয়। তবে এই পরিবর্তনগুলি রূপায়িত হওয়ার পূর্বেই হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। যে অধিকারগুলি পাওয়া গিয়েছিল তা আদায়ের প্রধান কৃতিত্ব হরিশ্চন্দ্রেরই প্রাপ্য।

ভারতের নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী (Member Finance, Legislative Council) সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের বিধ্বস্ত অর্থভাণ্ডারের ঘাটতি পূরণ উপলক্ষে আয়কর সহ বহুবিধ কর (Tax) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের মাধ্যমে এই প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়াবিল' আলোচনা কালে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে পার্লামেন্টের কমন্স সভায় ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ইংলণ্ড গমন বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ বিধায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব বিবেচিত হলে ভারত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য ভারতেই আর একটি 'পার্লামেন্ট' প্রচলন করা উচিত। তিনি আরও লেখেন

---

* Representative Indians (pp.47) G. P. Pillai, Manchester and New York- 1897.

যে অনেকেই মনে করেন যে বর্তমান ভারতীয় লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে (Indian Legislative Council) কিছু ভারতীয় সদস্য রাখা হলেই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এটা ভুল বিশ্বাস। আপাততঃ তিনটি প্রেসিডেন্সিতে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে তিনটি লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হতে পারে [The Indian people ought not to continue to be the victims of a selfish class legislation and class tyranny... the alternative left is to create a parliament in each of the presidencies of India.... (some) of our countrymen who interest themselves in politics are preparing for the admission of native members into the Legislative Council....The idea in the modesty of its aim is incomplete. What we want is not introduction of a small independent element in the existing Council but an Indian Parliament.—Indian Parliament, H.P. 7.4 1859]

কিছুদিন পর হিন্দু-পেট্রিয়টের আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে ভারতবাসীর জন্য একটি নিজস্ব পার্লামেন্টের ব্যবস্থা চাই। দেশীয়দের শাসন সংক্রান্ত কাজের উচ্চপদগুলি দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাস যে-বেশী দিন আমাদের বঞ্চিত রাখা সম্ভব হবে না। ['The Indian parliament and a more equitable infusion of the native element into the executive of the country are for the present at the height of the political aspirations of the most ambitious of our country men. We almost feel that it is not possible much long to deny us either'—An Indian Parlament H.P. 5.5.59]

মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক কার্যভার গ্রহণের পরেও লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উপরন্তু তাঁকে রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) পদ ও উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার কালে লর্ড ক্যানিং-এর বন্ধু ও নিয়োগ কর্তা লর্ড পামারস্টোন প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষীয় লর্ড ডার্বি এই পদের অধিকারী হন। ভারতীয় বেসরকারী ইউরোপীয় ও ইংলণ্ডের একশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞদের ক্যানিং এর দয়ালু নীতির প্রতিবাদ মূলক অভিযোগ অগ্রাহ্য করে লর্ড ক্যানিং-কেই মহারানীর রাজত্ব কালের প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদেই রাখা হয়। প্রথম 'ভাইসরয়' রূপে তাঁর পদ মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সাধ্বী পত্নী কলকাতায় আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন

করেন। ব্যারাকপুরের সরকারী সমাধিক্ষেত্রে Lady Canning-এর দেহ সমাহিত হয়। ব্যারাকপুরে লেডি ক্যানিং-এর সমাধিটি অজ্ঞাত ও অবহেলিত থাকলেও এই সাধ্বী সুশীলা বড়লাট পত্নী বাঙলার স্মৃতিতে 'লেডিকেনি' নামক বাঙলার পরম প্রিয় একটি মিষ্টান্নের নামের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে আছেন। লেডি ক্যানিং গোলাকৃতি চ্যাপ্টা ধরণের ছানা থেকে প্রস্তুত এই মিষ্টান্ন খেতে ভালবাসতেন কিনা অথবা কোন বিশেষ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী এই জনপ্রিয় বড়লাট পত্নীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য এই নাম রেখেছিলেন কিনা তা সঠিক বলা যায় না। তবে লর্ড ক্যানিং যে নিজেকে ভারতবাসীর আস্থা ভাজন রাখতে পেরেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

হরিশ্চন্দ্র কখনও ইংরাজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। হরিশ্চন্দ্র কোন দিন লর্ড ক্যানিং এর মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন সংবাদ জানা যায় না। তবে লর্ড ক্যানিং এবং অন্ততঃ একজন লেঃ গভর্ণর স্যার জন পিটর গ্রাণ্ট, যে হিন্দু-পেট্রিয়ট্ সম্পাদকের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। *

স্বদেশে পৌছানোর এক মাসের মধ্যেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন লর্ড ক্যানিং মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে লণ্ডনস্থ তাঁর গ্রভেনার স্কোয়ারে অবস্থিত প্রাসাদে পরলোক গমন করেন। ক্যানিং এর অসংখ্য গুণ-মুগ্ধ বন্ধু মনে করতেন যে এই সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। তাঁদের সে আশা ফলবতী হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ কালে ভারতবাসী নির্বিশেষে দমন-নীতি প্রয়োগের অসঙ্গত অনুরোধে কর্ণপাত না করায় কলকাতার বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' ব্যঙ্গছলে লর্ড ক্যানিং কে দয়ালু ক্যানিং (Clemency Canning) আখ্যা দিয়েছিল একথা একাধিকবার বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় প্রথম বিদ্রুপ রূপে ব্যবহৃত Clemency শব্দটি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ শ্রদ্ধাসূচক অভিধারূপে ক্যানিং এর নামের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল।**

কোম্পানী শাসনের অবসানে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনিক কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। লর্ড ক্যানিং আগের মতই ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত থেকে গিয়েছিলেন। তেমনি স্যার ফ্রেডরীক্ হ্যালিডে (১৮০৬-১৯০১) বাংলার লেঃ গভর্ণর বা ছোটলাটের পদে থেকে যান। হ্যালিডে কর্মদক্ষ প্রশাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি দুর্বলতা ছিল। নীলকরদের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল, নীল চাষীদের অত্যাচারকে তিনি খুব লঘুভাবে দেখতেন।

---

* Bengal Under Lt. Governors (II)-C.E. Buckland, Calcutta, 1902.

১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ৩০ জন নীলকরকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন, এর মধ্যে একজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন। পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র বহুবার হ্যালিডেকে সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হ্যালিডের অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে হ্যালিডে তাঁর কর্তব্য পালনে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।...তিনি আমাদের সমাজের এক বৃহদংশের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন [**"Mr. Halliday has notoriously failed in his duty ...has notoriously offended the nation at large."—H. P. 7.4. 1859**].

হ্যালিডেকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। ৩৬০ জন জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তি এই সভায় যোগ দেন। বেশীর ভাগ বাঙালী জমিদারদের এই সভায় যোগদান করতে রাজী করানো যায়নি এই জন্য বিহার ওড়িশা থেকে নামে মাত্র জমিদার এমন বেশ কিছু ব্যক্তিকে ধরে এনে সভায় যোগদান করানো হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র এদের 'বাতুলের দল' আখ্যা দিয়ে এই সভার আয়োজক জনৈক মহারাজা বনোয়ারী গোবিন্দের প্রতি ব্যঙ্গ-বাণ প্রয়োগ করেন। এই বিদায় সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল বেলভেডিয়ারে ছোট লাটের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। [**'We have got rid of Mr. Halliday at last ...Those among the three hundred and sixty have arrived at their advanced age of mental derangement. We will, however leave the men to lay the flattering unction to their soul provided of course they possess one. We will only tell the Raja Bonwari Govind who headed the metropolitan lunatics at large that his conduct is fast rendering him obsolete."—At Last H.P. 5.5.1859.**]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে লর্ড ডার্বি গঠিত মন্ত্রি সভার পতন হওয়ার পর যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন পুনরায় তার নেতৃত্ব পেয়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। সর্ব প্রথম ভারত সচিব লর্ড স্টানলির পরিবর্তে সার চার্লস উড্‌ ভারত সচিব নিযুক্ত হন। লর্ড স্টানলি ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর পরিবর্তে সার চার্লস উড্‌ ভারত সচিব পদ গ্রহণ করায় হরিশ্চন্দ্র তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চার্টার অ্যাক্ট'টি পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার কালে চার্লস উড্‌ ভারতবাসীর স্বার্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। সার চার্লস সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্রের মন্তব্য এই ছিল যে সার চার্লস উড্‌ নিজে যেমনই লোক হোন না কেন, যে কোন ভারতবিদ্বেষী দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভারতবাসীর স্বার্থহানি করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে আছে [**"The coalition Ministry**

which has ousted Lord Stanley from the Ministry of Indian affairs has inflicted a deep injury on the people of India by filling up the vacant place with Sir Charles Wood. One less provedly unfit for the office could scarcely be found than the Yorkshire Baronet who was employed to carry the India Bill of 1853. Sir Charles Wood is precisely the man to place himself with a bargain for his confidence....Lord Stanly's replacement by Wood amounts to a misfortune"—The New Indian Minister H.P. 16.7.59].

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতে বেসরকারী ইংরাজদের বসবাস ও শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টের সময়েও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ মূলধনে এদেশে শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার হবে—তাতে ভারতবাসী লাভবান হবে। এই সূত্রে ভারতীয়েরা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি বিদ্যা শিখে নিয়ে নিজেরাও শিল্পোদ্যোগে মনোযোগী হবে। উন্নত পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তা ভারতেও প্রসার লাভ করবে। ভারতবাসীর সমর্থনেই 'কলোনিজেসন' ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার অ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানী অবশ্য এই কলোনিজেশনের বিরোধী ছিল। বেসরকারী ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের কোম্পানীর ভাষায় interloper বলা হত। ১৮৩৩ এর পর থেকে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। চার্টার অ্যাক্টের সুযোগে ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্য দেশের কিছু ভাগ্যান্বেষী ভারতে বসবাসের সুযোগে নীল ব্যবসায়েই প্রধানতঃ মন দিয়েছিল। এরা এসে দু-চার বছরের মধ্যেই প্রভূত অর্থ জমিয়ে সেটাই মূলধনে পরিণত করে নিজের নিজের ব্যবসার সম্প্রসারণ করে নিত। ব্রিটিশ মূলধন মোটেই এদেশে আসে নি। শিল্পোদ্যোগও এদের দ্বারা বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেনি। কলোনিজেশনের কুফল রামমোহন দেখে যেতে পারেননি, দেখে যেতে পারলে স্বদেশ-প্রেমিক রামমোহন অনুতাপানলে দগ্ধ হতেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মর' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলোনিজেশনের উগ্র সমর্থক ছিল। কয়েক বৎসর পর এই রিফর্মরকেই এই ভাগ্যান্বেষীদের দেশের দুরবস্থার জন্য দায়ী করতে হয়েছিল।

অতীতকালে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি দেশীয় প্রধানগণ ভুল করলেও হরিশ্চন্দ্র এ বিষয়ে ভুল করেননি। হরিশ্চন্দ্র সাধারণ ইংরাজ চরিত্র অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে মুষ্টিমেয়

ইংরাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে তিনি ইংরাজদের মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইংরাজদের তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা করতেন। ইংরাজ মনীষীদের সম্বন্ধেও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

কলোনিজেশন প্রস্তাবটি তাই পার্লামেন্টে উত্থাপিত হওয়া মাত্রই হরিশ্চন্দ্র তীব্র ভাষায় অনেক যুক্তি দেখিয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি লেখেন যে সিপাহী বিদ্রোহের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই এই নূতন ধরনের শোষণ প্রয়াস প্রস্তাব অতি গর্হিত ও অসমর্থনীয় ["Colonisation of India may thus be held as not only feasible but undesirable."—Colonisation of India, H.P. 18.11. 59]

১০.

নীল বিদ্রোহ ও হরিশ্চন্দ্র

শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব যাই হোক না কেন বাংলার সাধারণ মানুষের উপর সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব পড়েছিল। ইংরাজের অত্যাচার-ক্লিষ্ট বাঙালী জনসাধারণ ইংরাজের এই বিপর্যয়ে খুসীই হয়েছিল। বাঙালার সুদূর পল্লীগ্রামেও নানা সাহেব ও তাঁতিয়াটোপীর বীরত্ব ও ইংরাজ বিরোধিতার কথা সশ্রদ্ধ ভাবে আলোচিত হত। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও পরবর্তী ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বাঙলা দেশে নীল-বিদ্রোহের অন্যতম প্রেরণা জুগিয়েছিল একথা মনে করা বোধ হয় ভুল হবে না। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই বাঙলার নীল-বিদ্রোহের সূচনা হয়। এখানে বাঙলায় নীল চাষের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতে বহুকাল আগে থেকেই নীল চাষ প্রচলিত ছিল। নীল গাছ বুনে ফুল ফোটার আগে গাছ কেটে ফেলে, গাছের ডগা ও পাতা বড় গামলায় কয়েকঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হত। জল হরিদ্রা বর্ণ হয়ে গেলে সেগুলি একটি পাত্রে ঢেলে সিদ্ধ করা হত, মধ্যে মধ্যে ঘেঁটে দেওয়া হত। এই ভাবে জল সবুজ হয়ে আসত ও ক্রমশঃ দানা বেঁধে নীলে পরিণত হত। ভারতে প্রস্তুত এই নীল বিদেশে রপ্তানি হত। ভারত থেকে উৎপন্ন এই জন্য 'ইণ্ডিয়া' শব্দটি থেকে এই বস্তুটি বিদেশে 'ইণ্ডিগো' আখ্যা পায়। ইউরোপে কাপড়ের কল প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতে প্রস্তুত নীলের চাহিদা বিদেশে বেশ বেড়ে যায়। আগে পাঞ্জাব ও বর্তমান উত্তর প্রদেশের আগ্রা অযোধ্যা অঞ্চলেই নীল চাষ হত। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকে বাঙলা দেশে নীল চাষ প্রবর্তিত হয়। ক্রমে ক্রমে বাঙলাই নীল চাষে অগ্রণী হয়। একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশে ১ ২৮,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকেরা এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিল। এরা এদেশে উৎপন্ন নীল ইউরোপে রপ্তানি করে প্রচুর উপার্জন করত। ব্যবসা করতে এসে ইউরোপীয় বণিকেরা ক্রমে ক্রমে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল। ক্রমশঃ এই বণিকেরা এদেশে নীলকুঠি স্থাপন করে নীল চাষ ও নীল উৎপাদন সুরু করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা বিহার ও ওড়িশার আধিপত্য লাভ করার পর বহু ইংরাজ নীলকরকে

এদেশে নীলচাষের অধিকার দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেরাও নীল ব্যবসায়ে নেমেছিল। এই ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ব্যাপক ভাবে নীল চাষ শুরু হয়। ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাঙলার জমিদারেরাও নীল চাষে মন দেন, তবে বাঙালি জমিদারেরা ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হঠে যেতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার য়্যাক্ট্ প্রবর্তনের পর ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজদের এদেশে বসবাসের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৩৩ এর চার্টার য়্যাক্টের সুযোগে 'ভদ্র ইংরাজ' এর পরিবর্তে কতকগুলি নীচ, শঠ, স্বার্থপর ও ধূর্ত্ত ইংরেজ এদেশে জমিজমা কিনে বা দখল নিয়ে বসেছিল, এদের অনেকেই লাভজনক নীলের ব্যবসায় রত হয়। বাঙলায় নীল চাষ সুরু হওয়ার কাল থেকেই নীলকরেরা প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার করত। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর আমলে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ, গুদামে আটক রাখা, গরু বাছুর আটকে রাখা, চামড়া মোড়ানো বেতের দ্বারা (শ্যামচাঁদ) প্রজাদের প্রহার প্রভৃতি অভিযোগ এসেছিল। নীলকরেরা চাষীদের উপর বলপ্রয়োগ করে 'দাদন' নিতে বাধ্য করত। চাষীর দাদন নেওয়ার অর্থ ছিল সে নিজের জমিতে আর কোন বস্তুর চাষ করতে পারবে না। যে চাষী একবার দাদন নিয়েছে তার আর নীলকরদের কবল থেকে বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না, পুরুষানুক্রমে সে চাষ করতে বাধ্য থাকত। বড় লাট লর্ড মিণ্টো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর এই আদেশ দেন যে নীলকরেরা জোর করে চাষীদের 'দাদন' নিতে বাধ্য করেছে বা চাষীদের উপর কোন জুলুম করেছে এই অভিযোগ পেলে যেন তদন্ত করে নীলকরদের শাস্তি দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই নির্দেশে কোন কাজ হয়নি কারণ পল্লী অঞ্চলে চাষীদের নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কোন সাহস ছিল না, অভিযোগ প্রমাণ করারও কোন সাধ্য ছিল না। তাছাড়া সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেট্‌রা সবাই প্রায় ছিল স্বদেশবাসী নীলকরদের বন্ধু। সুতরাং নীলকরেরা মিণ্টোর নির্দেশ লঙ্ঘন করে অবাধে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ আইনে (Regulation VI) নীলকরদের এই ধরণের একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে যে চাষীরা টাকা দাদন নিয়েছে তাদের জমির উপর নীলকরদের একটি বিশেষ স্বত্ব থাকবে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম আইনে (Regulation V, 1830) দাদন গ্রহণকারী চাষীদের নীলচাষে অসম্মতি দণ্ডযোগ্য অপরাধ রূপে ঘোষণা করা হয়। এই দণ্ড হল কারাবাস। একবার দাদন নিয়ে কোনও চাষীর পক্ষে দাদনের টাকা ফেরত দিয়ে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় ছিল না, নীলকর কোনমতেই এই টাকা ফেরত নিত না। এইভাবে চাষীদের ভাল ভাল জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হত। দাদনের চুক্তি অনুযায়ী উৎপন্ন একমণ নীলের জন্য চাষীকে দেওয়া হত ৪ টাকা, এদিকে

এই নীলের মূল্য ১০ টাকা। এই চার টাকা থেকেও নানা অজুহাতে এর অধিকাংশ টাকা কেটে নেওয়া হত। এইগুলি ছিল বীজের দাম, চুক্তি পত্রে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের দাম, পরিবহন খরচ ইত্যাদি। চার টাকা এই সব খাতে কাটা গিয়ে যে দু এক টাকা পাওনা হত তা থেকেও নীলকুঠীর নায়েব, গোমস্তা ও পাইকদের (পানখাওয়া বা জল খাওয়া, নজরানা ইত্যাদি নামে) উৎকোচ দিতে হত। এক বিঘা জমিতে নীল চাষের চুক্তি-বদ্ধ চাষীকে প্রকৃত পক্ষে আরও বেশী জমিতে চাষ করতে হত কারণ নীলকরের পাইক গোমস্তারা জোর করে ভুল মাপ দেখিয়ে জমি 'দেগে' দিয়ে যেত। নীল ওজন করার সময় ওজন চুরি হত, অর্থাৎ দেড় মণ নীল একমণ বলে ওজন করে সেই হিসেবে পারিশ্রমিক দেওয়া হত। চাষীর যে জমিটুকু উৎকৃষ্ট সেই জমিতেই নীল চাষ করতে বাধ্য হত। যে জমিতে নীল চাষ করতে চাষী বাধ্য হত সে জমিতে ধান, তামাক বা আলু চাষ করলে চাষী আরও আয় করতে পারত কিন্তু তা করার কোন উপায় ছিল না। নীলকরের ইচ্ছার কোন বিরুদ্ধাচরণ করলে নীলকরের পেয়াদা পাইকেরা প্রজাদের কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করত, অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকার গুদাম ঘরে তাদের আটকেও রাখা হত। গরু বাছুর ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া বা নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাও ঘটত। ধান, আলু, তামাক ইত্যাদি ক্ষেতের অন্যান্য ফসলও কেটে নিয়ে যাওয়া হত। এসবই ঘটত নীলকরের হুকুমে, কখনও কখনও নীলকর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই সব অত্যাচার করাত। নীলকরের সব হুকুম মেনে নেওয়া ও ভবিষ্যতে অবাধ্যতা না করার প্রতিশ্রুতি পেলে তবে চাষীকে ছেড়ে দেওয়া হত। অনেক সময় দেখা যেত যে চাষী যে টাকা দাদন নিয়েছে সে টাকার মূল্যের সঙ্গে পাল্লা রেখে তার নীল উৎপন্ন হয়নি। তখন পর বৎসরের দাদনের জন্য দেয় টাকা থেকে তাকে আগের বছরের দেনা শোধ করতে হত। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে ৩৩,২০০ জন নীল চাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন চাষী সামান্য কিছু টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছে। বাকী চাষীরা নগদ কিছুই পায়নি। এই চাষীদের পাওনা টাকার জন্য একটা 'খৎ' (Bond) সই করতে হত।* এই খৎ লিখে দেওয়ার অর্থ ছিল এই যে টাকাশোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিনা দাদনে নীলচাষ করে যেতে হবে। চাষীদের যে কোন উপায়ে নীলচাষের চুক্তি পত্রে সই করানোই নীলকরদের লক্ষ্য ছিল। এর জন্য তারা আইনের কোন পরোয়া করত না। অনেক সময় চাষীকে সাদা কাগজেও সই করতে বাধ্য করা হত।

নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের অধিকার চাষীর অবশ্যই ছিল কিন্তু দরিদ্র চাষীর পক্ষে এই অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভবপর হত

---

* Renascent India—(PP 162—163)—R.C. Majumdar, Calcutta.

না। কোন রকমে আদালত পর্যন্ত পৌঁছালেও চাষীর পক্ষে সুবিচার পাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ সাদা চামড়ার জজ ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের পক্ষে নীলকরদের বিপক্ষে যাওয়া সম্ভব হত না। অভিযোগ পেয়ে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট্‌ বা পুলিশ এসে অভিযুক্ত নীলকরেরই আতিথ্য গ্রহণ করত। এখানে বলা প্রয়োজন যে নীল চাষ দুই প্রথায় চলত। একটি 'নিজ' ও একটি 'রায়তী'। 'নিজ' প্রথায় নীলকর নিজের জমিতে সস্তা মজুরি দিয়ে নীল উৎপন্ন করত, এতে তার লাভ কম হত। কাজেই তার ঝোঁক ছিল 'রায়তী' চাষের দিকে এতে প্রচুর লাভ হত। কাজেই বাঙলা মুলুকে 'নিজ' চাষের চেয়ে 'রায়তী' চাষ এলাকার আয়তন ছিল বহু গুণ অধিক। নীলকরদের মূলধন অতি অল্পই ছিল, অতি সামান্য অর্থ নিয়ে তারা ব্যবসা আরম্ভ করে অল্প দিনেই ফুলে ফেঁপে উঠত। আর এই টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হত। নীল চাষীর রক্ত মাখা অর্থ ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল তার অন্যতম মূলধনের স্থান গ্রহণ করেছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল জুড়ে বাঙলার মানুষ নীলকরদের এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে এসেছিল।

'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সম্পাদনের ভার পেয়েই হরিশ্চন্দ্র বাঙলার চাষী সমাজের অবস্থা অনুসন্ধানে ব্রতী হন। বাঙলার চাষী শুধু বহু নিন্দিত জমিদারদের দ্বারাই শোষিত নয় এবং জমিদারই বাঙলার কৃষক সমাজের একমাত্র উৎপীড়ক নয় একথা হরিশ্চন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন। খোঁজ খবর নিয়ে তিনি জেনেছিলেন যে বাংলার চাষীদের সর্বাপেক্ষা শত্রু নীল ব্যবসায় ও নীলকর। বাঙলা ভাষার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর' 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মাঝে মাঝে এই চাষী উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশিত হত। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের সূচনা কাল থেকেই নীল চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। মফঃস্বল বাঙলার নানাস্থান থেকে এই সম্পর্কীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি সংবাদদাতা নিয়োগ করেন।

বাঙলার নবনিযুক্ত লেঃ গভর্ণর হ্যালিডে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সরকারী কাজে নদীয়া জেলা পরিদর্শন কালে তথাকার অধিবাসীগণ তাঁর কাছে একটি আবেদন পত্র পেশ করেছিল। এই আবেদনে খেটে খাওয়া কৃষক ছাড়াও জেলার জমিদার, উকিল ও মোক্তারদেরও স্বাক্ষর ছিল। এই আবেদনে বলা হয় যে দেশীয় সমাজের প্রত্যিটি মানুষ নীলকরদের অন্যায় উৎপীড়নে সন্ত্রস্ত। এই আবেদনে আরও বলা হয়েছিল যে দেশের মানুষদের জন্য যে আইন্‌ বলবৎ আছে তা নীলকরদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পুলিশ সকল বিরোধের ক্ষেত্রেই নীলকর-দেরই পক্ষ নিয়ে থাকে। নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তারা জমিদার ও প্রজাদের উপর জুলুম চালায়। খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে নীলকরেরা পুলিশের সহায়তায় চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। নীলের জন্য প্রাপ্য দাম ও

চাষীকে ঠিক মত দেওয়া হয় না, প্রাপ্য টাকা থেকে অনেক কম টাকা দেওয়া হয়। এই দরখাস্তে আরও বলা হয় যে জেলার নৌকা পারাপার বাবদ অর্থ-তহবিল আগে জমিদারদের হাতে থাকত, জমিদারেরা এই তহবিলের টাকায় রাস্তাঘাট তৈরী, রাস্তা মেরামত ইত্যাদি করাতেন। এখন জমিদারদের হাত থেকে এই 'ফেরী-ফাণ্ড' নীলকরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। নীলকরেরা এই টাকা শুধু নীলকুঠিগুলিতে যাতায়াতের রাস্তা তৈরী ও মেরামতে ব্যয় করে থাকে, জনসাধারণের পক্ষে এই রাস্তাগুলি অপ্রয়োজনীয়। এই দরখাস্তে আরও বলা হয় যে নদীয়া জেলার অর্দ্ধেকের বেশী জমির মালিক এখন নীলকর সমাজ, জমিদারেরা জমির আসল মালিক হলেও তারা 'বিজিত' জাতি হিসেবে অর্দ্ধেকেরও বেশী জমি নীলকরদের কাছে 'পত্তনি' সর্তে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। হ্যালিডে এই আবেদন পত্রে লিপিবদ্ধ অভিযোগগুলি সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য নয় এই অজুহাতে এটি অগ্রাহ্য করেন। এই অভিযোগটি তিনি অনুসন্ধান যোগ্য বলেও মনে করেননি। হ্যালিডের এই মনোভাবের নিন্দা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র এবিষয়ে কিছু সন্তোষও প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন যে মফঃস্বল বাঙলার মানুষের এই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এই আবেদনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশের প্রজা হিসেবে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে তারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সমস্যাগুলির বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং তাদের অভিযোগ গুলি শাসকদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছে। ["They are learning to exercise the privileges of the British subjects to meet together in public to discuss questions of public importances and to convey full expression of their opinions thereupon to their rulers".—H. P. 17.8. 1854]

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বিভ্রান্ত-চিত্ত হ্যালিডে কয়েক বছর পরে এমন একটি কাজ করেন যার ফলে বাঙলা দেশে নীল বিদ্রোহের ঘটনাটি ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি দেশীয় সমাজের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ২৯ জন ইউরোপীয় নীলকরকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। মাত্র মুখ রক্ষার জন্যই এই পদ দেওয়া হয়েছিল। নীলকর ম্যাজিস্ট্রেটদের ভয়ে মফঃস্বলের মানুষেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। পল্লী অঞ্চলে এই নীলকরদের সম্বন্ধে বলা হত 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক'। হ্যালিডের এই অপকর্মের পরিণাম পরে আলোচিত হবে।

ইউরোপীয় সমাজ থেকেও অনেক সময় নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হত। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বহু ইউরোপীয় পাদ্রী খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র চাষীদের এঁরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতও করেন

নীলকরদের অত্যাচার এই দেশীয় খ্রীষ্টানদেরও আঘাত করত। এই জন্ত মফঃস্বলের ইংরেজ ও জার্মান জাতীয় খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এইসব অত্যাচারের সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্ত পাঠাতেন। এমনি বহু সংবাদ কলকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রেও স্থান পেত। হিন্দু-পেট্রিয়টেও এমনি অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধ সংক্রান্ত একটি 'বিল' লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপনের প্রস্তাব হয়। এই সময় নীলকর সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদনে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে বাঙলার জমিদার শ্রেণী এবং কিছু কিছু ইংরাজ আমাদের নীলকর সমাজকে একদল অত্যাচারী গুণ্ডা বদমায়েস রূপে চিত্রিত করছে। এর উপর হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নীলকরদের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে সেটা তাঁদের স্বদেশবাসীগণই তৈরী করে দিয়েছেন, আমরা ভারতীয়েরা শুধু এটা বিশ্বাস করেছি। তার কারণ এই নয় যে আমাদের ঘরের আশেপাশে তারা ব্রিটিশ ব্যবসায়ী রূপে বাস করছেন আর আমরা তাদের হিংসা করছি। তবে আমাদের পক্ষে একমাত্র বেদনার কারণ এই যে এ্যাংলো-সেকশন জাতি নিজেদের মধ্যে যে ভাবে বাস করে এবং যে নীতি মেনে চলে, অন্য জাতের সম্পর্কে এসে তাদের সেই মনোভাব ও নীতি বোধ পাল্টে যায়। ["... but because **they (the Indians) have learnt the painful fact that, ready as the Angle-Saxon is to observe the law with his own race, he always conceives himself above the obligations of the law when dealing with another race"—The Zamindar and the Planter—H. P. 26, 6. 1855].**

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে 'রায়ত' ছদ্মনামধারী এক মফঃস্বলবাসীর একটি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে ইউরোপীয় নীলকরেরা বাঙলার চাষীদের প্রতি কি প্রকার অত্যাচার করে থাকে এবং ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট্ থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম পুলিশ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাদের প্রতি কি পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়। পত্র লেখক স্বীকার করেন যে মাত্র দু একজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট্ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে প্রজার স্বার্থ দেখে থাকেন এমনি একজন মহানুভব সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ ম্যাঙ্গলস (Mr. Mangles)। পত্র প্রেরক বলেন যে নীলকরদের সপক্ষে অনেকে বলে থাকেন যে এরা বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তা তৈরী, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করেন। এ সম্বন্ধে পত্র প্রেরকের মন্তব্য এই যে, তাই বলে কি এরা গ্রাম-নগর লুঠ করবে, আর অবাধে লোকজন খুন করবে? মফস্বল বাঙলায় এদের কাজের প্রতিবাদ করার কেউ নেই, দেশের যারা শাসক তারা এদের বন্ধু ও আত্মীয়। অতএব কোন একজন পণ্ডিতকে মাসে

ছ'টাকা সাহায্য দিয়েই এরা প্রজার হিতসাধনের কৃতিত্ব আদায় করে থাকে। পরিশেষে পত্র লেখক নীলকরদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত তারা নিশ্চিন্ত থাকুক।

১৮৫৪ থেকে হরিশ্চন্দ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের পক্ষ নিয়ে লেখা শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে হরিশ্চন্দ্র নিয়মিত ভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন। মফঃস্বলে তিনি কয়েকজন সংবাদদাতা নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন নিতান্ত তরুণ যুবক একজন শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১২) ও অন্যজন মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬)। উত্তর কালে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রূপে বিখ্যাত হন। মনোমোহন প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজের সম্পাদক ও পরবর্তী কালে সার্থক আইনজীবী রূপে সবিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে নীলচাষীদের বিদ্রোহ ও নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র নীলচাষ প্রথা ও নীলকরদের সম্বন্ধে জালাময়ী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত এমনি একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে বর্তমানে বাংলায় যে ভাবে নীলচাষ প্রচলিত আছে তা' একটা সুসংগঠিত জুয়াচুরি ও নিপীড়ন ব্যবস্থা মাত্র। যাঁরা এর প্রতিবিধানের জন্য দায়ী বা সক্ষম তাঁরা সব জেনে শুনেও নিষ্ক্রিয় থাকেন। ব্যবস্থাপক সভা এই অত্যাচারের বিষয় স্বীকার করেন না। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন। ইংল্যাণ্ডের জনগণ এবিষয়ে অজ্ঞ। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেরও এই অত্যাচারের বৃত্তান্ত জানা নেই। বিশ্বের সভ্য সমাজেও এই অত্যাচার কাহিনী অশ্রুত। এই অবস্থায় আমরা জেনে সুখী হয়েছি যে এই নীলচাষ প্রথার অনিষ্টকারিতা বিষয়ে প্রচার কার্যের জন্য কিছু সাহসী জনসেবক চেষ্টা শুরু করেছেন।* দেখা যাক্ নীলচাষ কিভাবে হয়। প্রথমে কিছু জমি দীর্ঘকালের জন্য অথবা চিরস্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। কলকাতার কোন বণিক সংস্থার টাকায় অতঃপর একটা ফ্যাক্টরী বা নীলকুঠি স্থাপন করা হয়। এর পর চাষীদের কিছু আগাম দিয়ে তাদের নিজের জমিতে তাদের নিজেদের হাল, বলদ ইত্যাদির সাহায্যে নীলচাষ করতে বলা হয়। এই আগাম বা দাদনের টাকা নীলগাছ চাষ করে শোধ দিতে হয়। ফসলের দাম ঐ সময়েই ঠিক করা হয়। নীলকরের কর্মচারীরা ঠিক করে দেয় কোন কোন জমিতে ও কত পরিমাণ জমিতে নীল চাষ করতে হবে, এবিষয়ে চাষীর স্বাধীনতা থাকে না। কুঠি থেকে নীল বীজ দেওয়া হয় কিন্তু তার মূল্য ফসলের দাম দেওয়ার সময় কেটে নেওয়া হয়। ফসল উৎপাদনের সব দায়িত্ব চাষীকেই নিতে হয় অর্থাৎ ফসল কম হলে চাষীরই ক্ষতি। ফসল

* এঁদের মধ্যে Rev. Aleaxender Duff এর নাম উল্লেখযোগ্য

উৎপাদনের পর চাষী ফসল কুঠিতে নিয়ে যায়। ঐ ফসলের মূল্য যা হয় তা চাষীর নামে জমা হয়, তবে দাদনের দাম কেটে নিয়ে চাষীর ভাগ্যে আর কিছু থাকে না। নীলকুঠিতে নীলগাছ থেকে নীল তৈরির কাজ হয়। নীলকুঠি এই নীল কলকাতার বাজারে চালান দেয়। এই নীলকরেরা জমিরও মালিক। জমির মালিক বা জমিদারদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকে। ইউরোপীয় জমিদার হলে ত কথাই নেই ইউরোপীয় নীলকর তার জমিদারির প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য করে, এর বিনিময়ে চাষী-প্রজার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। এদের জমির এক চতুর্থাংশে নীল চাষ করতে এরা বাধ্য। নীলচাষের সব চাষীর যে সামান্য পাওনা তার থেকে কুঠির দেওয়ান থেকে খালাসী পর্যন্ত সকলকে উপরি বা ঘুষ দিতে হয়। চাষী যে আগাম নেয়, ফসলের দাম থেকে তা উশুল না হলে বাকী টাকার জন্য যে চড়া হারে স্থদ নেওয়া হয়, সেই চড়া হারে স্থদ সাধারণ ক্ষেত্রে স্থদখোর মহাজনেরাও পায় না। যে চাষী একবার নীলকুঠির বা নীলচাষের সম্পর্কে এসেছে সে জীবদ্দশায় আর পরিত্রাণ পায় না। নীলকুঠির হিসেবেও অনেক কারচুপি থাকে। কোন চাষী তর্ক-বিতর্ক করলে বা অবাধ্যতা দেখালে তার ভাগ্যে জোটে প্রহার এবং কুঠির অন্ধকার ঘরে বন্দীত্ব। বাঙলা দেশে নীলচাষীদের নীল কুঠির গুদাম ঘরে বেআইনি ভাবে বন্দী হয়ে হাজত বাস নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই নীলকরেরা আবার এখন গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিচ্ছে যাতে নীলচাষের জন্য চুক্তি বদ্ধ অনিচ্ছুক চাষীকে নীলচাষে বাধ্য করার জন্য আইন তৈরী হয়। অনিচ্ছুক চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করাই হচ্ছে নীলকরদের অভীষ্ট। জন-মজুর দিয়ে নীলচাষ করাতে হলে গাঁঠের পয়সা খরচ করতে হবে এই জন্য চাষী-প্রজা দিয়ে নীল চাষ করাতে নীলকরদের এত আগ্রহ। নীলচাষীকে নীলকর কখনও ন্যায্য দাম দেয় না। যেখানে বিনা বাধায় অত্যাচার করে লাভ তুলতে পারা যায় সেখানে মানুষ এই অত্যাচার প্রবৃত্তি সংযত করতে পারে না। আমরা বহুবার এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছি যে আমাদের দেশের মানুষ এদেরই স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রূপে ভাবতে শেখে। বেসরকারী স্বাধীন ইংরাজ চরিত্র যে অন্যরকম হতে পারে এ ধারণা তাদের মনে স্থান পায় না। বস্তুতঃ নীল-ব্যবসায় এমনি একটি স্থসংগঠিত জুয়াচুরি ও অত্যাচার-মূলক ব্যবস্থা যে এই ব্যবস্থা যে কোন মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে দিয়ে থাকে। ["We have said that the system of Indigo planting asit now exists in Bengal is a system of orgainsed fraud and oppression. This fact though well known throughout the country has not been admitted in those quarters from which relief is to be expected. The legislature has not admitted it, officials ignore it. The

British public do not know it. Parlia-ment does not know it. The civilized world has no idea of it. We are glad therefore to see the efforts that are being made by courageous and public spirited men to expose the evils of the system........ Let us see what the system is....A lease for a long term or for perpetuity is taken. A factory and works are established with money advanced by a Calcutta firm of merchants. The ryots are called on to grow indigo for the factory each according to his resources in agricultural implement and the quality and capacity of the land he holds and for that purpose made to take advances of money to be repaid in produce in kind at price fixed in the time. The lands to be cultivated and their extent is determined by agents of the factory. The seed is supplied by the factory to be paid for by the cultivator. The cultivator is subject to more than the usual risks of cultivation in Bengal. The crop is raised and carried to the factory, where it is taken at the original valuation. The value is carried to the credit of the ryots account, which is then adjusted according to the balance struck. The business of the factory, it will be observed, is confined to manufacturing the raw produce into the saleable drug and to send it down to Calcutta for sale.

...The factory never pays a fair price to the ryot for the plant, and where oppression can be practised at once with profit and impunity, it is not in human nature to resist the temptation. We have always regretted the circumstances which make the Indigo planter the chief representative of the independent British community in India in the eyes of its people—the type of the unofficial ordinary Englishman. He can not help being an oppressor, the system makes him so, he must submit to it or give up his business... (As) an Indigo planter he represents and he is an active agent of a system of organised fraud and oppression. The system is thoroughly bad and towards its reform should be directed the most

strenous efforts of patriotism, philanthropy and publtc spirit" —Indigo Planting H. P. 29. 7. 1858.]

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নীলকরদের (Planters' Association) পক্ষ থেকে সরকারের কাছে (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) একটি আবেদনে সরকারকে অনুরোধ করা হয় যেন এমন একটি বিল 'পাশ' করা হয় যাতে রায়তদের জুয়াচুরি ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে তারা অর্থাৎ নীলকর-সমাজ রক্ষা পেতে পারে। হরিশ্চন্দ্র এসম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরের যে সংঘর্ষ বাধে তা অর্থনৈতিক নয়। জমিদার নীলকরকে নিজের জমি পত্তনী দিয়ে লাভবানই হয়। প্রজার উপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ অসহ্য হয়ে উঠাতে জমিদার মনুষ্যত্বের দিক থেকে প্রজার পক্ষ নেয়। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র দু-একজন জমিদারের নিছক প্রজার স্বার্থেই নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত দেন। এঁদের একজন রামরতন রায় অপরজন নলডাঙ্গার রাজা। এঁরা দুজনেই প্রজার পক্ষ নিয়ে নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে নীলকরেরা জমিদার হয়ে বসতে পারলে তাদের কাজের খুব সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁরা জমিদারি কিনে 'মূলধন' আটকে রাখতে অনিচ্ছুক। এদের এই মূলধনও নেই। এরা জমিদারের কাছ থেকে লীজ বা পত্তনি নিয়ে নীল চাষ করতে চায়, ও চাষের এলাকা বাড়াতে চায়। নিরীহ ও দরিদ্র চাষীরা নীলকরের হুকুম মত নীল চাষে অরাজি হলে নীলকরেরা চান যে জমিদার যেন তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রজাদের নীল চাষে বাধ্য করেন। এই নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই থাকে। এখন এই নীলকরেরা পত্তনি দাতা জমিদার ও অবাধ্য চাষী দুপক্ষকেই নীল চাষে বাধ্য করার জন্য একটি বিল আনতে চাইছে। হয়ত এই বিলটি বাঙলা গভর্ণমেন্টের অনুমোদন বা সম্মতির অপেক্ষা না করেই ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়ে যাবে। (The Zamindar and the Planter H.P. 26. 8. 58.)

ঐ দিনই আর একটি প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র নীলকর সমাজের প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণনগর থেকে দু মাইল দূরে অবস্থিত একটি নীলকুঠির এক নীলকর সাহেবের কথা উল্লেখ করেন। হরিশ লেখেন যে ইনি ফ্যাক্টরীর মালিকের পুত্র বর্তমানে ইনিই কুঠি চালান।* এই কুঠির অধীনে এমন অনেক জমি আছে যেগুলি কুঠির 'তালুক'। বাঙালী জমিদার বাবুরা লাঠিয়াল রেখে জমিদারিতে শান্তিরক্ষা করেন। নীলকরদের এই ভাবে লাঠিয়াল পোষার প্রয়োজন কম হয়। কারণ প্রজাদের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নীলকুঠির সাহেবের খুব খাতির আছে। বস্তুতঃ আলোচ্য নীলকর সাহেব নিজেই এই

* এই নীলকরের নাম ছিল উইলিয়ম হোয়াইট। এর একটি কুঠি নদীয়া জেলার বাঁশ-ডিয়ায় অবস্থিত ছিল। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, F. R. Cockreller এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল।

অঞ্চলের শাসন-কর্তা হয়ে বসে আছেন। এই নীলকর সাহেবের একটি নিজস্ব জেলখানা আছে, ফৌজদারী ব্যবস্থার সব সরঞ্জামই সেখানে মজুত থাকে।—যথা, হাতকড়া, লোহার শেকল, খোঁচা মারার অস্ত্র ইত্যাদি। একবার এই এলাকার এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লেগেছিল, এই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে তার জরিমানা করা হল এবং তার প্রতিবেশী অন্য একটি ব্যক্তিকে বাড়ীতে আগুন লাগানোর অভিযোগে তার ষাট টাকা জরিমানা করা হল। চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসেই ৭০০টাকা বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় হয়েছে। অবাধ্যতার শাস্তি চামড়া মোড়ানো বেত্রাঘাত (শ্যামচাঁদ)। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এককালীন ত্রিশ বা ষাট ঘা। কেউ এঁর নাম জানেনা, ইনি চাষী প্রজাদের কাছে ছোট সাহেব রূপে পরিচিত। এক গোয়ালাকে অবাধ্যতার জন্য এঁর আদেশে পঞ্চাশ ঘা বেত খেতে হয়েছিল। তার গায়ে এখনও সে দাগ আছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ও বেত খেয়েছে বেতের, আঘাতের সংখ্যা নামের পাশে দেওয়া হল :—নিবির পাড়ার গোলাব বিশ্বাস (৩০ঘা), চিতরসোলের রামচন্দ্র ব্যানার্জি (৩০ঘা), বেতনার মাধব রাজবংশী (৩০ঘা,) মুচি ফুল বেড়ের ধনী সেখ (৩০ঘা,) ফুল বেড়ের মধুমণ্ডলের ভাই (৩০ঘা), গোবড়াপোতার ক্ষুদিরাম ঘোষ (৫০ ঘা)। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা দোষের একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে নীলকুঠির সুপরিচালনায় এবং লাভের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে এমন একটা ধারণা চাষী প্রজাদের মনে সৃষ্টি করে দেওয়ার কৌশল নিয়েই আমাদের অভিযোগ বা আপত্তি। আলোচ্য এই তরুণ নীলকর সায়েব প্রজাদের মনে এই ধারণা বা ভয়টি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। সায়েবে সায়েবে বন্ধুত্ব বেশ ভাল কথা। জেলার কর্তা সায়েব মফঃস্বল সফরকালে এই বিশেষ নীলকুঠিতে এসে যদি একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট বা এক বোতল বিয়ার খেয়ে যান তাতেও কোন দোষ নেই। তবে কুঠির মালিকের কিছু খরচা হয়ে যায়, সেদিকটা ত ভেবে দেখতে হবে। জরিমানার টাকাগুলি কিছু এই আতিথেয়তায় যায়, বাকী কুঠির সায়েব আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহকারী এবং আমলাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। শুনেছি মিঃ আর কিছু পেয়ে থাকেন। অবশ্য এই 'কিছু'র পরিমাণ শোনা যায় ভালই। এই প্রসঙ্গের জের টেনে হরিশ লেখেন যে এক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেদনাদায়ক পুলিশের আচরণ। নীলকুঠির কোন ঘটনা সম্বন্ধে তারা একেবারে উদাসীন। শোনা যায় শ্রীমানের পুলিশ প্রতিবেশীরাও তাঁর খুব অনুগত।

নীলকুঠির মালিকদের এই ধরনের অত্যাচারের আরও বহু বিবরণ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুপেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল।

বাঙলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত তখনকার দিনের বাঙলায় (Lower

Bengal) জেমস হিলসের মালিকাধীনে নদীয়া জেলায় ১১টি নীলকুঠি ছিল। সব চেয়ে বড় নীল ব্যবসায়ের মালিক ছিল 'বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানী' নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এদের কুঠিগুলি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বারাসতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ছিল। ঢাকা সহ পূর্ব বঙ্গের জেলাগুলির নীল ব্যবসায়ের মালিকের নাম ছিল জে. পি. ওয়াইজ। নদীয়ার উত্তরাঞ্চলে মুর্শিদাবাদ রাজশাহী ও পাবনা জেলায় অবস্থিত ৭টি নীল ব্যবসায়ের মালিকানা ছিল রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর।

এ ছাড়া কিছু নীলকুঠি ব্যক্তিগত মালিকাধীনেও ছিল। এগুলি প্রায় সবই ছিল ইউরোপীয় নীলকরদের সম্পত্তি। দেশীয় জমিদারদের অধীনে নীলকুঠির সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। এক একটি নীল ব্যবসায়ী সংস্থার (concern) অধীনে ৫ থেকে ১০ টি পর্যন্ত নীলকুঠি থাকত। নীল ব্যবসায় বা 'কনসার্ন' এর কুঠি গুলি ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হত। এই ম্যানেজারদের মধ্যে রবার্ট টি লারমুর (Robert T. Larmour) ও জেমস ফোরলঙের James Forlong) নাম উল্লেখযোগ্য।* লারমুর ছিলেন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর অধীনে বহু সংখ্যক কুঠির ম্যানেজার। জেমস ফোরলঙ ছিলেন -জেমস হিলস কোম্পানীর কুঠিগুলির ম্যানেজার। এই দুই ইংরাজ ম্যানেজার ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম দশকের বাঙলার কয়েক লক্ষ কৃষক চাষীর ভাগ্য নিয়ন্তা। এঁদের মধ্যে ফোরলঙ্গ চাষীদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন কিন্তু লারমুর নীল চাষীদের প্রতি কোনরূপ উদারতা বা সহানুভূতি দেখানোর মত মানুষ ছিলেন না। নীল চাষীদের বিদ্রোহের ঘটনাগুলি দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিদ্রোহের সূচনা হয় কলকাতার নিকটবর্তী বারাসতে। এই অঞ্চলের সকল নীলচাষী সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীলচাষ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। বারাসতের হিন্দু-মুসলমানে চাষীরা এর আগেও নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বারাসতের নিকট কালারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আব্দুল লতিফ সাহেবের বিরুদ্ধে ঝিঙ্গরগাছা নীলকুঠির মালিক মিঃ ফার্গুসন বাঙলা সরকারের কাছে এই মর্মে অভিযোগ আনেন যে আব্দুল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসার পর ঝিঙ্গরগাছা সংস্থার অধীনে ৯০ টি গ্রামের চাষীরা নীল চাষ করতে চাইছেনা, তাদের চুক্তিও তারা ভঙ্গ করছে। তাঁর নামে এই অভিযোগ করা হয় যে কোন চাষীর দরখাস্ত পেলেই লতিফ সেটা গ্রাহ্য করে নীলকরকে দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করতে বলেন। নীলচাষীকে নীল চুক্তি ভঙ্গ করতে এই ভাবে পরোক্ষে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন। বিদ্রোহী কোন চাষীর নামে নীলকরের পক্ষ থেকে অভিযোগ এলে তিনি চাষীদের রক্ষা

* Blue Mutiny—Blair B. Kling. (pp 26-27)

করতে পুলিশ পাঠান যাতে নীলকরের লোকজন গ্রামে না ঢুকতে পারে। শুধু তাই ই নয়, নীলকরদের প্রতি তাঁর ব্যবহারও মোটেই সমীহপূর্ণ নয়, তাঁর মুখের কথাই হল—নীলকর সায়েবেরা যে ভীষণ অত্যাচারী একথাও সবারই জানা আছে। নদীয়া বিভাগের কমিশনার কর্তৃক অভিযোগ গুলি অনুসন্ধানের পর লতিফ সাহেবকে (১৮২৮-১৮৯৩) বাঙলার ছোটলাট হ্যালিডে অন্যত্র বদলী করে দেন।*

এই অঞ্চলেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এইচ. ম্যাঙ্গলেস (J. H. Mangles) নীলকর-নীলচাষী বিরোধে নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বন করায় স্বয়ং ছোটলাট হ্যালিডে কর্তৃক তিরস্কৃত হন। তাঁকে বদলীও করা হয়। ম্যাঙ্গেল্‌সের পর এশ্‌লী ইডেন বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন।** ইডেন শুধু দক্ষ প্রশাসকই ছিলেন না, ন্যায় বিচারের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁর পদে যোগদান করার পর থেকেই নীলকরদের বিরাগ ভাজন হন, নীলকরেরা সামান্য খুঁত পেলেই তাঁর উচ্চতম কর্মচারী নদীয়ার বিভাগীয় কমিশনার আর্থার গ্রোটের (Arthur Grote) এর কাছে তাঁর নামে অভিযোগ করত। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি নীলকর ও নীলচাষী বিরোধে চাষীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। গ্রোট্ ইডেনকে এই রায়গুলি উল্টে দিতে বলেন, ইডেন এতে অসম্মত হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন নীলকর তাঁকে অনুরোধ করে যে তিনি যেন বিশেষ কয়েকজন চাষীকে নীলচাষের দাদন (advance) নিতে বাধ্য করেন। তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মত হন, সেই সঙ্গে নীলকরদের সতর্ক করে দেন যে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করাতে হলে তাদের তাঁরা যেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করান। তাঁর এই পরামর্শ উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে ইডেন একটা আদেশ জারী করেন (একে রোব্‌কারি বলা হত) যে, কোন চাষীকে নীলচাষে বাধ্য করা চলবে না। হাবড়া নীলকুঠির একটি অভিযোগকে ভিত্তি করে এই 'রোবকারি' জারি হয়। এই রোবকারি জারির কথা ছড়িয়ে পড়লে বারাসত নীল ব্যবসার (কনসার্ন আশেপাশের গ্রামবাসীরা ইডেনের কাছে এই আবেদন জানায় যে তাদের যেন জুলুমবাজি করে নীল চাষে বাধ্য না করা হয়। এই দরখাস্ত পেয়ে ইডেন তাঁর অধীনে মিতারহাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে একটি

* ইনি পরবর্তী কালে বহু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি নেতৃস্থানীয়-রূপে পরিগণিত হতেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ এঁর মৃত্যু হয়।

** Ashley Eden, Sir. K. C. S. I. (1831-1887)

ইনি ছিলেন ভারতের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র। পরে ইনি সার এশলি ইডেন রূপে বাঙলার লেফটেন্যাণ্ট্ গভর্ণর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৭৭-১৮৮২)

নির্দেশ দেন যেন তিনি গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ পাঠিয়ে দেন। রায়তের নিজস্ব জমিতে সে যা খুসি শস্য বুনবে, অনিচ্ছুক চাষীকে পুলিশ যেন নীলকরদের লোকজনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে। এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অতঃপর পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে নীলকরদের উৎপাত থেকে চাষীদের রক্ষা করেন। একমাস পর এই এলাকার বিখ্যাত নীলকর লারমুর ইডেনের সঙ্গে দেখা করে ইডেনকে তাঁর এই আদেশ প্রত্যাহার করতে সকাতর অনুরোধ জানিয়ে ছিল। ইডেন তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে নীলচাষ করা বা না করা সম্পূর্ণ ভাবে চাষীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন চাষী যদি দাদন নিয়ে চাষ না করে তবে নীলকরদের উচিত দেওয়ানী আদালতে চাষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত লারমুর নদীয়া বিভাগের কমিশনার গ্রোটের কাছে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে ইডেন চাষীদের নীল চাষ না করতে উস্কানি দিচ্ছেন। গ্রোট্ ইডেনকে তাঁর আচরণের জন্য ভৎর্সনা করে লেখেন যে চাষীদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ না পাঠিয়ে তাঁর পক্ষে উচিত ছিল চাষীরা যাতে অবাধ্যতা না করে তার জন্যই পুলিশকে নিয়োগ করা। গ্রোট ইডেনকে আরও জানান যে তাঁর মনোভাব জেনে তাঁর অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রট্‌দেরও ধারণা হয়েছে যে গভর্ণমেন্ট নীল চাষ বিরোধী। তারাও চাষীদের এই ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। এর উত্তরে ইডেন গ্রোট্‌কে লেখেন যে নীলকরের লোকেরা যাতে গ্রামে ঢুকে চাষীদের উপর চোখ রাঙাতে পারে বা তাদের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করতে পারে—এই ব্যাপারে পুলিশ তাদের সাহায্য করতে পারে না। জমির মালিক চাষী, তার জমিতে বা গ্রামে নীলকর বা তার লোকজনের যাবার অধিকার নেই। চুক্তি-বদ্ধ চাষী নীল বুনে কুঠিতে পৌঁছে দেবে—এটা সে করতে বাধ্য কিন্তু চাষীর গ্রামে বা তার জমিতে গিয়ে খবরদারি করার অধিকার নীলকর বা তার ভৃত্যদের নেই।

গ্রোট ইডেনের লেখা ও তাঁর নিজের লেখা সব চিঠি পত্র লেঃ গভর্ণর গ্রাণ্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। এক্ষেত্রে গ্রাণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ইডেনের মতগুলি যুক্তি সম্মত ও সমর্থন যোগ্য। চাষীর জমিতে নীলকরের অনধিকার প্রবেশ রোধ দারোগার অবশ্য কর্তব্য। নীলকরের যদি চাষীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তবে তার পক্ষে উচিত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ("Indigo can not be supported at the expense of Justice".)*

ইডেন গ্রাণ্টের এই অভিমতের অনুলিপি তাঁর অধীন তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে পাঠিয়ে দেন। এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের একজন ছিলেন হেমচন্দ্র কর। ইনি আবার এটি তাঁর অধীন প্রতিটি থানার দারোগাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী কালে নীল কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়

* Judicial Proceedings, Govt. of Bengal, July 21. 1859.

যে যশোহর ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের প্রজারাও ইডেনের এই পরোয়ানার নকল জোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর চাষীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে নীল চাষ স্বেচ্ছাধীন এবং অতঃপর নীল চাষের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট নীলকরদের পক্ষ সমর্থন করতে অনিচ্ছুক। এর কিছুদিন পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গ্রাণ্ট জলপথে কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর হয়ে পূর্ববঙ্গ সফর করেন। কৃষ্ণনগর থেকে একদল চাষী জলপথে তাঁকে বহরমপুর পর্যন্ত অনুসরণ করে। বহরমপুরে এরা তাঁর হাতে পাঁচটি দরখাস্ত দেয়। এই দরখাস্তগুলি ছিল অভিযোগ পত্র। এতে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই সব দরখাস্তগুলির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল চাষী ও ছোটখাট তালুকের মালিক। গ্রাণ্ট হাওদিয়া, মেহেরপুর ও হাঁসখালি থানার মানুষদের অভিযোগগুলি নদীয়া বিভাগের কমিশনারের উপর তদন্তের ভার দেন। কমিশনারের রিপোর্ট পেয়ে গ্রাণ্ট বুঝতে পারেন যে ম্যাজিস্ট্রেটরা নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তাঁদের লুণ্ঠন, বলপূর্বক ধরে এনে চাষীদের নীলকুঠির গারদে আটকে রাখা প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় অথবা ধামা চাপা দিতে চায়। গ্রাণ্ট মাত্র কিছু দিন আগে মে মাসে লেঃ গভর্ণর পদে নিযুক্ত হয়ে তিন চার মাসের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে শাসন ব্যবস্থায় কত গলদ আছে। গ্রাণ্ট নীল চাষের গুরুত্ব বুঝতেন, নীলচাষের ক্ষতি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু চাষীর উপর অত্যাচার চালিয়ে নীল ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন তিনি মোটেই সমর্থন করতে পারেননি।

ইডেনের পরোয়ানার খবর ক্রমশঃ নদীয়া জেলার সীমা ছাড়িয়ে বহরমপুর পৌছায়। সেখান থেকে সন্নিহিত পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতেও এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে নীলচাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নীলকর সমাজ এই সময় ক্ষিপ্ত হয়ে নীলচাষীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নীলচাষী ও নীলকরদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠে। হিন্দু-পেট্রিয়টের মফঃস্বলের সংবাদদাতাদের দ্বারা প্রেরিত এই সব কাহিনী পেট্রিয়টে নিয়মিত প্রকাশিত হত। এই সব অত্যাচার কাহিনীকে কেন্দ্র করে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে বহু সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশ করতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর বিশেষ ভাবে রাজসাহী জেলার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে "বাঙলা দেশে জুয়াচুরি ও নিপীড়ন ব্যবস্থার সঙ্গে নীল ব্যবসায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নীলচাষের মালিক নীলকরদের তাণ্ডবলীলা রাজশাহী জেলায় চরম অবস্থায় পৌছেছে। নীলকরদের অর্থ, লোকবল, সরকারের উপর প্রভাব এবং তাদের অপরিসীম নৃশংসতা ও ঔদ্ধত্যই এর জন্য

দায়ী। নীলচাষ প্রবর্তিত হওয়ার আগে এখানকার চাষীরা জমিতে সোনার ফসল ফলিয়ে পরম-সুখে কালাতিপাত করত, কোন অভাব অভিযোগ থাকলে এই অঞ্চলের দরদী জমিদারগণ তা দূর করতেন। নীল চাষ প্রবর্তনের পর থেকেই খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয়। ছলে বলে কৌশলে নীলকরেরা জমিদারদের জমিদারির অংশ বিক্রি করতে অথবা পত্তনি দিতে বাধ্য করে। যার ফলে এই জেলার বৃহত্তর ভূখণ্ড জমিদারদের হস্তচ্যুত হয়ে নীলকরদের হাতে চলে যায়। বর্তমানে নীলকরদের হাতে এই জেলার যে অংশ রয়েছে তা ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার অঞ্চল থেকেও বিস্তৃত। নীলকরদের একটি জুলুমের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার চাল্লায় নীল ব্যবসায়ের একটি আস্তানা আছে। এই সংস্থার কোবার্ণ নামে এক শ্বেতাঙ্গ চালাকি করে গাবগাজি গ্রামের কিছু অংশ কিনে নিয়েছে। কোবার্ণ গ্রামের কয়েকজন চাষীকে তাদের লাঙ্গল দিয়ে তার জমি চাষ করে দিতে হুকুম দেয়। এই চাষীদের নিজস্ব জমি চাষের জন্য গরু ও লাঙ্গল আছে। চাষীরা সহজে তার কথা শুনবে না, একথা বুঝতে পেরে একদিন প্রাতঃকালে একশতের অধিক লাঠিয়াল ও বল্লমধারী নিয়ে সে গ্রামে ঢুকেছিল। গ্রামে ঢুকে সে দেখে যে চাষীরা নিজের নিজের জমি চাষ করছে, তার জমি চষছে না। নিজের নিজের জমির চাষ ফেলে তার জমিতে চাষ করতে চাষীরা যখন অস্বীকার করে তখন কোবার্ণ তার লোকজনদের চাষীদের উপর হামলা চালানোর আদেশ দিয়ে নিজে ঘোড়ায় চড়ে কুঠিতে ফিরে যায়। কোবার্ণের লোকজনদের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষে একজন চাষী মারা যায় ও দুজন চাষী গুরুতর রূপে আহত হয়। এর পর কোবার্ণের লোকজন গ্রামের কয়েকটি বাড়ি লুঠ-পাট করে। ফেরার পথে তারা শতাধিক গবাদি পশুও নিয়ে পালিয়ে যায়। ইতিপূর্বেই শান্তিভঙ্গের আশংকা জানিয়ে কোবার্ণ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুজন পুলিশ সেপাই এনে তাদের নিজের কুঠি রক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিল। গ্রামের মাঠে গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের কোন চেষ্টা পুলিশেরা করেনি। দাঙ্গায় মৃত চাষীর মৃতদেহটি গ্রামবাসীরা সিরাজগঞ্জে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানাতে চেয়েছিল। মৃতদেহটি নীলকুঠির পাশ দিয়ে সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের দুজন সেপাই মৃতদেহটি ছিনিয়ে নিয়ে কোবার্ণের জিম্মা করে দেয়।

চাষীদের অভিযোগ তদন্তের পর একটি মামলা উপস্থিত হয়। নরহত্যার জন্য সড়কিধারী এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আর দুজনকে চোদ্দ বছর করে কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। দায়রা জজ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এই দণ্ডাদেশ সমর্থন করেন কিন্তু তিনি কোবার্ণকেও অভিযুক্ত করার পরামর্শ দেন, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ এই মামলায় কোবার্ণকে জড়াতে দেননি। জেলা সদরের জজ দায়রা জজের অভিমত অগ্রাহ্য করে কোবার্ণকে অব্যাহতি দেন।

এমন ঘটনা এই জেলায় হামেশাই হয়ে থাকে। কয়েকবছর আগে নীলকরদের নেতৃত্বে সংঘটিত একটি হাঙ্গামায় বহু চাষীর প্রাণ গিয়েছিল, চাষীদের গ্রামটিও লুণ্ঠিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে কয়েকজন লাঠিয়ালের সাজা হয়েছিল কিন্তু যে নীলকরের উদ্যোগে এই দাঙ্গা ঘটেছিল, তাকে এই মামলায় জড়ান হয়নি। কারণ জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষীয়গণ মফঃস্বল ভ্রমণ কালে প্রায়ই নীলকুঠির আতিথ্য গ্রহণ করেন। আদালতের আমলারাও নীলকরদের বদান্যতার আস্বাদ পেয়ে থাকেন"।

পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নীলকরের কোন ক্ষতিই হয় না, দাঙ্গায় পরাস্ত চাষী ভয় পেয়ে নীলকরের খুশীমত শ্রমদান করতে বাধ্য হয়। নীলকুঠিরও সমৃদ্ধি বেড়ে যায়। ফৌজদারী মামলায় নীলকরের সামান্য খরচ হয় বটে তবে তার লাভের পাল্লাই ভারী থাকে। যে হতভাগ্য ভাড়াটে লাঠিয়াল ও সড়কিওলার সাজা হয় তারা ফাঁসি কাঠে ঝোলে নয়ত জেলেই জীবন কাটিয়ে দেয়। এই হতভাগ্যরাও এটাই তাদের নিয়তি বলে মেনে নেয়। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদার ঘটনা যদি কোথাও ঘটে থাকে তবে সেগুলির উৎস নীলকরদের এই উৎপাত ["If ever outraged justice cried aloud for the protection of the law it is in the case of these planting outrages"—Indigo Planting in Rajshaye, H.P. 19. 11. 59.]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সমগ্র বাঙলায় নীলবিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লেঃ গভর্ণর পিটার গ্রাণ্ট্ নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করে নীলচাষীদের সহযোগিতায় নীল চাষ অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন, চাষীদের উপর অত্যাচার রোধের জন্য মফঃস্বলের ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর যে নির্দেশ ছিল অধিকাংশ ম্যাজিস্ট্রেট্ সেই আদেশ লঙ্ঘন করে প্রজাদের দাঙ্গা হাঙ্গামা করা অথবা নীলচুক্তি ভঙ্গ করার অভিযোগে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করত। পিটার গ্রাণ্ট্ চেয়েছিলেন যে সরকারী কর্মচারীগণ নিরপেক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সুবিচার করবে। তাঁর এই আশা ব্যর্থ হয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে লেঃ গভর্ণর রাজশাহী বিভাগের কমিশনার ও মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট্কে ভর্ৎসনা করেছিলেন। যশোরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ স্কিনারকেও তিনি অন্যায়ভাবে নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর জন্য তিরস্কার করেন। গ্রাণ্ট্ কোন প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, ন্যায় বিচার তাঁর অভীষ্ট ছিল। কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে মফঃস্বলের শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীগণ নীলকরদের সঙ্গে যে স্বজাতি-প্রীতি ও নেটিভ বিদ্বেষের ঐক্যবন্ধনে বাঁধা ছিল, গ্রাণ্টের পক্ষে সেই বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। দু একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেট্ মাত্র ন্যায়-পরায়ণতা দেখাতে পেরেছিলেন। নীলকরদের সঙ্গে অসম-সংঘর্ষে বহু চাষীর কারাদণ্ড হয়, বহু চাষীর প্রাণ যায়, নীল চাষী অধ্যুষিত বহু গ্রাম শ্মশানে

পরিণত হয়, তথাপি অনিচ্ছুক চাষীদের দিয়ে নীলকরেরা নীলচাষ করাতে পারে নি। নীলকরদের লাঠিয়ালেরা চাষীদের শায়েস্তা করতে এলে কৃষকেরাও অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করত। বহু ক্ষেত্রে কৃষকদের তীর ধনুক অথবা শুধু মাত্র ইঁট পাটকেল নিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়তে হত। বহু ক্ষেত্রেই নীলকরদের লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চাষীদের ভয়ে স্থান ত্যাগ করে পালাতে হত। নীলচাষীদের যে সংঘর্ষ শরৎকালে শুরু হয়েছিল, দু তিন মাস পর তা কিছু স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে নীলকরদের অবিমৃষ্যকারিতার কারণে আবার এই বিদ্রোহের পুনরাবির্ভাব হয়। এই সময়ে হরিশচন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে বাঙলায় অরাজকতা (Anarchy in Bengal) নামে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এমনি একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে "বাঙলার কয়েকটি জেলায় এখন অরাজকতা বিরাজমান। মুষ্টিমেয় মানুষ যখন শুধু মাত্র অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের সুবিচার প্রাপ্তিতেও বাধা দেয় সে অবস্থাকেই অরাজকতা বলা হয়ে থাকে। আদালত, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী এসব বাহ্যিক আড়ম্বরের কোন ত্রুটি দেশে নেই। কিন্তু এমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে অত্যাচারীর বিনা সম্মতিতে অত্যাচারিতের আইনের সাহায্য পাওয়ার কোন উপায় নেই। সেখানে লাঠি-বাজিই শেষ কথা, আইন কানুন অস্তিত্বহীন, তাকেও অরাজকতাই বলা চলে। আমাদের প্রশ্ন কেন এই অবস্থা ? বাঙলার যে জেলাগুলিতে অরাজকতা চলছে, সেগুলি এশিয়ার সব চেয়ে প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টের শাসন কেন্দ্রের (অর্থাৎ কলকাতার) চোখের সামনেই রয়েছে। এই গভর্ণমেণ্ট যে দেশ শাসন করে (অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) সেই দেশের মানুষের সমাজ এতই সুশৃঙ্খল যে গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের চলে। এই দেশের আইন কানুন সুবিন্যস্ত, নূতন করে আইন প্রণয়ন স্বাভাবিক অবস্থায় একরকম অপ্রয়োজনীয়। ফসল হোক না হোক এ দেশের মানুষ ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সরকারকে খাজনা দিয়ে তার ধনভাণ্ডার পুষ্ট করে। এদেশের মানুষ শুধু আইনই মেনে চলে না, তারা ধর্মও মেনে চলে, নীতিভ্রষ্ট হওয়া বাঙালীর স্বভাব নয়। তবুও কেন এই অরাজকতার তাণ্ডবলীলা ? এর কারণ এই যে এদেশের পুলিশ ও ফৌজদারি বিচার বিভাগ একেবারে অকর্মণ্য। যে কোন শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটলেই দেখা যায় যে ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের তার মোকাবিলা করার সামর্থ নেই। গুরুতর ধরনের কিছু একটা ঘটলেই অবস্থা আয়ত্তে আনতে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের সংখ্যা কম, তাদের যোগ্যতা আরও কম। এই ম্যাজিস্ট্রেট্‌রা যা করতে চায় তা কার্যকর করার মত উদ্যম ও শক্তি তাদের নেই। এদের একমাত্র অভীষ্ট যে কমিশনার যেন তাদের পূর্বতনদের চেয়ে যে

তারা কম যোগ্যতাসম্পন্ন এই অভিমত গভর্ণরকে না জানান। অর্থাৎ পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ কর্মই তার আদর্শ। জেলায় শান্তিরক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করার দিকেই এই সব শাসকদের ঝোঁক বেশী, কারণ এতে পরিশ্রমও কম, মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও কম। মানুষের অহিতকারী শক্তিগুলির সম্মুখীন হয়ে এদের সংযত করার মত সাহস এদের নেই। দুষ্ট-জনের দমন করতে এরা ভয় পায়। কালা আদমিদের দুঃখ কষ্ট এই শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গবদের মনকে কখনই বিচলিত করতে পারে না। কালামানুষদের দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়ন এদের মনে কোন রেখাপাত করে না। চাষীদের প্রতি সহানুভূতির যে অভাব এদের মধ্যে আছে সেটা বিচারক-সুলভ নিরপেক্ষতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর একটি জেলার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। তবে তারও উপরওলা আছে,—বিভাগীয় কমিশনার। এঁর কর্তব্য হল ম্যাজিস্ট্রেটেরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা তা দেখা। এই কর্তব্য কমিশনার ক্বচিৎ পালন করে থাকেন। কমিশনারের পরের ধাপের কর্তা বঙ্গ-সরকার। কয়েক-বছর আগে এই সরকারের কর্তা বার ঘণ্টা তাঁর অন্য রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, গ্রামাঞ্চলের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তাঁর একজন সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁরও কিছু করার ক্ষমতা ছিল না (এটা ছিল লর্ড ডালহৌসির আমল)। এর পর বাঙলার জন্য পৃথক ভাবে এক লেঃ গভর্ণর পদের সৃষ্টি হ'ল। লোকের মনে আশা দেখা দিয়েছিল, যে এবার কিছু কাজ হবে। যিনি এই পদে নিযুক্ত হলেন (মিঃ হ্যালিডে) তাঁর, প্রভূত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথমেই জানিয়ে দিলেন যে তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে সর্বত্র প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। তাঁর এই অভিমত থেকে মনে হয়েছিল যে জমিদার বা নীলকর যে দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচার চালায় এটা যখন তিনি জেনেছেন তখন তিনি এর প্রতিকার করার ভারও নেবেন। কিন্তু হায়, মানুষের এই আশা হতাশায় পরিণত হল। দেখা গেল প্রবল প্রবলই থেকে গেল, তাকে প্রতিরোধের ইচ্ছা বা সামর্থ্য গভর্ণমেণ্টের নেই। প্রবলের অত্যাচার সর্বত্রই অবাধ ভাবে চলতে থাকল। ("The strong everywhere continued to oppress the weak") এই লেঃ গভর্ণর (হ্যালিডে) বড়ই স্বজাতি প্রেমিক ছিলেন, এক শ্রেণীর প্রবল (strong) মানুষদের ইনি বড়ই পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। কয়লা ও নীল উৎপাদনকারী ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। কয়লা ও নীল উৎপাদনের পথের সব কিছু বাধা দূর করতে তিনি সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এঁর কার্যভার ত্যাগ করার পর যিনি এলেন তাঁর কার্যকাল বেশী দিনের নয়, তবে এঁকে লোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল, সেটা প্রবল প্রতাপান্বিত মিঃ হ্যালিডের উত্তরাধিকারী বলে নয়। এঁর নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা সুবিদিত। আইন ও ন্যায়বিচার এঁর

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলেই লোকে এঁকে শ্রদ্ধা করে। ইনি ইতিমধ্যেই বাঙলা মুলুকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন, তবে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ রয়েছে যে, দেশে যে অরাজকতা ও অত্যাচারের রাজত্ব চলেছে সেটা তিনি সংযত করতে পারবেন কিনা। অত্যাচারী ও অসাধু জেলা শাসকেরা তাঁর নির্দেশ পালন যে করছে না বা করবে না তা ধরে নেওয়া যায়। অত্যাচার দমনের মানসিকতাই এদের নেই। এদের ন্যায়বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এটা তাদের কাছে নূতন কথা। ন্যায় বিচার আবার কি? এই তাদের মনোভাব। তাদের উপর এই যে ন্যায়বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে—এটা তাদের পক্ষে দুরূহ। এরা ভাবছে যে প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করতে গেলে ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হবে, গভর্ণমেণ্টের আয় কমে যাবে। যদি এদের ভোট নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে এদের মতে ছোটলাট সাহেব (মিঃ গ্রাণ্ট্) একটা 'দায়' বা আপদ। [" .. They object to the novelty and the troublesomeness of the task sought to be imposed upon them. Some of quicker instincts see political danger in the suppression of anarchy in the land. Others believe that the development of resources will cease. All will note Mr. Grant a bore...."]

এর পর হরিশ্চন্দ্র লিখলেন—এখন অবস্থা গুরুতর। চাষীরা জেনে গিয়েছে যে হ্যালিডে আর তাদের শাসনকর্তা নয়। ন্যায়বিচার চাইলে এটা এখন পাওয়া যায় এটা এখন প্রজারা বিশ্বাস করেছে। নীল চাষীরা এই বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে যে নীল চাষ বাধ্যতামূলক নয়, এইজন্য এখন তারা নীল বুনতে রাজী নয়। শেষে যদি এদের নীল চাষে বাধ্য করা হয়, তবে সংঘর্ষ অনিবার্য। চাষীদের উপর অত্যাচার যদি চলে তবে গ্রাণ্টের গভর্ণমেণ্টের প্রতিও মানুষ বিশ্বাস হারাবে। অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকবে। শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ অবস্থা যাতে শান্ত থাকে তার উপায় অবলম্বন করুন। ["A spirit such as we never in our weakest moments anticipated has made its appearance in the indigo growing districts. The poor fellows may succumb. But between the date and this there will occur a series of social collisions which will simply disgrace established authority. We supplicate our rulers to ward off these occurences"—Anarchy in Bengal, H. P. 4. 2. 1860.]

বাংলায় অরাজকতা (Ararchy in Bengal) শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে বর্তমান মুহূর্তে শত শত লাঠিয়াল ও সড়কিধারী পাথরঘাটা, গোবিন্দপুর, মালিয়াপোতা [এই গ্রামগুলি তৎকালে নদীয়া জেলায়

অবস্থিত ছিল। এই গ্রামগুলি বাঁশবেড়িয়া নীল সংস্থার (concern) এলাকা ভুক্ত ছিল। উইলিয়াম হোয়াইট্ নামে কুখ্যাত নীলকর এর মালিক ছিল।] প্রভৃতি গ্রামগুলিতে হামলা ও লুঠতরাজের জন্য ওঁৎ পেতে আছে, কারণ এই গ্রামবাসীরা নীলের দাদন নিতে বা নীলকরেরর সঙ্গে কোন চুক্তি করতে অস্বীকার করছে, দাদন নিলে ও চুক্তি সই করলে, নীলকরেরা তাদের অভিযুক্ত করবে এই ভয়ে তারা এই উপায় নিয়েছে। বহু গ্রামবাসী ম্যাজিস্ট্রেটের এবং বিভাগীয় কমিশনারের কাছে বার বার আবেদন করেছে যে নীলকরেরা অত্যাচার চালিয়ে তাদের যেন দাদন নিতে বা চুক্তি করতে বাধ্য না করে। এমন কি তারা ছোটলাটের কাছেও আবেদন করেছে। কিন্তু তাদের এই আবেদনে কর্ণপাত করা হয় নি। তাদের অত্যাচারের মুখে ফেলে রাখা হয়েছে। শোনা যায় সরকারী কর্তৃপক্ষ এই আইন করতে যাচ্ছেন যাতে চাষীরা নীল চাষে বাধ্য হয়, তাদের নিরস্ত্র করবার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের করণীয় আর কিছু কি নেই? ["Has the govt. nothing to propose in order to put down this state of things, but affray bills and disarming acts,"—Anarchy in Bengal, HP 11. 2. 60.]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে যশোরের কাঠগোড়া নীল সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে সর্ব প্রথম নীল বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, মহেশ চট্টোপাধ্যায়, মোরাদ বিশ্বাস, সুহাস বিশ্বাস, লাল চাঁদ সাহা, সাধুহাটির মথুরা আচার্য, রতন মণ্ডল, চৌগাছার দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, নদীয়ার রামমোহন, রামরত্ন ও গিরিশ মল্লিক, পলুয়া মাগুরার শিশির কুমার ঘোষ, বাঁশবেড়িয়ার বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নীল বিদ্রোহের নেতা হিসাবে আরও বহু ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে নীল কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্টেট. মিঃ হার্শেলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি এমন কোন মাতব্বর চাষীকে জানেন কিনা যিনি স্বয়ং বহু চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ সংগঠন করতে পারেন এবং এই বিদ্রোহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারেন। হার্শেল উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এমনি কয়েকশত নেতার নাম করতে পারেন। [He could point out hundreds such]* বন্ভাইটিস প্রমুখ কিছু খ্রীষ্টান মিশনারী ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক (বিশেষতঃ উকিল মোক্তার) এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও এর সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছিলেন।

হিন্দু-পেট্রিয়ট্ পত্রটি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই হরিশ্চন্দ্র নীলচাষীদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তা জানতে পেরেছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি

* Indigo Commisson Report, no : 2852 (W. J. Herscel)

নীলচাষীদের দুঃখ দুর্দশার বিবরণ তুলে ধরতে আরম্ভ করেন এ কথা বলা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহু নীলকর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্ পদ পেয়ে এই পদের সুযোগ নিয়ে তাদের নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দুর্যোগ কালে হরিশ্চন্দ্র তাঁর কাগজটিকে নীলচাষীদের মুখপত্রে পরিণত করেন। নীলচাষ এলাকায় তিনি বহু সংবাদ-দাতা নিয়োগ করেন, কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ও শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীও স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে নীলচাষীদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। এই সময়ে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-পেট্রিয়ট্ ও তার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্র কি এবং তার সম্পাদকের কর্তব্য কি এ সম্বন্ধে বহু দরিদ্র নিরক্ষর চাষীর মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁরা এটুকু জেনেছিলেন যে কলকাতা ভবানীপুরে হরিশ বাবু নামে একজন ভদ্রলোক থাকেন। তিনি দরিদ্র নীল-চাষীদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে খুব লড়াই করে যাচ্ছেন। ইনি খুব ভাল আইন জানেন, ভাল দরখাস্ত মুসাবিদা করেন, অনেক সময় সায়েবেরাও তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হন। তারা আরও জেনেছিল যে হরিশবাবু খুব দয়ালু লোক, মানুষ বিপদে পড়ে তাঁর আশ্রয় নিলে তিনি তাঁকে রক্ষা করেন। মফঃস্বলের বহু নিরক্ষর চাষীর কাছে আবার হরিশ্চন্দ্র ভবানীপুরের উকিলবাবু রূপে পরিচিত ছিলেন। নীলকর দ্বারা উত্যক্ত বা নিপীড়িত চাষীদের অনেক সময় স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা হরিশ্চন্দ্রের কাছে গিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিতেন। এর ফলে নীল বিদ্রোহের সূচনা কাল থেকে হরিশ্চন্দ্রের অকাল মৃত্যু কাল অর্থাৎ দুই বৎসর কাল যাবৎ মফঃস্বলের বহু নিপীড়িত নীল-চাষী কলকাতার ভবানীপুর পল্লীতে হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে এসে ধর্ণা দিত। অপরিচিত কলকাতা শহরে এদের আহার ও বাসস্থানের কোন সংস্থান না থাকায় এরা হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতেই আহার ও আশ্রয় পেত। হরিশের মাতাকে হোটেলের পাচিকার মত প্রত্যহ বহু মানুষকে বেঁধে বেড়ে খাওয়াতে হত, হরিশের বহু কষ্টার্জিত অর্থের একটা মোটা অংশ এই প্রজাদের আহার ও আশ্রয় দিতে খরচ হয়ে যেত। সৌভাগ্য-ক্রমে ঠিক এই সময়ে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট্' কাগজের জন্য হরিশ্চন্দ্রকে মাসে একশ দেড়শ টাকা লোকসান দিতে হত না, কাগজটি এই সময়ে স্বনির্ভর হয়ে কিছু লাভের মুখও দেখেছিল। যাই হোক, হরিশ্চন্দ্রকে এই চাষীদের আহার ও আশ্রয় দিতে প্রচুর স্বার্থত্যাগ করতে হত। এর ফলে তাঁর অকালমৃত্যুর পর দেখা যায় যে হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রেসও একটি বসত বাটি ছাড়া তিনি একটি কপর্দকও সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। হরিশ্চন্দ্র মফঃস্বল থেকে আগত প্রতিটি চাষীর ব্যক্তিগত সমস্যাটি শুনে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। অনেক সময়ে

নিজেই তার দরখাস্ত লিখে দিতেন, সেখানে আদালতের আশ্রয় দরকার সেখানে স্থানীয় কোন পরিচিত মোক্তারকে চিঠি লিখে দিতেন যেন চাষীর পক্ষে তিনি মামলাটি হাতে নেন। পরিচিত কোন মোক্তার না থাকলে চাষীর কাছে তার এলাকার কোন মোক্তারের নাম জেনে তাঁর নামে চিঠি লিখে দিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে হরিশের অপরিচিত এই মোক্তার হরিশের এই চিঠি পেয়ে মামলা হাতে নিতেন। দেশমান্য হরিশের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হরিশ এই মোক্তারকে হিন্দু-পেট্রিয়টের সংবাদ দাতা নিযুক্ত করে তাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু অর্থ পাঠাতেন। কারণ তিনি জানতেন যে দরিদ্র চাষীর ঐ মোক্তারকে 'ফি' দেবার সাধ্য নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নীলকর ও হাকিমের যোগসাজসে নীল-বিদ্রোহের সময় চাষীর পক্ষ সমর্থনকারী কয়েকজন মোক্তারকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এই জন্য অনেক সময় চাষীদের পক্ষে নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য মোক্তার পাওয়াও কঠিন হত।

নীল বিদ্রোহের মোটামুটি চারটি স্তর ছিল। প্রথমটি শাসক গোষ্ঠীর নিকট আবেদন নিবেদন, দ্বিতীয়টি নীল চাষে অসম্মতি জ্ঞাপন বা ধর্মঘট, তৃতীয় —নীলকরদের প্রেরিত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালাদের সঙ্গে সংগ্রাম। শেষ স্তরটি ছিল মরিয়া হয়ে নীল কুঠি আক্রমণ। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ২৪-পরগণা, পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। নীল বিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনির সময়ে ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হইয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর অত্যাচার নিবারণ হরিশের অক্ষয় কীর্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মন অর্থ সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিয়াছিলেন।" পরিশ্রম ও উদ্বেগে হরিশের অকাল মৃত্যুর প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখেছেন 'মানুষের দেহে আর কত সয়। সে সময়ে যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে 'পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদকতা কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত। তদুপরি দিবা রাত্রি নীলকর পীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেকদিন আপিস হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আর আপিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। আপিসের

কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া যাইতেন। তাঁহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিক টিক করিতেন। বলিতেন, 'মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না।' 'ওরে মারা পড়বি।' 'ওরে কলম রাখ।' তদুত্তরে তিনি বলিতেন 'মা, তোমার সব কথা আমি শুনবো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি, তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো একাজ না করে আমি ঘুমাতে পারব না।' কিন্তু এই অতিরিক্ত শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেট্রিয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত তাহা দুই দিনে সারিতে হইত। সুতরাং সে দুদিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের তদানীন্তন প্রথানুসারে সুরা বিষ পান করিয়া আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেন।"* নীলকর সমাজের কুকীর্তিগুলি দিনের পর দিন 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হতে থাকায় হরিশ্চন্দ্রের প্রতি এরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সমালোচনা এরা বিশেষ গ্রাহ্য করত না, কিন্তু ইংরাজী সংবাদপত্র শিক্ষিত ইংরাজেরা বিশেষতঃ শাসক কর্তৃপক্ষ যত্ন করে পড়ত। হিন্দু-পেট্রিয়টের পাঠক নীলকরদের স্বদেশ ইংলণ্ডেও ছিল। নীলকরদের স্বদেশস্থিত আত্মীয় স্বজন ভারতে তাদেরই আত্মীয়দের এই পাশবিক ব্যবহারের কাহিনীগুলি পড়ে লজ্জিত হত। উদার নীতি সম্পন্ন ইংরাজদের মধ্যেও নীলকর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডেও জনমতের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে হরিশ্চন্দ্র 'কৃষ্ণনগর ক্লাব' থেকে একজন নীলকর কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি পান। এই চিঠিটি তিনি 'Americanism in Nuddea' শিরোনাম দিয়ে হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশ করে দেন। আমেরিকার দাস প্রভুরা ক্রীতদাসদের প্রতি যে মনোভাব দেখাত 'Americanism' বলতে হরিশ্চন্দ্র তাই বোঝাতে চেয়েছেন। চিঠির মর্ম এইরূপ ছিল "ওরে নিগার (কালা আদমি), তোর আস্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাই তুই ভদ্রলোকদের নামে কলঙ্ক রটিয়ে যাচ্ছিস। তুই যে বিজেতা জাতির এক ক্রীতদাস সে কথা মনে রাখছিস না কেন? পলাশীর যুদ্ধে কি তোদের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যায়নি? তোরা ত কষ্টই পাবি। তোর ওই নোংরা কাগজের খুব কাটতি তাই তোর অহংকার বেড়ে গিয়েছে। তোরই মত মিথ্যাবাদীর দল তোর খুব তারিফ করে, তাই তোর সাহস বেড়ে যাচ্ছে, তাই তুই আমাদের সম্ভ্রান্ত নীলকর সমাজের চরিত্র হননের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিস। এই চাটুকারিতায় কোন কাজ হবে না। দুরাত্মা মোসাহেব, তুই আমাদের

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গ সমাজ-শিবনাথ শাস্ত্রী (পৃঃ ১৯৯-২০১), নিউ এজ সং, কলিকাতা-১৩৬২।

নীলকর সমাজের কত ক্ষমতা তা এখনও বুঝতে পারিসনি ? নিগার, সাবধানে কাজ করবি। তোর কলম সংযত কর, নইলে মরবি। তোর স্বভাব এখন বেশ ঘৃণাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিগার, তোর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। তোর যা পাওনা সেটা এখনই মিটিয়ে নিস না। পুনশ্চ : যদি তোকে আমাদের শহরে বা মফঃস্বলে দেখতে পাই, তবে আমার ইচ্ছা এই যে আমার চাবুক দিয়ে তোর শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দেব।"

["Well Nigger, I see thou art getting bolder day by day, to seriously slander gentlemen. Forgetest thou your position as a slave of the conquerer ? Knowest not that from the day of Plassey thou art doomed to suffer ? Being proud of the large circulation of thy mean journal, and of the totally undeserved praise thou elcitest from all your brother liars thou hast taken in your head to vilify the character of our noble body....Never think that thine flattey will do them any good. Vile sycophant, knowest thou not thou the authority of our august body ? Nigger, take care how you actest ? If thou will not stop your pen, thou shall suffer. Thy character of late has become most detestable. Nigger, reflect on your position, Don't desire what you deserve.

P. S. If I happen to meet any day either in town or in the muffosil, I am resolved to make you suffer a few good cuts of my horse whip'—A Nuddea Planter, Krishna Nagar Club, Nuddea H.P. 25. 2. 60]

হরিশ্চন্দ্র এই পত্রটি পাওয়ার আগে হিন্দু-পেট্রিয়টে যশোর জেলার লোকনাথপুর নীল সংস্থার ম্যানেজার জর্জ মিয়ার্সের নানা কুকীর্তির বিবরণ প্রকাশ করে দেন। মিয়ার্স ম্যানেজার হিসেবে সিন্দুরি, গোলদার, কালীশপুর ও হিজুলি নীলকুঠিও পরিচালন করতেন। মিয়ার্স অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রজাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া, মারপিঠ করা এবং বলপূর্বক বিদ্রোহী প্রজাকে অপহরণ করে তাকে কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রাখা এঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ছিল। যশোরের দুজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মলোনি (Molony) ও স্কিনারের (Skinner) সঙ্গে এঁর খুব সদ্ভাব ছিল, এই জন্যই এঁর সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে মিয়ার্সের নামোল্লেখ করে তার কুকীর্তির বিবরণ ফাঁস করে দেওয়াতে মিয়ার্স কলকাতা সুপ্রীম কোর্টে হিন্দু পেট্রিয়টের মালিকের বিরুদ্ধে একটি মামলা এনেছিল। সম্ভবতঃ এটি জায়ুয়ারি

মাসের ঘটনা। মিয়ার্স কর্তৃক হিন্দু পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার সংবাদটি হিন্দু পেট্রিয়টের পত্রে প্রকাশিত হয়নি, কারণ আত্ম প্রচারের চেয়ে চাষীদের দুঃখ কষ্টের বিবরণ প্রকাশ করে নীল বিদ্রোহকে একটি জীবন্ত সমস্যা রূপে তুলে ধরাই ছিল হরিশের উদ্দেশ্য। ৩রা মার্চ (১৮৬০) তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র ইংলিশম্যান কাগজের আইন আদালত স্তম্ভ থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করেন। এর থেকে জানা যায় যে কলকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ব্যারিস্টার মিঃ কোই (Cowie) নীলকর মিঃ মিয়ার্সের মানহানির অভিযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রকাশকের বিরুদ্ধে একটি সমন জারীর জন্ত সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রীম কোর্ট এই আবেদন এই বলে নাকচ করে দেন যে পেট্রিয়ট ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত হয়, এটা সুপ্রীম কোর্টের এলাকা বহির্ভূত। মিঃ কোই একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের মামলাটি গ্রহণের উল্লেখ করে হিন্দু পেট্রিয়টের মামলাটিও এই কোর্টের গ্রহণ যোগ্য এই বলে সওয়াল করায় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলাটির সঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সাদৃশ্য নেই, সুতরাং এই নজীর এখানে অচল—এই মামলা এখানে চলতে পারে না। সংবাদটি উদ্ধৃত করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে ইংলিশম্যানের যে রিপোর্ট আমরা উদ্ধৃত করেছি, সেই রিপোর্ট আমাদের পক্ষেও বিরক্তি জনক। মামলাটি সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করলে আমরা বিশেষ লাভবান হতাম। ব্যাপারটি বেশ কৌতুককরও হত। এই ব্যাপারে আমরা এত হতাশ ও বিরক্ত হয়েছি, যে আমরা আর একটা মানহানির অভিযোগের সম্ভা'না কাঁধে নিয়ে বলতে চাই যে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ কোই এর আবেদন প্রত্যাখান করে তাঁর ও তাঁর মক্কেলের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মিঃ মিয়ার্স এই ঘটনায় নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন তবে তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে এই ঘটনায় আমাদের মনোকষ্ট তাঁর চেয়েও বেশী। যাই হোক্ আমরা বলতে চাই যে মিঃ মিয়ার্স আর একবার মামলা করার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন তাঁর অসুখ বা রোগ আইনের সাহায্যে মেটার নয়। তাঁর 'অসুখ' বা 'রোগ' (অর্থাৎ অত্যাচার প্রবণতা) তাঁর অস্থি মজ্জায় ঢুকে আছে।' এর পর 'পুনশ্চ' রূপে হরিশ লেখেন, 'ভাল কথা, আমরা কি জানতে পারি জয়রামপুরের রামরতন মল্লিকের ভাইপোটি (nephew) এখন কোথায়? শুনছি এর এক ভাই এখন ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু এই ভাইপোটি কোথায় গেল?' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নীল বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা রামরতন মল্লিকের দুই ভাইপোকেই মিয়ার্স অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে আটকে

রেখেছিল (দ্রঃ হিন্দু পেট্রিয়ট ৩. ৩. ১৮৬০)। রামরতন ও রামমোহন মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশের লেখা একটি চিঠি ২৪শে মার্চ এর 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয়। এতে গিরিশ এই অভিযোগ করেন যে মিয়ার্স ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট. স্কিনার দুজনেই তাঁর জীবন দুর্বহ করে তুলেছে। মিয়ার্স তাকে অবৈধ ভাবে এক জায়গায় আটকিয়ে রেখেছিল, একজন দারোগা জানতে পেরে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। দারোগা স্কিনারকে এ বিষয়টি জানালে স্কিনার দারোগার জরিমানা করে তাকে অন্যত্র বদলী করে দিয়েছিল। কোর্টে মিয়ার্সের নামে সে মামলা করতে গিয়েছিল, কিন্তু তা সে পারেনি, তার মোক্তার গোপী চাটুজ্যের প্রতি আদালত অবমাননার অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। নীলকরের বিরুদ্ধে গিরিশের মামলা ডিসমিস করে দিয়ে তার ও তার দাদাদের নামে শাস্তি ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তার দুই দাদা আত্মগোপন করায় তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগরে চালান দেওয়া হয়, এখানে ৪,০০০ টাকা জামিন দিয়ে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তাঁকে যশোর ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু যশোর ফেরা মাত্র তাঁকে আবার গ্রেপ্তারি করে সাজা দেওয়া হয়, কারণ জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতে তিনি জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াচ্ছেন ও তাদের কুপরামর্শ দিচ্ছেন। (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪. ৩ ৬০.)।

মিয়ার্স এর মামলা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ ইংলিশম্যান থেকে উদ্ধৃত করে পেট্রিয়টে প্রকাশের পরের সপ্তাহেই হরিশ্চন্দ্র নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হরাডি (Harade) থানার দারোগা কর্তৃক প্রেরিত একটি পত্র হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন। এই পত্রটির মর্ম এইরূপ-'মিঃ মিয়ার্স যশোরের কালাপোল থানার অন্তর্ভুক্ত সিন্দুরি নীলকুঠিতে তরুণচন্দ্র মুখুজ্যেকে আটকে রেখেছে। ডুমুরদহ থানার অধীন জয়রামপুরের মাধব ও ভুবন মল্লিক আমাকে এসে এই খবর দিয়ে জানায় যে এখনই খোঁজ না করলে তরুণকে আর পাওয়া যাবে না। বেলা ১১টায় মিয়ার্স এর এক কর্মচারী কেদারনাথের সঙ্গে তরুণ কালপোল থানায় এসে এজাহার দেয় যে মিয়ার্স-এর আদেশ মত সে থানায় জানাতে এসেছে যে মিয়ার্স তাকে আটকে রাখেনি। জেরায় তরুণ বলে যে মিয়ার্স তাকে আটকে রেখেছিল বটে তবে সে (মিয়ার্স) তাকে বলেছে যে সে ভবিষ্যতে তার উপকার করবে। মিয়ার্স এর এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে থানায় তার বন্দীত্বের ঘটনা অস্বীকার করতে এসেছে। অতঃপর পত্র লেখক হরাদি থানার দারোগা তরুণকে জয়রামপুরে নিরাপদে পৌছে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই রিপোর্ট পাঠানোর সময় দারোগা এই মন্তব্য করেন যে এই অঞ্চলে মিয়ার্স এর প্রতাপ এত বেশী যে থানার কর্মচারীরাও তার কোন হুকুম অমান্য

করতে সাহস করে না। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে লোককে আটকে রাখা হয়েছিল সেই লোক নিজেই থানায় এসে এজাহার দিয়ে যাচ্ছে যে না, তাকে আটকে রাখা হয়নি। হরাদি থানার যে দারোগার চিঠিটি প্রকাশিত হয় তাঁর নাম ছিল-বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (হিঃ পেঃ ১৬ ৩ ৬০)। চিঠিটি ছেপে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে মিঃ মিয়ার্স এর আর একটি কীর্ত্তির সাক্ষ্য যে এত তাড়াতাড়ি মিলে যাবে এতটা আশা করা যায়নি। ১২ ফেব্রুয়ারি (১৮৬০) কাচিকাটা কুঠির ম্যানেজার আর্কিবল্ড হিলস্ সন্নিহিত একটি গ্রামের গৃহবধূ হরমণিকে পুকুর ঘাট থেকে তার লোকজনের সাহায্যে অপহরণ করে নিজের কুঠিতে নিয়ে আসে। হরমণির অসামান্য সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। হিলস্ কোনসময়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে এ রমণীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে অপহরণ করিয়ে এনেছিল। অধিক রাত্রি পর্যন্ত তাকে আটকিয়ে রেখে, তাকে কুঠি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। দুদিন পর তাকে তার এক আত্মীয়র বাড়িতে রেখে আসা হয়। হরমণি অপহৃতা হওয়া মাত্র পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ রিপোর্ট করে যে নির্দিষ্ট কুঠিতে আর্কিবল্ড হিলস অথবা হরমণিকে পাওয়া যায়নি। দুদিন পর ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ রিপোর্ট করে যে হরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ৯ মার্চ হরমণির শ্বশুর মথুর বিশ্বাস জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হার্সেলের কাছে তাঁর পুত্রবধূ হরমণিকে অপহরণ ও ধর্ষণের জন্য আর্কিবল্ড হিলসের নামে অভিযোগ আনেন। হিলসের ৩০ জন অনুচরের নামেও হরমণি অপহরণে অংশ গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অভিযোগটা নাকচ করে দেন। অভিযোগ নাকচ হওয়ার আর একটা কারণ অভিযোগকারী মথুর বিশ্বাস অভিযোগ আনার কয়েকদিন পরেই সম্ভবতঃ ভীত হয়ে একটা রাজী নামা লিখে দেন যে তিনি মামলা চালাতে চাননা। বিচার কর্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ হার্শেল নীলকমিশন চলার সময় ঘটনাটি যে ভাবে তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে মামলাটি নাকচ করার কারণ বর্ণনা করে নীল কমিশনের নিকট একটি রিপোর্ট পাঠান। * নীলকমিশনে সাক্ষ্য দান কালে (৩১. ৫. ৬০, ১. ৬ ৬০) পাত্রী বমওয়েটসন ও হরমনি অপহরণের ঘটনাটি তিনি যে ভাবে শুনেছেন তা বর্ণনা করেন। তবে তিনি পীড়াপীড়ি সত্বেও অপহরণকারী নীলকরের নাম প্রকাশ করেননি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ গ্রন্থে এই অপহরণ ও অত্যাচারের কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। 'হরমণি' নামটির পরিবর্তে 'ক্ষেত্রমণি' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হরমণি অপহরণের পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নলিখিত রূপে সংবাদটি প্রকাশিত

* Indigo Commission Report, Appendix 12.

হয়-'আমরা নীল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত একটি প্রণয় ঘটিত সংবাদ পেয়েছি। নদীয়া জেলার কাচিকাটা নীলকুঠির মিঃ আর টি হিলস্ এই ঘটনার নায়ক। আমরা অধীর ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের ফলের জন্য অপেক্ষা করছি। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু তথ্য রয়েছে, কিন্তু মামলাটি বিচারাধীন বলে তা প্রকাশ করা আমরা সঙ্গত বোধ করছি না—["We can not with propriety publish what we have heard about the matter whilst it is sub-judice" HP 7. 4. 1860] পাদ্রী বম্‌ওয়েট্‌সজ এর সাক্ষ্যদান ১লা জুন শেষ হয়। ঠিক তার পরের দিন হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে লেখেন যে—"নীল কমিশনে বম্‌ওয়েট্‌সজ এর সাক্ষ্য থেকে এমন একটি শোচনীয় ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যে ঘটনার প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। আমরা শুধু একটি মাত্র তথ্য সংযোজন করতে চাই। যে দুর্বৃত্ত (culprit) এই বলাৎকারের ঘটনার জন্য দায়ী তার নামটি ইনি প্রকাশ করেননি। আমরা যা জেনেছি তা জানাচ্ছি। কাচিকাটা (বা কাট্‌চিকাটা) ফ্যাক্টরীর আর্কিবল্ড হিলস এই মেয়েটিকে নদীতীর থেকে অপহরণ করিয়েছিল। মেয়েটি নদীতে জল আনতে গিয়েছিল। হিলস্ ঘোড়ায় চড়ে অপহরণকারীদের পেছনে ছিল। মেয়েটির খুড়-শ্বশুর মথুর বিশ্বাস জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হিলসের নামে একটি অভিযোগ এনেছিল। মেয়েটির রূপে হিলস্ আগেই আকৃষ্ট হয়েছিল। মথুর বিশ্বাসের উপর বিদ্বেষের সঙ্গে এই মেয়েটির রূপের আকর্ষণ-হিলস্‌কে মেয়েটিকে অপহরণের প্রেরণা জুগিয়েছিল। নীল, কাম প্রবৃত্তি ও মামলা এই হল ঘটনা। ["It was in fact a case of love, neel and litigation combined] মথুর বিশ্বাস ডুমুরহুদা মহকুমার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্‌লীনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল কিন্তু সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, মামলাটি নির্দিষ্ট দিনে বাদীর অনুপস্থিতি হেতু ডিসমিস্ করে দেন। মিঃ ম্যাকলীনের মনোভাব থেকে বোঝা গিয়েছিল যে তিনি এই মামলার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি চান না, এইজন্য অবিরত মামলার দিন পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। কার্যতঃ মথুর বিশ্বাসকে মামলার শুনানীর দিন গরহাজির হতে বাধ্য করা হয়েছিল। ["Mathur Biswas complained to Mr. McLean, Asst. Magistrate of the Damoorhooda sub-division who dismissed the case on the plea of plaintiff's non-attendance forced by Mr. McLean's dilatoriness"— H.P. 2. 6. 1860.]

এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আর্কিবল্ড হিলস্ কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মামলা এনে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। সুপ্রীম কোর্ট এই মামলাটি গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, কারণ আসামী হরিশ্চন্দ্র খাস কলকাতার অধিবাসী ছিলেন না, তাঁর

বাসস্থান ও হিন্দু পেট্রিয়ট ভবানীপুর পল্লীতে অবস্থিত, এটি ছিল আলিপুর কোর্টের এলাকাভুক্ত। ইতিপূর্বে মিয়ার্সের মামলাটিও এই কারণে 'ডিসমিস' হয়েছিল। মিয়ার্স আলিপুর কোর্টে মামলা করতে সাহস করে নি। কিন্তু যুবক হিলস্ অত সহজে দমবার পাত্র ছিল না, নদীয়া জেলায় সে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হরমণিকে অপহরণের পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে, এখন তার অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনাটি কলকাতা-বাসী হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে প্রমাণিত করা সোজা হবে না। ঘটনাস্থল থেকে কোন সাক্ষী জোগাড় করাও হরিশের পক্ষে সম্ভব হবে না! হিলসের টাকার অভাব ছিল না, তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসন বিশেষতঃ পুলিশের উপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল। এই সব ভেবে হিলস্ আলিপুরের সদর আমীন তারকচন্দ্র সেনের এজলাসে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে হরিশ্চন্দ্র ও পেট্রিয়টের প্রিণ্টারের বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল। এই মামলাটি যে হরিশ্চন্দ্রকে বেশ বিপদে ফেলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোর্টের খরচ, উকীল, নদীয়া জেলা থেকে সাক্ষী জোগাড় করা ইত্যাদি কর্মব্যস্ত হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য কাজ হয়ে উঠেছিল। হরিশ্চন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করে আপোষে এই মামলা মিটিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি এই ধনগর্বী উদ্ধত ও দুশ্চরিত্র শ্বেতাঙ্গ সন্তানের সঙ্গে আপোষ না করে মামলা লড়ে গিয়েছিলেন। মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, এই মামলা চলা কালেই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। হরিশের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পর এই মামলার একটা ফয়সালা হয়, এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। হরিশ্চন্দ্র এত আত্ম-প্রচার বিমুখ ছিলেন যে, হিন্দু-পেট্রিয়ট্ পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে যে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে মানহানির মামলা উঠেছে বা চলছে এমন কোন সংবাদও প্রকাশিত হয়নি। হিলসের এবং তার উৎসাহ দাতা নীলকর গোষ্ঠীর শত্রুতা উপেক্ষা করে তিনি যথারীতি নীলচাষীদের সমর্থনে ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৬০ এর সুরু থেকে লেঃ গভর্ণর পিটর গ্রাণ্ট্ দশ সপ্তাহের জন্য বিহার সফরে যান। ইতিমধ্যে নীল বিদ্রোহ বিশেষ ভাবে নদীয়া জেলায় প্রকট হয়ে পড়েছিল। সন্ত্রস্ত নীলকরগণ এতে ভীত হয়ে লেঃ গভর্ণর ১০ই মার্চ কলকাতায় ফেরা মাত্র তাদের একটি প্রতিনিধি দলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। পিটর গ্রাণ্ট্ ১৩ মার্চ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র পেট্রিয়টে লেখেন যে নীলকর সংঘের প্রতিনিধি দল নাকি লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণনগরের নীলচাষীদের উপদ্রবের কথা জানাবেন। আশা করি লেঃ গভর্ণর তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন। ইতিমধ্যে কৃষকদের লেখা গাদা গাদা অভিযোগ পত্র লেঃ গভর্ণর পেয়েছেন। সেগুলি নিশ্চয়ই তাঁর টেবিলের উপর জমা থেকে অভ্যর্থনা কক্ষটির শোভা বর্দ্ধন করবে। (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১০.

৩. ১৮৬০)। নীলবিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকে নীলকরেরা অনিচ্ছুক নীল-চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। অত্যাচারিতদের রাশি রাশি আবেদন পত্র সরকারী দপ্তরে আসত। প্রজাদের দাবী ছিল অত্যাচারের প্রতিবিধান করা হোক। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের শুধু আদালতে অভিযোগ আনার পরামর্শ দেওয়া হত। হরিশ্চন্দ্র এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে চাষীদের প্রতি নীলকর প্রভুদের এই বিধ্বংসী মনোবৃত্তি সমগ্র দেশকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে। এমন অবস্থায় সরকারী জবাবের কি নমুনাই না দেখা যাচ্ছে। ["A colder and more repulsive response to tale of intense woe can scarecly bc conecived"—The Govt. of Bengal and Indigo Planting'—H. P. 17. 3. 60]

এই দিনই একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে নীলকর ও চাষীদের সম্পর্ক এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে শুধু সরকারী ও সমাজের মানুষের চেষ্টাতেই এর সমাধান সম্ভবপর হতে পারে। এটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নীলচাষ যে ভাবে চালু আছে সেটা যৎপরোনাস্তি ত্রুটি পূর্ণ। বাঙালী চাষীরা নির্বোধ নয় এরা কেন নীলচাষ করতে চায় না তা কেউ খোঁজ করছে না, তাকে নীলচাষের জন্য চুক্তি বদ্ধ হতে বাধ্য করা হচ্ছে। নীলকুঠির সঙ্গে গ্রামবাসীদের যে নিত্য বিবাদ লেগে থাকে এর থেকে কি বোঝা যায় না যে সকল ক্ষেত্রেই এবং স্থায়ীভাবে এটা এদের কাছে ক্ষতিজনক। নীলচাষ তাদের কাছে মোটেই লাভজনক নয় চাষীর পারিশ্রমিক যা দেওয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়, এটা ত হিসেব কষলে সহজেই ধরা পড়ে। অর্থনীতির একটা ধারা আছে, মানুষের তৈরী আইন কানুন আছে, কোর্ট কাছারি, জজ ম্যাজিস্ট্রেট সবই আছে, তবুও পারিশ্রমিকের হার বছরের পর বছর একরকমই থেকে যায়, এর থেকে কি বোঝা যায় না যে এই পদ্ধতি একটা জুলুম মাত্র। এর থেকে আর একটি ব্যাপারও স্পষ্ট যে যারা শোষক এবং অত্যাচারী তারা বিশেষ একটি ক্ষমতার অধিকারী, এই ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে রাখা অসঙ্গত। কাজেই এই প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং এই বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ ব্যাপক ভাবেই বর্তমান। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কৃষকেরা বহু আগেই এই আন্দোলনে নামেনি। এর কারণ হচ্ছে এই যে চাষীরা এতদিন এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা সহ্য করে এসেছে কিন্তু এখন নিপীড়নের মাত্রা এত অধিক যে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। নীলকর বছরের পর বছর ধরে চাষীদের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছে, কোন বাধা এ যাবৎ তারা পায়নি। এখন বাধা আসতেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তারা বুঝতে পেরেছে তাদের স্বার্থ আর আগের মত নিরাপদ থাকছে না। প্রকৃতির একটা নিজস্ব আইন বা ধারা আছে, কোন দমন মূলক ব্যবস্থা, সরকারী আইন অথবা পক্ষপাতমূলক

বিচার-ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মকে সংযত করতে পারে না……নীলকরেরা এখন বুঝতে পেরেছে যে একজন নীলচাষীকে কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা গুদাম ঘরে আটকে রাখা সম্ভব, কিন্তু নীল চাষীকে বর্দ্ধিত পারিশ্রমিক বা ন্যায্য দাম না দিলে বিদেশে নীল রপ্তানি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আর ঘরে তোলা যাবে না ··

এই মুহূর্তে বঙ্গীয় সরকারের উচিত এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। সরকারের উচিত মধ্যস্থ রূপে চাষী ও নীলকরের মধ্যে বিরোধের সমাধান করে দেওয়া। নীলকরদের চাষীকে ন্যায্য মূল্য দিতে বাধ্য করা। এটা করলে নীল-বিরোধের একটা সুরাহা হয়ে যাবে। নীলকরদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন পরিস্থিতিটা কি দাঁড়িয়েছে সেটা ভেবে দেখেন। তাঁরা জনসাধারণের কাছে এবং নিজেদের কাছেও কতটা হেয় হয়ে গেছেন সেটা ভেবে দেখুন…যে ভাবে তাঁরা জীবিকা অর্জন করেন সেটা মানুষের কাছে আজ ধিক্কৃত…["The question between planters and the ryots has now assumed a form in which it can be effectually treated by both Governmental and social actions. It has been admitted, demonstrated and understood that the entire system as carried on is unsound in the extreme....that (Bengalee) peasants should endeavour to avoid indigo cultivation, that contracts for growing the article should be forced upon them—that there should be feud between the factory and the village—all this argues nothing but that the ryots feel indigo cultivation permanently injurious to their interests. The extreme unprofitableness of cultivating indigo at the current rates paid for it is a demonstrated fact. In spite of economic laws and man-made statutes, in spite of courts, judges and magistrates these rates still maintain themselves and prove the oppressiveness of the system and possession of undue and unjustifiable power by the oppressors. No wonder then that demonstrations .. have taken place so generally. The wonder is that the outbreak of agrarian feeling did not sooner occur. Sore are the griefs the ryots have been labouring under and they have at last found it impossible to smoother them altogether. The planters, disturbed in a position which for many years has been one of uncontrolled mastership over ryot labour, feel alarmed at the insecurity of that position and of its consequent advantage....

No amount of oppressive force no class legislation or partial judication can counteract the operation of natural laws....The planters have perceived that though a ryot may be confined for weeks in a godown, indigo can not be held down at an unvarying price for years in a country annualy importing enormous masses of money....And it is the duty of the Govt. of Bengal to step in at the moment to compose this strife and hasten the advent of the day of settlement....We would earnestly call the attention of the planters to the true nature of their position at the present moment. They can not conceal from either themselves or the public that they stand condemned ....that the system by which they draw their livelihood stands condemned...."—Indigo Planters of Bengal, H.P. 17.3.1860.]

এক সপ্তাহ পরে, হিন্দু পেট্রিয়টে (২৪. ৩. ১৮৬০) হরিশ্চন্দ্র 'নীল-প্রসঙ্গ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন, বর্তমানে নীল চাষ ব্যাপারটি গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা সমাধান করা শক্ত নয় কিন্তু এই সমাধানের বিষয়টি গভর্ণমেণ্টকে দোটানা অবস্থায় ফেলেছে।.... আমরা এই অবস্থায় লেঃ গভর্ণরকে বিব্রত করতে চাইনা, তবে একটা পরামর্শ দিতে চাই, এই পরামর্শ অপর পক্ষ (নীলকর) থেকে তাঁর পাওয়ার আশা কম। প্রথম কথা এই যে নদীয়া জেলায় শান্তিভঙ্গ যদি হয় তবে সেটা নীলকরেরাই বাধাবে। চাষীরা গত কুড়ি বছর ধরে অশান্তির সৃষ্টি করেনি। যা কিছু অশান্তি নীলকরেরাই তার জন্য দায়ী। এরা এখন কি পন্থা অনুসরণ করবে, তা আমরা বলতে পারি না। বৃষ্টি পড়া শুরু হলেই নীলকরেরা নীলচাষ সুরু করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে. এই চাষ নিয়ে নদীয়া জেলার শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। আমরা লেঃ গভর্ণরকে একথা নিশ্চিত ভাবে জানাতে চাই, চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আগামী বৎসরের জন্য কোন দাদন নেয়নি। কুঠির পুরাতন খাতাপত্র থেকে বকেয়া হিসাব খুঁজে বের করে চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করা হবে। যে 'দাদন' বহুকাল উশুল হয়ে গেছে, সেইটিকেই আবার নূতন দাদন রূপে দেখানো হবে। এবৎসর চাষীরা কুঠির একটি টাকাও ছোঁয়নি। নীলকরেরা এই দাবী তুলবে যে বকেয়া দাদন উশুল করার জন্য চাষীদের নীল বুনতেই হবে। এইভাবে নীলকরদের দাবী একটা মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বহু পুরাতন বকেয়া দাদন ব্যতীত চাষীদের কাছে নীলকরদের কোন পাওনাই নেই। তৃতীয় কথা হল যে নীলচাষীদের কুড়ি ভাগের একভাগ চাষীও ইডেনের পরোয়ানার কথা জানেনা। আমাদের চাষীদের কোন সঙ্ঘ বা সমিতি নেই যা নীলকরের আছে।

চাষীদের সঙ্ঘ নেই, তার কোন আপিস নেই, সেক্রেটারীও নেই। কোন সেক্রেটারী যে এই পরোয়ানা ছাপিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে—এমন নয়। চাষীদের কোন সংগঠন নেই তাদের সম্পাদকও নেই। একথাগুলি মনে রেখে লেঃ গভর্ণর যেন নীলকর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। যত খুশী ভদ্র ব্যবহার লেঃ গভর্ণর এদের সঙ্গে করতে চান করুন, কিন্তু দোহাই, এদের বহু সুবিধাই এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, আর কোন দাক্ষিণ্য যেন এদের প্রতি না দেখানো হয়।

["The position of the Govt. of Bengal in reference to the indigo questin is at present moment of greater delicacy then difficulty....We are not going to tender advice to the Lt. Governor in this hour of difficulty. We will however offer him some information which may possibly be of service to the Govt. and which he is not likely to recive from other quarters. First : the peace of Nuddea district is not likely to be broken except by the planters. But with such authority as may attach to the statement of this paper with regard to the Indigo affair we say that never will anything occur which has not often occured in Bengal during the last twenty years. We are however unable to speak of the planters. The next shower of rains may perhaps make them frantic and betray some of them to acts which might seriously compromise peace of the district. We can assure the Lt. Gov. that ryots as a body have not taken advance for the next year. Old balanccs might be raked up against them from factory books. The ghosts of long defunct balances will be called up against them. But they have not taken a rupee this year. So the cry "Let them work on their advance" is a false cry. The ryots in fact owe nothing except factory drawn balance accounts of decades old.

Thirdly : that nineteen twentieth of the ryots who have rebelled against Indigo know about as much of Mr. Eden's 'Parwanah' as they do of the *principia*. There is no ryots' association to receive documents of this interesting character with a secretary to circulate it among the ryots in general. With these facts before him we trust the Lt. Governor will perceive the necessity of making concession to the planters

than civily receiving their deputations…They have had enough already."—The Indigo Affairs, H.P. 24.4.1860]

লেঃ গভর্ণর পিটার গ্রান্টের সঙ্গে আলোচনা কালে ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা গ্রান্টের উপর এই ভাবে চাপ দেন যেন তিনি এমন আদেশ জারি করেন যাতে চাষীরা তাদের চুক্তিভঙ্গ না করে। তাঁরা আরও বলেন যে চাষীদের মধ্যে এমন যে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে সরকার নীলচাষের বিরোধী তার জন্যও এইরূপ ঘোষণা বা আদেশের প্রয়োজন আছে। তাঁদের দ্বিতীয় দাবী ছিল যে চুক্তি ভঙ্গ করে নীলচাষে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে অপরাধীর তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী থাকবেন। গ্রান্ট এঁদের বলেন যে চাষীদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে কোন আইন-প্রবর্তনে তাঁর নীতি গত সম্মতি নেই। এক ঘণ্টা ধরে তর্ক বিতর্কের পর অবশ্য গ্রান্ট এই দাবীগুলি মেনে নেন। গ্রান্টের মত এই ছিল যে ব্রিটিশ আইনে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ আইনগত অপরাধ। কিন্তু নীল চাষের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ সঙ্গত নয় কারণ এক্ষেত্রে 'চাষী' শ্রমিক নয়, সেও জমির মালিক। নিজের এই দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিতে অচল থেকেও গ্রান্ট এই কারণে একটি বিশেষ আইন প্রণয়নে সম্মত হয়েছিলেন যে তাঁর মনে এই আশংকা দেখা দিয়েছিল যে এমনি একটি আইন যদি তিনি খসড়া না করে দেন, তবে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় লর্ড ক্যানিং-এর সম্মতি নিয়ে এরা এমন ধরণের একটি আইন 'পাশ' করিয়ে নেবে যাতে নীলচাষীরা চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারত সরকারের উপর বিশেষ করে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের উপর নীলকরদের প্রভূত প্রভাব আছে একথা গ্রান্টের অজানা ছিল না। অতঃপর গ্রান্ট এই উদ্দেশ্যে এমন একটি বিলের খসড়া করেন যার উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের তরফে নীলচুক্তি ভঙ্গ করা চলবে না (to enforce the fulfilment of Indigo contract) তবে ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা না করার স্বাধীনতা থাকবে, দাদন নেওয়া ব্যাপারটাও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে তাদের ইচ্ছাধীন থাকবে। এ আইন মাত্র ছ মাস বলবৎ থাকবে। ইতিমধ্যে নীলচাষ প্রথা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হবে, এই কমিশন নীলচাষীদের অসুবিধার বিষয়গুলি বিচার করে দেখবে। পরে এমন একটি স্থায়ী আইন প্রণীত হবে যাতে চাষী এবং নীলকর উভয়েরই স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। (Equal and complete protection to the ryot as well as of the planter will be afforded).

গ্রান্টের প্রণীত খসড়া বিলটি বঙ্গীয় সরকারের প্রতিনিধি মিঃ স্কন্স (A. Sconce) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে মার্চ ব্যবস্থাপক সভায় (লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে) উত্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য তৎকালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়

কোনও ভারতীয়েরস্থান ছিল না। এই সদস্তরা বিলটি এমন ভাবে সংশোধন করেন যেটা চাষীদের ক্ষতি করতে পারে। গ্রান্ট এতে চাষীদের ক্ষতির আশংকা করে চিন্তিত হন তাঁর মনে এই ধারনা জন্মায় যে কোন পক্ষপাত দুষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের ধারার অপব্যবহার করে চাষীদের হয়রাণ করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি সমস্ত জেলাম্যাজিস্ট্রেটদের সতর্ক করে দিয়ে লেখেন যে অবিবেচক সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটরা যাতে পক্ষপাত শূন্য হয়ে বিচার করেন সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। চুক্তি আদৌ আছে কিনা এবং সেটি প্রমাণযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পরবর্তী ৯ এপ্রিল গভর্ণর জেনারেল এই বিলটিতে সম্মতি দান করেন। এটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের একাদশ আইন রূপে পরিচিত হয়। [Act XI of 1860 "an act to enforce the fulfilment of indigo contracts and to provide for the appointment of a commission of enquiry".]

২৪ শে মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিলাটি উত্থাপিত হওয়ার চারদিন পর হরিশ্চন্দ্র প্রস্তাবিত এই বিলটিকে 'চাষীর প্রতি বলপ্রয়োগ মূলক আইন' আখ্যা দিয়ে এই শিরোনামেই একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন এই বলপ্রয়োগ আইনের যে প্রস্তাব এসেছে সেটি যে গৃহীত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তাই এখন আর এর বিরোধিতা করে কোন লাভ নেই। এই আইনে 'চুক্তি' (contract) র মত একটি বিষয়কে দেওয়ানির (Judicial) আওতা থেকে ফৌজদারির (criminal) আওতায় আনা হয়েছে। এতে চাষীদের ম্যাজিস্ট্রেটদের খপ্পরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এতে আগামী দিনে চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করা হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবে আগে তাদের যে ভাবে ঠকানো হয়েছে তা আর সম্ভব হবে না। এই 'ছয়মাসী' আইনের মেয়াদ ফুরোলেই তারা নীল চাষ থেকে অব্যাহতি পাবে, উপযুক্ত মজুরিও তাদের প্রাপ্য হবে। পরিশ্রম এবং চাষের খরচ বাবদ যে পরিমান অর্থ তাদের প্রাপ্য সেটা তারা যাতে ঠিকঠাক পায় সেজন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে। একটু শক্ত হয়ে নির্ভীক ভাবে রুখে দাঁড়ালেই তাদের পাওনা তারা বুঝে নিতে পারবে হরিশ্চন্দ্র এই প্রবন্ধে প্রকারান্তরে চাষীদের বলতে চেয়েছেন যে তারা যেন ভীরুতা বা দুর্বলতা ত্যাগ করে তাদের পাওনা গণ্ডা নীল মরশুম অন্তে বুঝে নেয়।

["The Ryots coercion law is by this time an accomplished fact....a civil obligation has by *ex post facto* legislation been converted into a criminal liability and the ryot whose present condition is the result of magesterial incapacity or partiality is now placed more entirely than ever at the mercy of the

magistrate.........The ryots we believe will for the more part have to succumb to this law and be compelled to grow indigo this season...By the time the law expires, their engagements will have ended and their remuneration fallen due. It will then be for them to enact by all lawful means the full remuneration for their costs and labonrs........The ryots when the reckoning comes insist upon actual payment of the price which has hitherto been a nominal one. They should take care that their deliveries are made before trustworthy witnesses or be attested by irrepudiable acknowledgements. With ordinary firmness they will be able to secure this much protection for themselves. The realisations of their dues will then be a question of mere time."—The Ryots Coercion—H.P. 31. 3.1860.]

হরিশ্চন্দ্রের প্রেরণায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক নীলচাষ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মিশনারীগণও নূতন আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত বিলটি নীলকরদেরও খুশী করতে পারেনি। বাধ্যতামূলক নীলচাষ আইন কর্তৃপক্ষ ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন, নীলকরেরা চেয়েছিল এই আইনটি চিরস্থায়ী করা হোক। তা ছাড়া 'নীলচাষ বিষয়ক অনুসন্ধান কমিশন' প্রস্তাবটি তাদের ভীত করেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই 'কমিশন' বসানোর প্রস্তাবটি ছিল নীল বিদ্রোহ এবং এর মুখপাত্র হরিশ্চন্দ্রের অবিরত প্রতিবাদের পরিণাম। ১৮৬০ এর একাদশ য়্যাকটটির মাত্র এই প্রস্তাবটিই হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ নীলচাষী-বন্ধুদের কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল।

'একাদশ য়্যাকট' টি বাঙলার নিরক্ষর নীলচাষীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হতেই নীলকরেরা চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এদিকে নীলচাষীরা দৃঢ়ভাবে নীল বুনতে অস্বীকার করেছিল। নীলকরেরা প্রথম প্রথম একাদশ য়্যাকট অনুযায়ী নীলচুক্তি ভঙ্গের জন্য চাষীদের নামে অভিযোগ আনতে দ্বিধান্বিত বোধ করেছিল, কারণ তাদের কাছে রক্ষিত চুক্তি পত্রগুলি প্রায়ই ছিল 'ভুয়ো' বা 'জাল'। দু একটা অভিযোগ এনে নীলকরেরা যখন দেখতে পেল যে ম্যাজিস্ট্রেটেরা চুক্তিপত্রগুলি বৈধ বা অবৈধ এটা পরীক্ষা করতে মোটেই আগ্রহান্বিত নয়, অভিযোগ পেলেই তারা চাষীকে জেলে পাঠাচ্ছে তখন তারা নীলচাষীদের নামে অভিযোগ করা সুরু করেছিল। চাষীরা নীল চাষ করা আর জেলখাটা এ দুটোর মধ্যে জেলখাটাই বেছে নিয়েছিল। তাদের মুখের কথা

এই ছিল যে 'প্রাণ যায় যাক, তবু নীল বুনব না'। নীলকরেরা হাজার হাজার চাষীর নামে আদালতে অভিযোগ এনেছিল। নূতন আইনে যে ম্যাজিস্ট্রেট-দের উপর চাষীদের স্বার্থ রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল সেই ম্যাজিস্ট্রেটরাই নীল-করদের সঙ্গে যোগসাজসে চাষীদের নীলকরদের দাদন গ্রহণ করে নূতন চুক্তি করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করত। ভীতি প্রদর্শনে কাজ না হলে জাল চুক্তি-পত্রের ভিত্তিতে চাষীদের জেলে পাঠানো শুরু হয়েছিল। প্রথমে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে চাষীদের চুক্তি করতে বলা হত, এতে যে চাষীরা অনিচ্ছা প্রকাশ করত তাদের মোটা টাকা জরিমানার উপরে তিন মাস জেল খাটতে হত। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের আতঙ্ক বা গুজব ছড়ানো হত যে ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে ধান চাষ করলে ঘোড়সওয়ার গোরা ও গুর্খা সৈন্যেরা এসে চাষীকে গুলি করে মেরে ফেলবে আর তাদের হালের বলদগুলি সাহেবদের খানায় পরিণত হবে। এই আতঙ্ক ছড়ানোর সংবাদটি হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়েছিল (২৮. ৪. ৬০)। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে একমাত্র নদীয়া জেলাতেই ২৭৯ জন চাষীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় দুইশত জনের নামে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অবশিষ্টদের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নীলক্ষেতের ধ্বংস সাধন, গরু চুরি, অপর চাষীদের নীল চাষ না করতে প্ররোচনা দান ইত্যাদি। মিথ্যা সাক্ষ্য, জাল চুক্তিপত্র প্রভৃতির ভিত্তিতে এই সব সাজা দেওয়া হয়েছিল। এই ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন আগে মন্তব্য প্রকাশ করে লেখেন—এইম্যাজিস্ট্রেটেরা কি লক্ষ লক্ষ প্রজা শাসন বা বিচার কার্যের যোগ্য? এরা নীলকরদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার ও তাদের মেমদের সঙ্গে মেলামেশা বা নাচের প্রলোভন জয় করতে পারে না ("Are those magistrates men to govern millions, when they can not resist the temptation of dining with the planters and talking with their wives and dancing with them ?")

কিছুদিন পর তিনি আবার এদের সম্বন্ধে লেখেন—ডজন খানেক দুর্নীতি পরায়ণ, ঘুষখোর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর একাদশ আইন কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরা ভ্রষ্টা নারীর মতই দূষনীয়। ["Dozen corrupt, bribe taking magistrates....who have prostituted themselves in executing the Act XI.."—H.P 26.5.1860.] একাদশ আইন চালু হতে না হতেই বাঙলার মফঃস্বল থেকে বহু অত্যাচারের কাহিনী হিন্দু পেট্রিয়টের দপ্তরে জমা হতে থাকে। ১৪ই এপ্রিল 'জবরদস্তি মূলক আইন' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে চাষীদের উপর মফঃস্বল বাঙলায় যে উৎপীড়ন চলছে তার বিবরণ দিয়ে হরিশ্চন্দ্র চাষীদের মনোভাব নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেন-"আমরা দুর্বল, এই জন্যেই বহু কাল ধরে আমাদের অত্যাচার সহ্য করে আসতে

হচ্ছে। আমরাই দেশের সম্পদ উৎপাদন করি, এটা দেশেরই সমৃদ্ধির কারণ। গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে আমাদের রক্ষা করাই উচিত কর্তব্য। তার পরিবর্তে আমাদের কঠোর আইনের নাগপাশে বাঁধা হচ্ছে, আমাদের ভীতি প্রদর্শন করাতে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নীলকরদের তঞ্চকতা ও অত্যাচারের কাছে যাতে আমরা নতিস্বীকার করি, অলাভজনক নীলচাষে বাধ্য হই তার জন্যই আমাদের পিছনে সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীলকরদের অর্থ সম্পদ আছে, বাহুবলও আছে (লাঠিয়াল বাহিনী), তাদের সরকারী মহলে প্রভাব আছে। অত্যাচারী নীলকরেরা যে কোন গুরুতর পাপ কাজ করতেও দ্বিধা বোধ করে না। দেশের গুণ্ডা বদমায়েসের দল এদের অধীনে আছে। সরকারের উচিত এদেরই দমন করা। এই নীতির অনুসরণ না করে, সরকার এদের এমন ভাবে সাহায্য করছেন, যাতে তারা বিনা বাধায় আমাদের উপর অত্যাচার অব্যাহত রাখতে পারছে, [..."Here are we the weak, the oppressed of the years, the producers of the country's wealth, the support of the prosperity, who ought to be cherished and protected by the Govt. But with a law of special severity troops are sent to make us submit to fraud and oppressions. There are the planters powerful, influential, wealthy, oppressive, committing violent crimes, the patrons of the ruffians of the country, who instead of being punished and put down, are encouraged, furnished with means to extend their operation" H.P. 14. 4. 60] অতঃপর হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য করেন যে নীলচাষের জেলাগুলি থেকে আমরা যে সব চিঠি পেয়ে থাকি সেগুলি থেকে রাজদ্রোহজনক মনোভাব খুঁজে পাওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় [H. P. 14. 4. 1860.]

গ্রামাঞ্চলে নীলচাষীদের উপর উৎপীড়ণের সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য করেন যে একাদশ আইন আমরা মেনে নিতে পারি কিন্তু এর ঠিক ঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রশাসন এটি ঠিক ভাবে ব্যবহার করছে কিনা এটাই আমরা দেখতে চাই। [" It was not the law itself but its administration that is crucial"—H. P 28. 4. 1860 .]

একাদশ আইন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া ও যশোরে বিদ্রোহ বেশ প্রবল আকারে দেখা দেয়। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ হার্শেল একাদশ আইনের যাতে অপব্যবহার না হয় তার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীগণ এই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেনি, তাই জেলায় বিদ্রোহ প্রবল হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী যশোর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মলোনি (F. W. Molony),

এঁর সহকারী (Joint Magistrate) ছিলেন স্কিনার (C. B. Skinner), এই দুই ম্যাজিস্ট্রেটই নীলকরদের দালাল রূপে বহু চাষীকে হায়রাণ করে জেলে পাঠিয়ে ছিল। এর ফলে সমগ্র যশোর জেলায় অত্যাচার প্রতিরোধে চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। যশোর অঞ্চলে হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতা শিশিরকুমার ঘোষ সক্রিয় ভাবে এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শিশিরকুমার প্রেরিত মলোনি ও স্কিনারের বহু কুকীর্তির কাহিনী হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মলোনি ও স্কিনার দুজনকেই দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার জন্য সরকারের তরফ থেকে ভর্ৎসিত হতে হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মলোনি ও জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার যশোরের চাষীদের কাছে যথাক্রমে বড় পাতড়ামারা ও ছোট পাতড়ামারা নামে পরিচিত হন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংবাদদাতা জানান যে মলোনির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে তিনি কুড়ি দিন আত্মগোপন করে ধরা পড়েন। মলোনি নীলকুঠির কাছে একটা পাকুড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে তার কাছারি বসিয়েছিল। এই তাঁবুর কাছে একটি ইঁট খোলার গুদাম ঘরকে সে জেল বানিয়েছিল, বহু চাষীকে সে কারাদণ্ড দিয়ে ওই গুদামঘরে আটকে রাখত। জন পনের মানুষ দাঁড়াতে পারে এমন এই জেলখানায় বহু লোককে গাদাগাদি করে আটকে রাখা হত। তার ভরসা ছিল এই যে এতকষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক চাষী বাধ্য হয়ে নীলচাষে সম্মতি দিয়ে মুচলেকা সই করে দেবে। প্রকৃত পক্ষে তাই ঘটেছিল (হিন্দু পেট্রিয়ট, ৫ মে, ১৮৬০)। যশোর, নদীয়া জেলার নীল বিদ্রোহ কুষ্টিয়া অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, এটি তখন পাবনা জেলার অধীন ছিল। পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুসপ্রাট (H. Muspratt) এবং তার সহকারী কুমার খালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লিঙ্গহাম (E. F. Lingham) দুজনেই এই অঞ্চলে প্রজাদের ভীত করতে সন্ত্রাসের প্রশ্রয় দিয়েছিল। এপ্রিল মাসে লেঃ গভর্ণর তাঁর এক নির্দেশে সকল বিভাগীয় কমিশনারকে লিখে জানান যে কোন চাষীকে চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে তার বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে সেগুলি যথার্থ কিনা তা খুঁটিয়ে দেখা ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তব্য হবে। হরিশ্চন্দ্র ১২মে হিন্দু পেট্রিয়টে এই মন্তব্য করেন যে লেঃ গভর্ণরের এই নির্দেশ মানা হচ্ছে না। নীলকর শপথ নিয়ে কোন চাষীর নামে অভিযোগ আনে যে সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে, নীলকরের কোন কর্মচারী এই অভিযোগ সমর্থন করে, এর পর ফ্যাক্টরীর হিসেব বই দাখিল করা হয়, এগুলি সব 'জাল' হিসেব বই। এতেই চাষীদের সাজা হয়ে যায়। এত অত্যাচার ও নিপীড়ণ সত্ত্বেও চাষীরা নীল বুনতে সম্মত হয়নি। দলে দলে জেলে যেতে তারা ভয় পায়নি। এই সময় 'নীলপ্রসঙ্গ' শিরোনামে হরিশ্চন্দ্র (১০ মে ১৮৬০) একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। হরিশ্চন্দ্র

লিখেছিলেন—"বঙ্গদেশ তার কৃষকদের জন্ত সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করতে পারে। ···এই চাষীদের কোন ক্ষমতা নেই, এরা দরিদ্র। কোন প্রকার রাজনৈতিক শিক্ষা বা জ্ঞানও এদের নেই, এমন কি এদের কোন নেতাও নেই। তবু এরা এমন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে যে বিপ্লব বিস্তৃতি ও গুরুত্বের দিক থেকে পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাসে যে কোন দেশে সংঘটিত যে কোন বিপ্লব থেকে হীনতর নয়। তারা যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছে তারা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। এদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ও খবরের কাগজের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও কম লড়তে হচ্ছে না। এতৎসত্ত্বেও এরা যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার সুফল আমাদের দেশের মানুষ বংশানুক্রমে ভোগ করবে। তারা যে এই সাফল্য অর্জন করেছে তার পেছনে আছে শুধু ন্যায়-নিষ্ঠা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সাহস। এরা কোন পাপ কার্য করেনি—এমন কি কোন হিংসাত্মক কাজেও এরা নিজেদের লিপ্ত করেনি।

ইতিমধ্যেই চাষীদের উপর অত্যাচারে অভ্যস্ত শত্রুরা বুঝতে পেরেছে, তাদের এই অত্যাচার মূলক প্রথা (নীলচাষ) বন্ধ করতে হবে। তারা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছে যে এমন দিন আসছে যখন আর বাঙলার কৃষককে ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা চলবে না। নীলকমিশনের পরিণাম যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে এই কমিশনের রিপোর্টে নিশ্চিত প্রমাণিত হবে যে নীল-কুঠিগুলি যে প্রথায় নীলচাষ চালায় সেটা একটা প্রচণ্ড জুয়াচুরি, হিংসা ও লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে এই ঘৃণিত প্রথা চালু থাকা ধিক্কার জনক। যে প্রথায় এই চাষ (অর্থাৎ নীল চাষ) চলছে বা চলে আসছে তার সর্ত এই যে চাষী বা প্রজাকে তার সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে, তার সবচেয়ে কর্মক্ষম বলদ দিয়ে এবং তার সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে নীল চাষ করতে হবে। আর কাদের স্বার্থের জন্ত সে এই চাষ করবে এবং কেনই বা করবে? এর উত্তর হচ্ছে এই যে তাদের এই চাষ করতে বাধ্য হতে হয় একদল নিষ্ঠুর বিদেশী বণিকের স্বার্থে। কিসের জন্ত এটা করতে হয়, এর জবাব হচ্ছে এই যে এরা পয়সা কামাবার লোভে এদেশে এসে জুটেছে। এই প্রথার আর কয়েকটি দিক আছে। ঈশ্বর নির্দিষ্ট ধর্মাধর্ম অথবা মনুষ্য-সৃষ্ট আইন কানুনের যাদের কাছে কোন মূল্য নেই এমন একদল যথেচ্ছাচারী মানুষের ইচ্ছা প্রকাশ মাত্র চাষীকে তার স্বার্থে নিজের ধনসর্বস্ব, তার ব্যক্তি-সত্তা, সন্তান, স্ত্রী এবং জীবন উৎসর্গ করতে হয়। এই প্রথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, দেশে এমন সব বিদেশীকে আশ্রয় দিতে এবং জীবিকার্জন করতে দিতে হবে যারা পুরোপুরি বদমায়েস, ডাকাত, খুনী এবং [illegible]। এই প্রথা স্বীকার করে নিয়েছে যে জাতীয় সম্পদ সমূহের সর্বাপেক্ষা উৎস, কৃষি-কাজের অবনতি ঘটিয়ে এটাকে একটা অস্বাভাবিক এবং অলাভজনক ভাবে নিয়োগ করা হবে। এই সব [illegible] সবকটাই বহুদিন

থেকে জানা আছে। তবে এই তথ্যগুলি জানা থাকা বা না থাকা একই কথা, কোন প্রতিকার চেষ্টা এতদিন হয়নি। নীল কমিশনের কর্তব্য এই উদ্ঘাটিত সত্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। তখন আর এই বর্তমান নীল চাষ প্রথা একদিনও টিকে থাকতে পারবে না।

নীল বিদ্রোহে চাষী সমাজকে প্রচুর দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এদের অপমান ভোগ করতে হয়েছে, বেঁধে রাখা হয়েছে, অনাহারে থাকতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, বাড়ী ঘর হারাতে হয়েছে। এদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মোট কথা যতদূর অত্যাচার হওয়া সম্ভব, সব অত্যাচারই এরা সহ্য করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, লোকজন ধরে নিয়ে তাদের গুম করা হয়েছে। মেয়েদের ধর্ষণ অথবা শ্লীলতা হানি করা হয়েছে, ঘরে মজুত শস্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হেন অত্যাচার নেই যা অনুষ্ঠিত হয়নি। আমাদের চাষীরা তবু ভয় পেয়ে নীলকরের বশ্যতা স্বীকার করেনি, তারা মনে করে স্বাধীনতা তাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারই তারা ফিরে পেতে চায়, এইটুকুই তাদের উচ্চাশা। এদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, যে একাদশ আইন প্রবর্তিত হয়েছে সেই আইনে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়েছে। চাষীদের আর কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে তখন তাদের ভাগ্যে এই অভীষ্ট লাভ ঘটবে। তাদের সামাজিক অবস্থায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে আর তাদের এই শুভ ফল দেশের সর্ববিধ ব্যবস্থাকেই উন্নত করে তুলবে। আমাদের দেশের বহু আইনের ত্রুটি, আপিস কাছারিতে দুর্নীতির অবস্থিতি, পুলিশের অকর্মণ্যতা, কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর অভ্যস্ত অত্যাচার এবং সর্বত্র লক্ষনীয় আইন শৃঙ্খলার অভাব এ সবই এখন এমন ভাবে ফাঁস হয়ে যাবে, যা কখনই হয়নি। এর ফলে এই ত্রুটী পূর্ণ ব্যবস্থার সংস্কার বা উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।"

["Bengal might well be proud of its peasantry....wanting power, wealth political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal, have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social histrory of any other country. They have battled with adversaries possessing some of the most formidable elements of power. With the Govt. against them, the press against them, they have achieved a success of which the benefits will reach all orders and the most distant generations of our countrymen. And all this they have done by sheer farce of virtue, by patience, perseverance and fortitude without committing a single crime—almost a single act of violence.

Already the oppressors of Roy̦ts have come to feel that their system of oppression must cease. They see the day is coming when Bengal Ryots may not be treated as a serf. Howsoever, the labours of the Indigo commission may end, they will authoritatively establish that the factory system is a system of enormous fraud, violence and rapine, the existence of which would be a opporobrium to any Govt. It is a part of that system that the Ryots should give their finest land their strongest bull, their fullest industry to the service of men whose only claim upon them is that they are unsympathising foreigners come to make money amongst them. It is a part of that system that the Ryots should, at the capricious call of some men disregardful of divine and amenable to no human laws, surrender their means, their persons, their wives, their lives. It is part of that system that the country should be made to give refuge and subsistence to professional rogues, sharpers, bullies, robbers and murderers. It is part of the same system that the most important branch of national industry should be repressed, diverted into unnatural directions or forced to improductive purposes. All this indeed has long been known, but the knowledge has hitherto existed in a form useless for practical purposes. It remains for the commissions to give the impress of their responsible authority to this knowledge. The system will then be no longer able to maintain itself for a day.

The revolution has caused the Ryot community a vast mass of suffering. They have been insulted, bound, starved, imprisoned, ousted from home, deprived of their property, subjected to every form of oppression one can imagine. Villages have been burnt, men carried off, women violated, stores of grain destroyed and every means of coercion has been used. Yet the Ryots have not yielded, they have not ceased to aspire after the freedom which they feel to be their birth right and which they have been told the law assures them. Let them

but suffer on a few weeks more and they will gain their darling object. A revolution will have been effected in their social condition, the beneficial effects or which will reach all the country's institutions. The defects of our laws, the vices of our courts, the inefficiency of the police, the oppression systematically practised by some classes and the general prevalence of anarchy will have been exposed in a manner never hitherto made which will make reform inevitable.— The Indigo Question, H.P 19. 5. 1860.]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের একাদশ আইনের (Act XI of 1860) একাদশ ধারায় নীলচাষ প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান মূলক কমিশন বসানোর প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব অনুসারে মে মাসের ১০ই তারিখে নীল কমিশন গঠিত হয়। বাঙলা সরকারের দুজন উচ্চপদস্থ ও দক্ষ কর্মচারী সেটনকার (Mr. W. S. Seton Ker) ও রিচার্ড টেম্পল (Mr. Richard Temple) সরকারের তরফে কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হন। সেটন কারকে কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। নীলকর সভ্যকে Indigo Planters Association একজন প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়। এদের মনোনীত ফার্গুসন (W. F. Fergusson) ছিলেন বারাসত অঞ্চলের ঝিকরগাছা নীল সংস্থার (concern) মালিক। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এঁর অভিযোগের ফলেই কালারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রজা-দরদী আব্দুল লতিফকে বিদায় নিতে হয়। মিশনারীগণ গ্রামাঞ্চলে থাকতেন এবং প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এই জন্য প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে রেভাঃ জে সেলকে (Rev. J. Sale) কে প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মনোনয়ন ক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে কমিশনের সদস্য মনোনীত করা হয়। চন্দ্রমোহন একবার দ্বারকানাথের সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ইনি মাতুলের নীলকুঠি ও জমিদারী দেখা শোনা করতেন। নীল কমিশন গঠন ও সদস্যদের নাম ঘোষিত হওয়ার পর হরিশ্চন্দ্র সাধারণ ভাবে এতে সন্তোষ প্রকাশ করে চন্দ্রমোহন সম্বন্ধে এমন এক মন্তব্য প্রকাশ করেন যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতি কটাক্ষ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। হরিশ্চন্দ্র লেখেন জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থ অনেক সময় অভিন্ন। চন্দ্রমোহন বাবু একজন জমিদার। নীলকুঠি পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। চন্দ্রমোহন অত্যন্ত সাহেব ঘেঁষা, তাঁর জীবন যাত্রাও সাহেবি ধরণের ছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইন সচিব যখন বিচারালয়ে কালা-ধলায়

বৈষম্য দূর করতে একটি 'বিল' আনাতে চেয়েছিলেন তখন কলকাতার ইংরাজ সমাজ এটিকে 'ব্ল্যাক্-অ্যাক্ট' নাম দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই অ্যাক্টের সমর্থনে বহু সভা সমিতির আয়োজন করেন, সংবাদপত্রেও আন্দোলন চলে। জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের এই প্রচেষ্টায় চন্দ্রমোহন ছিলেন একমাত্র ভারতীয় যিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিলে আইন সচিব বেথুনকে এই 'অ্যাক্ট' প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে চন্দ্রমোহন বাবুর মনে ইংরাজ বিদ্বেষের একান্ত অভাব সুতরাং তিনি মনোনীত হওয়ার যোগ্য [**"Race antagonism, an element not entirely out of question here, is utterly absent in him"—H. P. 12. 5. 1860.**]

নীলকমিশনের অধিবেশন ১৮ই মে থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় চলেছিল। ৬ থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত এর অধিবেশন কৃষ্ণনগরে বসেছিল। কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে কমিশনের কাজ আবার কলকাতায় শুরু হয়ে ৪ঠা আগস্ট শেষ হয়। মোট ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষীদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন সরকারী কর্মচারী. ২১ জন নীলকর, ৮ জন খ্রীস্টান ধর্ম যাজক (মিশনারী) ১৩ জন জমিদার অথবা ছোট জমিদার (তালুকদার, এবং ৭৭ জন চাষী-প্রজা। চাষী প্রজাদের বক্তব্যগুলি সিটন কার, পাদ্রী সেল ও চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় ইংরাজীতে অনুবাদ করে নিতেন। একাদশ আইনে কারারুদ্ধ নদীয়া জেলার ৬০ জন চাষীর সাক্ষ্য কৃষ্ণনগর জেলখানাতে নেওয়া হয়েছিল। কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল বাঙলা, বিহার ও তদানীন্তন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশে) নীলচাষ। এর সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও যুক্ত ছিল—জমিদার ও রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক, নীল-চাষের অর্থনীতি, নীলচাষ সম্পর্কে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের দৃষ্টি ভঙ্গি, প্রচলিত আইনের ব্যবহার বা অপব্যবহার, ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা (land tenures), নীলচাষের ফলে দেশের সাধারণ অবস্থা, অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নতির পর্যালোচনা। দক্ষ প্রশাসক লেঃ গভর্ণর স্যর জন পিটর গ্রান্ট নীল চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দুর্নীতির বিষয় বেশ ভাল ভাবেই অবগত ছিলেন। ভারত সরকারের উপর নীলকর সমিতির প্রচণ্ড প্রভাব ছিল, লেঃ গভর্ণর গ্রান্টের পক্ষে একক ভাবে নীলকরদের অত্যাচার বা অনাচার বন্ধ করা সম্ভব ছিল না, নীল-করদের অত্যাচার নিবারণ ও শান্তি রক্ষার জন্য একাদশ আইন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শান্তি রক্ষার জন্য বাঙলার জেলাগুলিতে কয়েকদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। বিবেক বর্জিত ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও এদের সহকারীগণের যোগসাজসে শান্তি রক্ষার পরিবর্তে এদের নীল বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগানো হয়েছিল।

নানাদিক বিবেচনা করে গ্রান্ট নীল কমিশনের পরিকল্পনা করে এবং বিচার্য বিষয় গুলিও (Terms of Reference) বিশেষ চাতুর্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কমিশনের সম্মুখে নীলচাষ প্রথার সমস্ত অনিষ্টকারিতার বিবরণ ফাঁস হয়ে যাবে। তখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাতে নীলকরদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে যাবে। নীল চাষ অত পর টিকে থাকলেও সেটা সঙ্গত ভাবেই পরিচালিত হবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গ্রান্টের নীতি অনেকটা হিন্দু-পেট্রিয়ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রেরও মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নীল চাষীদের দুরবস্থার প্রতিকার হবে। তিনি এটাই চেয়েছিলেন। যে ১৩৪ জন সাক্ষীকে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা তাঁদের মধ্যে হরিশচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। অন্য কোন দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক বা প্রকাশককে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়নি। নীল বিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্রের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তা অজানা ছিল না। সরকারী আহ্বান পেয়ে হরিশ্চন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই কমিশনের সামনে হাজির হন। কমিশনের প্রেসিডেন্ট সিটন কার হরিশ্চন্দ্রকে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে হরিশের জবাবগুলিও দেওয়া হল :-

প্রঃ—আপনি কি করেন ?

উ –আমি একজন সরকারী কর্মচারী। আমি মিলিটারী অডিটর জেনারেল অফিসে কেরানীর কাজে নিযুক্ত আছি।

প্রঃ—আপনি কি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক।

উঃ – আমি ঐ কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করি না। তবে কাগজের মালিকের উপর আমার এমনি প্রভাব আছে যে আমি যে ভাবে চালাতে চাই, সেই ভাবেই কাগজটি চলে—[I do not hold myself the responsible editor of the paper, but I have sufficient influence with the proprietor to make him adopt any tune of policy I deem fit.]

প্রঃ – নীল বিদ্রোহ বেশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করার সুযোগ আপনার হয়েছে, নয় কি ?

উঃ—অবশ্যই হয়েছে।

প্রঃ – ঘটনা কালে (during the crisis) কোন নীল চাষী বা তাদের লোক আপনার কাছে এসেছে কি ?

উ – হাঁ, জমিদার ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর বহু ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন, এরা বিভিন্ন জেলা থেকে আমার পরামর্শ নেবার জন্য এসেছেন [Yes, numerous persons. zamindars, middle men and ryots have come to me for advice from several districts. They applied to me personally.]

প্র—আপনি কি জানাবেন কোন কোন সমস্যা সমাধানের পরামর্শ আপনার কাছে চাওয়া হত?

উঃ—নীল চাষ বাধ্যতামূলক হওয়ার আইন চালু হবার আগে যে সব চাষী প্রজা আমার কাছে আসত তারা আমার কাছে জানতে চাইত নীলচাষ এড়িয়ে যেতে হলে তার সর্বোত্তম উপায় কি? য়্যাক্ট চালু হওয়ার পর এরা আমার কাছে জানতে চাইত যে নীলচাষে বাধ্যতার আইনটার কি ভাবে প্রতিরোধ সম্ভব। পরবর্তী সময়ে তারা আমার কাছে এসে জানতে চাইত—দাদন নিতে তারা অনিচ্ছুক, কি ভাবে তারা এটা এড়াতে পারে, কারণ তারা পরবর্তী মরশুমে নীলচাষে মোটেই ইচ্ছুক নয়। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটলে তারা আমার কাছে এসেছে। আমি এদের পরামর্শ দিয়েছি এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে তাদের দরখাস্ত গুলিও লিখে দিয়েছি। [Before the act for the summary enforcement of indigo cultivation was passed, the point on which the majority of ryots sought my advice was how they could best avoid of sowing; after the act was passed the point on which they chiefly sought my advice, how they could best resist the coercionary measures taken under it. Laterly, the point that they have generally sought my advice on is, how they can avoid taking advances, and being made to grow indigo next year. Besides these there have been particular cases in which I have assisted them with advice and written out petitions and application to various authorities]

প্রঃ—আপনি কি জানাবেন যে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সাধারণতঃ আপনি কি ধরণের পরামর্শ দিতেন।

উঃ—আমি সর্বক্ষেত্রে তাদের অভিযোগগুলি প্রতিকারের জন্য যথাযথ ভাবে জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখে জানাতে পরামর্শ দিতাম। আমি তাদের পরামর্শ দিতাম জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিকার না পেলে তাদের উচিত হবে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন। আমি অবশ্যই তাদের কোন শান্তিভঙ্গ করা বা বে-আইনি কাজ করতে নিষেধ করতাম। আমি তাদের বুঝিয়ে দিতাম যে একাদশ আইন সাময়িক মাত্র, পরের বছর নিশ্চয়ই এমন আইন চালু হবে যা তাদের পক্ষে হানিকর হবে না। আমি নিজে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ বোধ করতাম যে আগামী বৎসরে দাদন নেওয়া বা না নেওয়া চাষীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমি সর্বদাই চাষীদের বিরোধের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়েছি। এ পরামর্শ আমি ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও

দিতাম। তবে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সাধারণতঃ তারা ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় নেওয়াই পছন্দ করত। [I invariably advised them to apply to the district authorities in the proper form for redress, and to go to the next appelate authorities, if they found no redress at the hands of the district authorities I cautioned them aginst ever committing any breach of the peace, or committing themselves in any manner by acting illegally. I explained to them that the operation of the act was temporary and the better measures would be devised next year, when I was sure they would be free to take or not to take advances. I generally advised them to seek for redress in the civil courts, a mode of proceeding which I found was much less resorted to than it should have been I mean the act for damages]

প্রঃ—ইংরাজীতে প্রকাশিত এবং বহু ইংরাজ পাঠকের পক্ষে পাঠযোগ্য হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদক রূপে আপনি কি মফঃস্বলের মানুষদের কাছ থেকে তাদের অভিযোগ সমন্বিত বহু পত্র পেতেন যাতে আপনার পরামর্শ চাওয়া হত ?

উঃ—হিন্দু-পেট্রিয়টের নামে প্রেরিত সমস্ত পত্র আমার হাতে পড়ত এবং আমিই সেগুলি প্রথমে খুলে পড়তাম। আগে যে ধরণের অভিযোগের কথা বলা হয়েছে, সেই ধরণের অভিযোগ সমন্বিত পত্রই বেশী পাওয়া যেত। [All letters addressed to the Patriot was received and opened by me, and many of them contained statements of the kind referred to in the question.]

প্রঃ—আপনি কি বলতে পারেন যে মফঃস্বল থেকে আপনি যে সব চিঠি পত্র পেতেন সেগুলির সংখ্যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কাছে যে সব চিঠি পত্র আসত তার চেয়ে সংখ্যায় অধিক হ'ত কিনা। ধরুণ আমি বাংলা 'ভাস্কর' কাগজের মত কাগজের কথা বলতে চাইছি।

উঃ—সম্ভবতঃ যে কোন বাংলা সংবাদপত্রে প্রেরিত চিঠি অপেক্ষা হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্য প্রেরিত চিঠির সংখ্যা বেশী হত। [The probability is that more letters of the kind were addressed to the editor of the Hindoo Patriot than to the editor of any vernacular journal.]

প্রঃ—আপনি কি কোন সময় নিজে নীল চাষ হয় এমন কোন বিখ্যাত অঞ্চলে গিয়েছেন ? (যেমন যশোর, কৃষ্ণনগর কিম্বা মুর্শিদাবাদ । আর একটি প্রশ্ন আপনি কি এই জায়গার বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত

উঃ—না, আমি হুগলী ও বারাসত ভিন্ন অন্য কোন জেলায় যাইনি। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে নদীয়া ও রাজশাহী জেলার বহু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত। মৈমনসিংহ জেলার কিছু ব্যক্তির সঙ্গেও আমার জানাশুনো আছে। এঁদের সঙ্গে ভবানীপুরেই আলাপ হয়েছে। [No, I have never visited any Indigo district except Barasat and Hughly. I am personally known to many inhabitants of Nuddea district, and of Rajshahi, and to some of Mymensing having made their acquaintance in Bhowanipur.]

প্রঃ—নীল বিষয়ক দাঙ্গা হাঙ্গামা কালে, এমন কোন ঘটনার কথা কি আপনি জানেন যা অনুসন্ধান করার জন্য আপনাকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উপক্রুত জেলায় প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য পাঠাতে হয়েছিল।

উঃ—বিশেষ ভাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি কখনও লোক পাঠাইনি। হিন্দু-পেট্রিয়টের যে সব সংবাদদাতা বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন আমি নীলচাষীদের পরামর্শ দিতাম, এঁদের যেন তারা আদালতে নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য 'মোক্তার' নিযুক্ত করে। [Not specially for the purpose of news, I have recommended legal agents to the Ryots to carry on these cases who have acted as correspondent of the Hindoo patriot then] আমি প্রত্যেকটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধেই উপক্রুত অঞ্চলে অবস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সঠিক ও নির্ভর যোগ্য তথ্য পেয়েছি। [I have received accurate information from time to time respecting every proceeding or occurence of any note, from persons in the district.]

হরিশ্চন্দ্রের এই উত্তর দানের সঙ্গে সঙ্গে কমিশনে। নীলকর পক্ষীয় সদস্য মিঃ ফার্গুসন হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে তিনিই এই মোক্তার নিযুক্ত করে দিতেন কিনা? এর উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেন যে তাঁর কাছ থেকেই মোক্তার ঠিক করা হত। কি শর্তে অর্থাৎ পরিশ্রমিকে মোক্তারেরা চাষীদের পক্ষ সমর্থন করবে এটাও তিনি ঠিক করে দিতেন- (The ryots took them from here. I settled for one of them the terms on which they were to act as Mookhtiyar] হরিশ্চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে তিনি চাষীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য মোক্তার নিযুক্ত করে দিতে একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জানতে পারেন যে কৃষ্ণনগর সদর ছাড়া জেলার কোন স্থানে চাষীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন মোক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ কিছু দিন আগে দামুরহুদা মহকুমার (এখন চুয়াডাঙ্গা) জীতু চ্যাটার্জী নামে এক মোক্তার একজন নীলচাষী পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নীল চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ

প্রচারের অভিযোগে লক্ষিত হয়েছেন। ["This was at time that no Mukhtyar in the district of Krishnanagar except in the sudder station could be induced to take up a Ryot's case in conse quence of a Mooktyar, Jitu Chatterjee, practising in the Dumur hooda (now Chooadanga) subdivision, having been impri soned"]. অতঃপর প্রেসিডেন্ট সীটন কার তাঁকে প্রশ্ন করেন "আপনি কি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা অস্বীকার করতে পারেন যে আপনি গ্রামে গ্রামে থানায় থানায় এমন সব বিশেষ দূত পাঠান যাদের কাজ ছিল চাষীরা কি পথে চলবে তার নির্দেশ দান।" হরিশ্চন্দ্র এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে তিনি কমিশনকে এই জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন যে এই অভিযোগ অস্বীকার করার সুযোগ তাঁরা তাঁকে দিয়েছেন। এই সময় কমিশনের অন্যতম সদস্য রেভাঃ সেল প্রশ্ন করেন যে হরিশ্চন্দ্র কি জানাবেন কতজন মোক্তার তাঁর জ্ঞাতসারে কলকাতা থেকে গিয়েছিল, তারা কোন কোন জেলায় গিয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে এই মোক্তারদের বোঝা পড়া কি ধরণের ছিল। হরিশ্চন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তিনি তিনজন মোক্তার শুধু নদীয়া জেলাতেই পাঠিয়ে ছিলেন। এই মোক্তার দের পরিশ্রমিক চাষীদেরই দিতে হবে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সময় নীলকর প্রতিনিধি ফার্গুসন হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে তিনি নীল চাষ সম্বন্ধে কোন ইস্তাহার রচনা করেছেন বা রচনায় সাহায্য করেছেন কিনা যেগুলি নদীয়া জেলার গ্রামে গ্রামে বিলি করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেন যে তিনি এসম্বন্ধে কিছু জানেন না, এমন ইস্তাহার তিনি চোখেও দেখেননি। এর পর পাদ্রী সদস্য রেভা সেল তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি ইতিপূর্বেই বলেছেন যে একাদশ আইন চালু হওয়ার পর চাষীরা এসে তাঁর পরামর্শ চাইত যে আইনে নীলচাষ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেটা প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম পন্থা কি ? তারা কি সমগ্র আইনটি প্রতিরোধ করার পরামর্শ চাইত অথবা যে ধারায় এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল সেটির প্রতিরোধ করতে ইচ্ছা জানাত ? হরিশ্চন্দ্র এর উত্তরে বলেন যে চাষীরা সাধারণ ভাবে ওই একাদশ আইন প্রয়োগের বিরোধিতার পরামর্শ চাইত। আমি চাষীদের পরামর্শ দিতাম যে ওই আইনে সরকারী কর্মচারী ও নীলকরদের হাতে যে দমন মূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শুধু তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, সমগ্র আইনটির বিরুদ্ধে লড়ার পরামর্শ আমি দিইনি। [The Ryots wished to know how they could resist the operation of the Act generally. I could only advice them how to resist the fearful amount of oppression committed under cover of the Act, by officials and planters.] রেভাঃ সেল তখন হরিশ্চন্দ্রকে বলেন কি

ধরণের দমননীতি বা অত্যাচারের কথা তিনি বোঝাতে চাইছেন। হরিশ্চন্দ্র উত্তর দেন যে অত্যাচারগুলি বহু সংখ্যক চাষীকে নীচুতলা জায়গায় সংকীর্ণ এবং আবর্জনাময় নোংরা গুদামে বন্দী করে রাখা, চাষীর বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে অনধিকার প্রবেশ, সম্পত্তি লুট ও চাষীদের মেয়েদের প্রতি অপমান। বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ নীলকরদের প্ররোচনায় এই সব অত্যাচার চাষীদের উপর চালিয়ে থাকে [Imprisonment in large numbers in low filthy narrow godowns, breaking into houses, plunder of property, insult of women by officers of police of various grades instigated by the planters.]

এই সময় মিঃ ফার্গুসন হরিশ্চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের একাদশ আইন চালু হবার পর এই ধরনের অত্যাচার মূলক ঘটনা ঘটেছে এটা কি তিনি নিজে বিশ্বাস করেন? হরিশ্চন্দ্র বলেন তিনি নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করেন। যতদূর সাধ্য ততদূর অনুসন্ধানের ফলেই তিনি চাষীদের বন্দী রাখার বিষয়টি অবগত হয়েছেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে—[I do after having made enquiries of every kind in my power as to the fact of imprisonment; it has been judicially established that cases of the kind did occur.] এই সময়ে কমিশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ সীটন কার হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে একাদশ আইন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় সরকার জেলা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়দের উপর কড়া নজর রেখেছে এবং তাদের উপর এই নির্দেশ দিয়েছে যেন এই আইনের ফাঁকে প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার বা অবিচার না হয় এই ব্যাপারটি তাঁর জানা আছে কি? হরিশ্চন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে একাদশ আইন চালু হওয়ার পর দুমাস কি তিন মাস পর্যন্ত এই আইনের অপপ্রয়োগ রোধের জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন পদক্ষেপ করে নি। তারপর থেকে অবশ্য অর্থাৎ অতি সম্প্রতি এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মনোনীত সদস্য চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন যে কমিশনের কাছে মিঃ লারমুর* এই অভিযোগ করেছেন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধের কারণ এই যে বহু নীলকরদের ভূতপূর্ব ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জমিদার

---

* Robert T. Larmour—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর মফঃস্বল অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার। নদীয়া বিভাগের বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোঃ এর মালিকানার সব নীলকুঠিগুলি দেখাশুনা ও ভার এঁর উপর ছিল। বেশীরভাগ সময় ইনি মোল্লাহাটি কুঠি থেকে কাজ কর্ম চালাতেন। মোল্লাহাটি কুঠি ইংরাজদের কাছে মূলনাথরূপে অভিহিত হত।

সদস্যেরা এই জন্য নীলকরদের সম্পর্কে ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় হরিশ্চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরূপে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কি? এই প্রশ্নের জবাবে হরিশ্চন্দ্র বলেন যে মিঃ লারমুরের মন্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়। এসোসিয়েশনের সদস্যদের মতে রাজনৈতিক মত পার্থক্য আছে। বিভিন্ন মতের মানুষ এই এসোসিয়েশনের সদস্য। শুধু জমিদারেরাই এর সদস্য নন। এসোসিয়েশনের এমন বহু সদস্য আছেন যাঁরা নীলকরদের সঙ্গে বন্ধুতা সম্পন্ন। অনেকে আছেন যাঁরা নীলকরদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে এসোসিয়েশন লেঃ গভর্ণরের কাছে এই পদ পূরণের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে যে আবেদন করেছিল তার একটি অনুলিপি তিনি পেশ করতে চান। অতঃপর হরিশ্চন্দ্র বি আই এসোসিয়েশনের এই আবেদনটি পেশ করেন। এটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট লেখা হয়েছিল। সর্বশেষে কমিশনের সভাপতি সীটান কার হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে—নীল চাষ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুকাল ধরে যে অশান্তি চলছে এর সঙ্গে বহু দেশীয় মানুষের শুভাশুভ জড়িত। এই অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র এই সমস্যার নানা দিক নিয়ে কোন সুচিন্তিত অভিমত পোষণ এবং তা প্রকাশ করা তাঁর কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেন, "আমি অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগ দিয়ে নীলচাষ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখেছি এবং এই কথা আমি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারি যে বর্তমানে যে প্রথায় নীলচাষ করা হয়ে থাকে তা সব দিক দিয়ে নীল চাষীদের পক্ষে হানিকর। এই প্রথার প্রতিটি স্তরেই চাষী মার খেয়ে থাকে। এই বিষয়ে আমার অভিমত সুচিন্তিত ও তা আমার মনে দৃঢ়বদ্ধ। আমার এই ধারণা প্রচার করার যে কোন সুযোগ আমি কাজে লাগিয়েছি। একটি বিষয়ে মাত্র আমি কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি। সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতে নীলচাষী ও নীলকর সম্পর্ক কি দাঁড়াবে।

[I have studied the question with care, and have no doubt in stating that the present system of indigo cultivation is injurious to the ryots in every way, on all points arising out of the question. I have formed definite opinion which I have taken every opportunity to express. On one point only, I have not been able to form an opinion, viz. what are to be the future relations between ryot and planters.]*

হরিশ্চন্দ্র নীল কমিশনের সামনে নির্ভীক ভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন,

* Indigo Commission Report pp 45-47, (3871—86), 1861 and Parliamentry Papers, Vol 44, pp-266-7, 1861.

তবে কমিশনের সামনে তিনি নীল বিদ্রোহে তাঁর নিজের ভূমিকাকে সঙ্গত কারণেই বড় করে দেখাতে চাননি। তিনি কমিশনকে একথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেননি যে নীল চাষীরা তাঁর মত বাইরের লোকের প্ররোচনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। নীলকরদের মুখপাত্র ইংলিশম্যান ও বেঙ্গল হরকরার মতে নীল চাষীদের কোন অভিযোগ ছিল না, হরিশ্চন্দ্রের মত কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্র লোকের প্ররোচনায় ও আনুকূল্যেই নীলচাষীরা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছে। হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষ্য থেকে আর একটি তথ্য প্রকাশ পায় যে নীল বিদ্রোহে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কোন অংশ গ্রহণ করেনি। এই সংস্থার বহু সদস্য নীলকরদের সপক্ষে ছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন সদস্য হরিশ্চন্দ্রের মত নীলচাষীদের সমর্থক ছিলেন, তবে এই সমর্থন পরোক্ষ ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীল চাষীদের সমর্থনে নদীয়া জেলায় মোক্তার পাঠিয়েছিলেন বলে নীলকরদের তরফ থেকে একটি অভিযোগ এসেছিল, নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রেরিত একটি চিঠিতে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল।* নীল কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবৃতি থেকে এটি জানা যায়। বস্তুতঃ এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে দুটি গোষ্ঠী বা উপদল গড়ে উঠেছিল-জমিদার গোষ্ঠী এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি শেষোক্ত দলভুক্ত ছিলেন।

নীল কমিশন চলা কালে হরিশ্চন্দ্র একাদশ আইন অপব্যবহারের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—১৭ এপ্রিল ম্যাকলীন নামে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নদীয়া জেলার লোকনাথপুর নীলসংস্থার ম্যানেজার মিয়ার্স এর প্ররোচনায় একটি পরোয়ানা জারী করেন যে, জমিতে একবার নীলচাষ হয়েছে সেখানে ধান চাষ করা চলবে না। ম্যাকলীন তাঁর অধীন এক বড় দারোগাকে মিয়ার্সের নীলকুঠি এলাকায় ধান চাষ বন্ধ করার কাজে নিয়োগ করেন। নীলকুঠির গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে এই বাঙালী দারোগা চাষীদের গোমস্তার নির্দেশিত জমিগুলিতে ধান চাষ করতে নিষেধ করে। ধান চাষ নিষিদ্ধ হলে চাষী নীল চাষে বাধ্য হবে মিয়ার্সের মনে এই আশা ছিল। দারোগার নির্দেশ উপেক্ষা করে চাষীরা ধান চাষ করেছিল। নীলকরের লোকজন এই ধান চারার ক্ষতি করতে পারে এই সংবাদ পেয়ে নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল সমগ্র জেলায় কার্যকর হবে এমন এক পরোয়ানা জারী করেন যে যেখানে ধানচাষ হয়েছে সেগুলির ক্ষতি করে যেন নীলচাষ করানোর চেষ্টা না হয়। যে হেতু দারোগা চাষীদের

* Indigo Commission Report (A 2820-2)-1861

ধান চাষ করতে বারণ করেছিল সেই দারোগাকেই আবার হার্শেলের পরোয়ানার কথা চাষীদের জানিয়ে দিতে হয়েছিল। চাষীরা এরপর ধান চাষ করে তাদের পেট ভরাতে পেরেছিল। এই ঘটনায় নীলকরেরা ক্ষুব্ধ হয়ে হার্শেলকে নদীয়া জেলা শাসকের পদ থেকে অপসারণের জন্য লেঃ গভর্ণরের নিকট দাবী জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য লেঃ গভর্ণর এই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। যশোহর জেলায় নীলকরেরা যে সব জমিতে আগে নীলচাষ হত সেই সব জমিতে ধান চাষে বাধা দিয়েছিল। যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মলোনি এ বিষয়ে নীলকরদের সাহায্য করা সত্বেও চাষীদের দ্বারা নীল চাষ করানো সম্ভব হয়নি। মলোনীর সহকারী স্কিনার যশোর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে কালোপোল থানায় এক কৃষক সমাবেশ ডেকে নূতন নীল আইনটি কৃষকদের কাছে অপ ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেন যে তাদের পক্ষে নীলচাষ বাধ্যতামূলক। সমবেত ১০,০০০ চাষী সমস্বরে নীলচাষে অস্বীকৃতি জানায়। তখন স্কিনার চাষীদের শায়েস্তা করার জন্য মাতব্বর চাষীদের গ্রেপ্তার ও ভীতি প্রদর্শন নীতি অবলম্বন করেছিল। পরের দিন স্কিনারের নির্দেশে দারোগারা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়ে একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে ধরে স্কিনারের কাছে নিয়ে আসে। মাতব্বর চাষীদের বলা হয়েছিল যে সাহেব তাঁদের সঙ্গে একটা বৈঠকে বসে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান। এমনি ৪৯ জন মাতব্বর চাষীকে ধরে যশোর জেলে ছমাসের জন্য বন্দী করা হয়। এদের তরফ থেকে লেঃ গভর্ণরের কাছে এক আবেদন করা হয়। এই আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল যে স্কিনার সর্বদা নীলকর মিয়ার্সের কথামত প্রজাদের উপর অত্যাচার করে। মাতব্বর চাষীদের যশোর জেলে নিয়ে যাবার সময় বহু চাষী একত্র হয়ে বন্দীদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সশস্ত্র ম্যাজিস্ট্রেটের ও পুলিশের প্রতিরোধের সামনে তারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায়। স্কিনারের আদেশে স্থানীয় দারোগার উপর আদেশ দেওয়া হয় যে এই বন্দী ছিনতাই দলে যে সব নেতা ছিল তাদেরও যেন ধরা হয়। চারদিন পর ২১ জন লোককে ধরে নিয়ে আসা হয়, এর মধ্যে চারজন ছিল শুধু মাত্র দর্শক। সতের জনকে বিচারে বন্দী করা হয় তবে একজন বাদে বাকী সব বন্দীরা যশোরের জেলা জজের কাছে আপীল করে মুক্তি পেয়েছিল (হিন্দু-পেট্রিয়ট, ২৬ মে ও ৪ জুলাই, ১৮৬০)।

হিন্দু পেট্রিয়টে স্কিনারের আর একটি কুকীর্তির কথা হরিশ্চন্দ্র ফাঁস করে দেন। সংবাদদাতা ছিলেন—শিশিরকুমার ঘোষ। ঘটনাটি ছিল এই যে, ১৮৬০ এর মার্চ মাসে নীলকর মিয়ার্সের একজন কর্মচারী তার কাছে নালিশ করে যে কয়েকজন চাষীর সঙ্গে সে নীল চাষ বিষয়ে আলোচনা করছিল এমন সময় চাষীরা তাকে গালাগালি দেয় এবং মারতে আসে। মিয়ার্স এটা স্কিনারকে জানানো মাত্র তার আদেশে ১৮ জন চাষীকে গ্রেপ্তার করে বেশ কয়েকদিন

আটকে রাখা হয়। বিচার করার সময় নীলকর মিয়ার্স-এর যে কর্মচারী অভিযোগ এনেছিল, তাকে ডাকা হয়নি। চাষীদের নামে বে-আইনি সমাবেশ ও নীল চাষে বাধা দানের অভিযোগ আনা হয়, তার পর তাদের কুড়ি টাকা জরিমানা ও তিন সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় স্কিনারের পরিবর্তে মলোনি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসে বন্দী চাষীদের উপর নীল চাষের জন্য চাপ দিতে থাকেন। হিন্দু পেট্রিয়টের মাধ্যমে এই ঘটনা অবগত হয়ে লেঃ গভর্ণর এ বিষয়ে মলোনি ও স্কিনারের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। মলোনি এই ঘটনা ঘটার পর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন এজন্য তাঁকে ভৎর্সনা করে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে স্কিনারকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারী ফাইলে লেঃ গভর্ণর মন্তব্য করেন যে নীল চাষের জেলাগুলির ম্যাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা সচরাচর কি ধরণের সুবিচার করা হয় এই ঘটনাটি তারই দৃষ্টান্ত [**"This case throws a strong light on the habitual action of the magisterial courts in the indigo districts injustice"**]

সরকারী ফাইল থেকে উদ্ধৃত করে লেঃ গভর্ণরের এই মন্তব্যটিও হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয় (১০.১০.১৮৬০)। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বরের হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র মীরগঞ্জ নীলকুঠির জন ড্রাইভার নামক এক নীলকর-এর বিরুদ্ধে আনীত একটি খুনের মামলার বিবরণ প্রকাশ করেন। খুন প্রমাণিত হলেও দক্ষ ইংরাজ ব্যারিস্টারের বাক্-চাতুরিতে নীলকর নিজে খুনের অভিযোগ থেকে অব্যহতি পেয়েছিল। * এই বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ছোটলাট পিটর গ্রাণ্টের নামে জন ড্রাইভার একটি মানহানির মামলা এনেছিল। পিটর-গ্রাণ্ট মামলায় পরাজিত হন। তবে নামমাত্র ১্ জরিমানা তাঁর দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়েছিল।

আইনের অপব্যবহার করে যে সব ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের স্বার্থে নিজেদের নিয়োগ করেন হরিশ্চন্দ্র তাদের ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন-নোংরা রাজকর্মচারীগণ নীলকরদের কাছে নিজেদের বেশ্যার মত বিক্রি করে দিয়েছে। নীলচাষ প্রশ্নটি একদিন আর থাকবে না। তখন এদের যাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, মাইনে মঞ্জুর করার জন্য যাদের কাছে ধর্ণা দিতে হবে-তারা তাদের বর্তমান প্রভুদের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত মানুষ হবেন [**...The wretched officials who have prostituted themselves on this occasion will find that long after the ryots and planters shall have settled their accounts, salary bills will wait**

* : হিন্দু পেট্রিয়টে যশোর জেলার সংবাদগুলি শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রেরিত হত। ১৮৬০-এর পেট্রিয়টে শিশিরকুমার প্রেরিত ২২টি পত্র প্রকাশিত হয়, এইগুলি M.L.L অথবা A Native নামে প্রকাশিত হত। এই পত্রগুলি যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (**Peasant Revolution in Bengal**)—**J. L. Bengal, Calcutta, 1953.**

the fiat of sterner enquiries than those who are now teaching honesty to the planters—H. P. 26. 5. 1860]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লেঃ গভর্ণর গ্রাণ্ট কলিকাতা থেকে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে যান। তাঁর স্টিমার যখন কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি দেখতে পান যে নদীর দুই তীরে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে যে সরকার যেন তাদের নীল চাষ করতে বাধ্য না করেন। গ্রাণ্ট এত লোকের কাতর আবেদনে ব্যথিত হয়ে তাঁর স্টিমার থামিয়ে কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। এরা তাঁর কাছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ পত্র পেশ করেছিল। গ্রাণ্ট অভিযোগগুলি নিজে তদন্ত করবেন এই আশ্বাস দেওয়া সত্বেও বহু লোক তাঁর স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছিল। কয়েকদিন পর গ্রাণ্ট কলকাতায় ফেরার পথে দেখতে পান যে নদীর দুই তীরে এবারও হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে। এরা করজোড়ে গ্রাণ্টের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেছিল। জনতা অবশ্য সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই তাদের প্রার্থনা জানিয়েছিল। গ্রাণ্ট, জনতার শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর কানে উঠলে তিনি ভীত হয়ে ভারত সচিব উড্‌কে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে "সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লী হস্তচ্যুত হওয়ার সংবাদের চেয়েও ঘটনাটি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। যে লোকগুলি এত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এইভাবে প্রতিকার চাইছে, এরা ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল ও অসহায় হতে পারে কিন্তু এদের সঙ্ঘবদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা দরকার।……ঐ দিন থেকে আমি বুঝে নিয়েছি যে কোন নির্বোধ নীলকর ক্রুদ্ধ হয়ে বা ভয় পেয়ে এই ধরনের জনতার উদ্দেশ্যে যদি একটি গুলি ছোঁড়ে তবে বঙ্গ দেশের প্রতিটি নীলকুঠি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হতে পারে।" * সিরাজগঞ্জ থেকে কলকাতায় ফিরে গ্রাণ্ট ক্যানিং কে একটা ইস্তাহার জারী করে প্রজাদের আশ্বস্ত করার পরামর্শ দেন। ক্যানিং এর সম্মতি পেয়ে গ্রাণ্ট, একটি ইস্তাহার লিখে দেন যার মর্ম হল এই যে কোন চাষীকে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হবে না, এবং বিরোধের ক্ষেত্রে আইন মত কাজ হবে। ক্যানিং এই মুসাবিদায় আরও দুটি বাক্য জুড়ে দেন যার মর্ম হল এই যে গভর্ণমেণ্ট এই আশা প্রকাশ করেন যে চাষীরা নীল চাষে সহযোগিতা করবে ও ইচ্ছুক চাষীকে নীলচাষে বাধা দেওয়া হবে না। ক্যানিং এর সঙ্গে গ্রাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল এই যে গ্রাণ্টের মতে নীলচাষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, চাষীদের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রথা দেশের বিপদ ডেকে আনবে। ক্যানিং এর মত ছিল এই যে অভিজ্ঞতা থেকে নীলকরেরা চাষী-

* Judicial Proceedings, pp. 237. Sept 1860.

দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেই নীলচাষ সমৃদ্ধতর হবে এবং তাতে ব্রিটিশের জাতীয় স্বার্থ বজায় থাকবে। গ্রাণ্ট ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং একাদশ আইনে নীলকরদের যে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই জন্য নীলকরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে একাধিক বার গভর্ণর জেনারেলের কাছে তাঁর নামে নালিশও জানিয়েছিলেন। নীলকরদের আবেদনে গভর্ণমেণ্টের জবাবগুলি ক্যানিং এর নামে স্বাক্ষরিত হলেও ক্যানিং সেগুলি গ্রাণ্টকে দিয়েই লিখিয়ে নিতেন। হরিশ্চন্দ্র গ্রাণ্টের নীতি মোটামুটি সমর্থন করলেও যখনই গ্রাণ্টের কোন শৈথিল্য দেখতেন তখনই তার সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। গ্রাণ্ট নীল চাষ সংক্রান্ত বিচারের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীদের যে শাস্তি দিতেন হরিশ্চন্দ্র সর্বক্ষেত্রে সে গুলিকে পর্যাপ্ত মনে করতেন না, এই শাস্তিকে তিনি অনেক সময় গ্রাণ্টের দুর্বলতা বা মৃদুতা বলে সমালোচনা করতেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে নীলকরেরা লর্ড ক্যানিং এর নিকট এই মর্মে একটি আবেদন পাঠিয়েছিল যে ছোটলাট গ্রাণ্টকে নদীয়া জেলায় একাদশ আইনের প্রয়োগে বাধা দান থেকে নিবৃত্ত করা হক। এই জেলায় নীলচুক্তি ভঙ্গকারীদের যাতে সাজা না হয় গ্রাণ্ট তাঁর অধস্তন জেলা কর্তৃপক্ষকে তার জন্য চাপ দিচ্ছেন। গ্রাণ্ট এর উত্তরে ক্যানিং কে জানান যে বহু বর্ষ পরে নদীয়া জেলায় শান্তি বিরাজ করছে। এখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে, অনধিকার প্রবেশ, বল-পূর্বক ফসল কাটা, গরু ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্যের জমিতে চাষ, গাছ কেটে নেওয়া, ঘর বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া, চাষী-দের বল পূর্বক গুদাম ঘরে বন্দী করে রাখা এ সব বন্ধ হয়েছে। এ সব ব্যাপার নীলকরদের কাছে নতুন ব্যাপার ঠেকেছে। এই সুস্থ পরিবেশের জন্য বঙ্গীয় সরকারকে যদি অভিযুক্ত করা হয় তবে তাঁর কিছু বলার নেই। গ্রাণ্ট আরও জানান যে একাদশ আইনে নীলকরদের এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে 'দাদন' নিয়ে চাষী নীলচাষ না করলে আদালতে তার সাজা হবে। নীলকরেরা আদালতে চাষীদের নামে চুক্তি ভঙ্গের যে কাগজ পত্র পেশ করেছিল বিচারকালে দেখা গিয়েছে তাদের অধিকাংশ জাল। কাজেই আদালতের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীলকরদের বিপক্ষে গিয়েছে। গ্রাণ্ট তাঁর জবাবে বিশেষ জোর দিয়ে লেখেন যে নীলকর বনাম নীল চাষী বিরোধ মালিক-শ্রমিক বিরোধের পর্যায়ে কখনও ফেলা যায় না। নীলকর নীল ব্যবসায়ে টাকা খাটায় অতএব সে একজন মালিক (Capitalist) অপর দিকে নীলচাষীও একজন মালিক, কারণ জমি তার নিজস্ব, সে ভাড়াটিয়া শ্রমিক নয় যে তাকে দিয়ে যা খুশী তাই করাতে পারা যায়। বলা বাহুল্য গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে অতএব আর গ্রাণ্টের উপর কোন কথা বলা সম্ভব হয়নি। মুখের মত জবাবে নীলকরেরা খুবই ক্ষুদ্ধ হয়ে

নানাভাবে গ্রাণ্টকে উত্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। সংবাদপত্রে ও প্রচার পুস্তিকা মারফৎ তাঁর উপর আক্রমণও চলেছিল।

হরিশ্চন্দ্র এই বিষয়টি নিয়ে নিম্নলিখিত মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন "এই বিরোধ এবং লেঃ গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্য দিয়ে নীলকরেরা প্রমাণ করতে চাইছে, যে দেশের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে উপক্রুত। জনসাধারণের মনে এরা ব্যাপক হাঙ্গামা ও বিপ্লবের ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টা করছে। জনসাধারণকে এরা বোঝাতে চাইছে যে তাদের উদ্দেশ্য হল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা। এই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তাদের প্রয়াস। এদের উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে, বহু লোকের মনে এরা এই ধারণা জন্মে দিতে পেরেছে যে নীলচাষীদের কার্যকলাপ দেশের শান্তিভঙ্গ ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করছে। যদি পরিস্থিতি সত্যই এমন হয়ে থাকে তথাপিও লেঃ গভর্ণরকে দোষ দেওয়া যেত না। কারণ তাঁর পূর্বতন শাসকের (হ্যালিডে) কাল থেকেই এই সব ব্যাপার চলে আসছে, আর নীলকর সাহেবরা এই অবস্থা থেকে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। লেঃ গভর্ণর নীলকরদের অভিযোগের জবাবে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন '......বর্তমানে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা নেই, অন্যায় ভাবে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, গরু ছাগল চুরি হয় না, অপরের জমিতে বলপূর্বক চাষ নেই, গাছ কেটে নেওয়া নেই, কেউ কারো বাড়ি ভেঙ্গে দিতে পারে না, চাষীকে আর চাবুক মারা হয় না। চাষীকে নীলকুঠির গুদাম ঘরে আটকে রাখার ঘটনা আর শোনা যায় না। মানুষ 'গুম' হয়ে যাওয়া ও বন্ধ হয়েছে। এমনি একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেশে একটি নূতন ব্যাপার। এই পরিস্থিতির জন্য গভর্ণমেণ্টকে যদি দায়ী করা হয়, তবে গভর্ণমেণ্টকে এই দায় স্বীকার করতে হবে ....'

গ্রাণ্টের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশ্চন্দ্র লেখেন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নীলকরদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। নীলকরেরা এই পরিস্থিতিকে সন্দেহ জনক করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ["Great object of the planters through these disputes, and especially in their petition against the Lt. Governor, has been to describe the country as in an extremely disturbed state, to alarm the public mind with visions of mob violence and insurrection and to endeavour to enlist public sympathy in their favour by representing their cause as the cause of law and order. To a certain extent they have succeeded in spreading these delusions, and impressing people with the belief that the ryots' conduct is endangering the pubic peace and material interests of great

value. Even if this had actually been the case, the Lt. Gov. could hardly have been to blame. He can not be held responsible for the previous maladministration from which the petitioner's themselves had derived the largest share of benefit. The Lt. Governor gives his own description of the present condition of the indigo district 'there are no affairs, no forcible entries and unlawful carrying off of crops and cattle, no ploughing up of other men's land, no destruction of trees and houses, no unlawful floggings and confinement in godowns now reported. Even the offence of kidnapping ryots seems to be arrested. ...This healthy state of things is novel indeed and if Govt. is accused because it is novel...'

It will be difficult to make the planters acknowledge the introduction of this novelty and certainly there is nothing wanting on their part to make its existence as doubtful as possible" Lt. Governor and the Indigo Crisis L, H. P. 19. 9. 1860]

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নীল কমিশনের রিপোর্টটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সরকারী ভাবে প্রকাশিত হয়। কমিশনারদের প্রতিবেদন, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও পরিশিষ্ট সমন্বিত ৭৬২ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে তৎকালে নীলচাষ সংক্রান্ত সকল তথ্যই পাওয়া যায়। নীল কমিশনের তিন সদস্য মন্তব্য ও পরামর্শ সহ এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই তিন সদস্য ছিলেন সিটন কার, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রেভা: সেল। অন্যতম সদস্য রিচার্ড টেম্পল সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের মন্তব্য ও পরামর্শের সঙ্গে মতৈক্য জানিয়ে একটি বিষয়ে পৃথক মন্তব্য (note of dissent) প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে নীলচাষ বাঙলায় কমে গেলে, ধান চাষ বাড়বে এতে চালের দর কমে যাবে। নীলকরদের তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং চাষীদের স্বার্থও অবশ্যই দেখতে হবে। সরকারকে পুলিশের কাজকর্মের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের একাদশ আইনকে স্থায়ী করতে হবে। নীলচুক্তি গুলি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে হবে, এবং চুক্তিভঙ্গকারীকে সাজা দিতে হবে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশম আইনে (Act X) জমিদারদের যে অধিকার খর্ব করা হয়েছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। নীলচাষ নিয়ে যেসব জায়গায় উপদ্রবের সম্ভাবনা সেখানে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করতে হবে। নীলচাষ সংক্রান্ত ব্যাপারটি বিশেষ একজন কমিশনারের উপর ন্যস্ত করতে হবে ইত্যাদি। নীলকর প্রতিনিধি ফার্গুসন রিচার্ড টেম্পলের

এই মন্তব্যের সহিতএকমত হয়ে এতে স্বাক্ষর করেন। তবে এই সঙ্গে তিনি একটি মন্তব্য যোগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রতিবেদনটির সার্বিক বিরোধিতা জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদনটি সরকারী স্তরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই এর কিছু কিছু অংশ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রতিবেদনের মর্ম হিন্দু পেট্রিয়টে উদ্ধৃত হয়েছিল। এর মর্মার্থ এইরূপ ছিল—"আমরা পরিষ্কার ভাবে নীল-চাষের ক্ষেত্রে রায়ত বা চাষীর অবস্থা জানিয়ে দিতে চাই। আমরা দেখেছি যে চাষীর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই, তাকে এমন একটা চাষে (নীলচাষ) বাধ্য করা হয় যাতে পর্যাপ্ত লাভ হয় না। এই জন্য চাষী এই চাষ মোটেই পছন্দ করে না, বড় জোর বলা যায় যে চাষী এটা কোনরকমে 'বরদাস্ত' করে মাত্র। নীল চাষ প্রথার মধ্যে বহু গলদ আছে, এই গলদ অন্তর্নিহিত, এর জন্য চাষী ও নীলকর শুধু পরস্পরকেই দায়ী করলেও আসলে কথা হচ্ছে এই যে চাষী তার শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। চাষীর জমি আছে, এই জন্য নীলকরের পক্ষে চাষীর সাহায্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে, আর এই সহায়তার জন্য চাষীর উপর চাপ দেওয়া হয়।……

চাষীদের উপর নানাবিধ অত্যাচারের কতকগুলি কাহিনী কমিশন কর্তৃক ঘটনা রূপে স্বীকৃত হয়। মোটামুটি কমিশনের রিপোর্টে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে নীল সংক্রান্ত সমস্ত গণ্ডগোলের মূল কথা হ'ল এই যে চাষীদের তাদের শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।" ("All the defects of the system....may be traced originally to one bare fact, the want of adequate rcmuneration")

কমিশনের রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশিত হয় তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কমিশন চাষীদের উপর নির্যাতনের কথা স্বীকার করলেও বহু নির্যাতনের কোন উল্লেখ করেননি। নীলকরের লোকজন চাষীদের যে ভাবে শোষণ করে তার উল্লেখও রিপোর্টে নেই। এই শোষণকারীদের মধ্যে নীলকরের দেওয়ান গোমস্তারাও আছে, চাষী যা কিছু সামান্য কিছু টাকা পায়, এরা তার ভাগ নেয়, এরা আবার বেনামী নীলের ব্যবসাও করে, এর উপর আছে আমিন ও তাগিদদারের বখরা। তবে মন্দের ভাল এই যে কমিশনের সদস্যেরা আসল কথাটা স্বীকার করেছেন যে চাষী স্বেচ্ছায় নীল চাষ করে না। নীল চাষে তার শুধু ক্ষতিই হয়। জনসাধারণের সহানুভূতি এবং সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশে এই মন্তব্য যথেষ্ট রূপে গণ্য হওয়া উচিত। ["The commissioners indeed, take no notice of minor forms of oppression to which the ryot is liable, the endless exactions by assistants and their lotterers, the

dewans and the gomasthas who have their benami shares in the indigo brought in, the Amins and Tagidgirs. The commissioners rest contended with establishing and advancing the one main point namely, that indigo ryot is not a free agent, and that his labours in the indigo field impoverish him. That is enough to secure public sympathy and government action" – The Finding—H.P. 12.9.1860]

এর দুদিন আগে হরিশ্চন্দ্র কমিশনে দুই সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্য কার্গুসন ও রিচার্ড টেম্পলের মতামতের সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। এর মর্ম এইরূপ—আমরা আশ্চর্য বোধ করছি যে এই দুই সদস্য (অস্থায়ী) একাদশ আইনে ম্যাজিস্ট্রেটদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা বজায় রাখতে চান, যদিও ম্যাজিস্ট্রেটরা এই কাজে অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নীলচাষ সংক্রান্ত সকল গণ্ডগোলের মূল আগামী দাদন ব্যবস্থা। এটা নিষিদ্ধ হলেই আর কোন সমস্যা থাকে না কিন্তু এরা এটা হতে দেবেন না, এটা এদেশের একটা প্রথা, আগাম টাকা না দিলে এদেশে কারবার চলে না, এটা এদের যুক্তি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আগাম টাকা নিয়ে চাষীর কোন লাভ হয় না। বর্তমানে নীলচাষের দাদন প্রথার কল্যাণে চাষীর গ্রাসাচ্ছাদন ও জোটে না। ["We are really struck with wonder to find the minority still insisting upon permanently investing the magistrates with a power for which they have proved themselves to be eminently unfit. All these discussions would vanish into air if the practice of advances be discontinued. Against this, the minority have nothing else to urge than that by the custom of the country nothing can be done without cash advances which is notoriously untrue in cases where the party entering into contract gains anything more than the ordinary profit, although it is invariably resorted to in case where he can hardly acquire sustenanee, as in the present system of indigo cultivation.—The Minority of the Indigo Commission. H. P. 10.9.60.]

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর লেঃ গভর্ণর এই রিপোর্টের উপর তাঁর একটি নিজস্ব মন্তব্য (minute) রচনা করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। এই মন্তব্যে তিনি লেখেন "যে প্রদেশে নীলচাষ সম্পর্কিত এই সব অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হতেপারেস্পষ্টবোঝা যায় সে দেশের প্রচলিত আইন

দুর্বলকে রক্ষা করে না। এই অবস্থা প্রশাসনের পক্ষে যথেষ্ট কলঙ্কজনক"। ("A country where—these offences are committed habitually and for the most part with inpunity, is a country in which the law affords the weak no protection—the fact is a disgrace to the administration.

...The root of the whole question is the struggle to make ryots grow indigo plant, without paying them price for it... These ryots are not Carolina slaves, but the free yeomanry of the country....and the virtual owners of greater part of the land").*

লেঃ গভর্নর গ্রান্টের এই 'মিনিট'টি পড়ে তদানীন্তন ভারত সচিব সার চার্লস উড্‌ গ্রান্টকে একটি চিঠিতে জানান যে তাঁর 'মিনিট' ও কমিশনের রিপোর্ট একটি সুচিন্তিত দলিল (document)। নীল চাষী ও নীলকর সম্পর্কটি যে কত নিন্দনীয় তা এই দলিলে প্রমাণিত হয়েছে। এই কুপ্রথার সংস্কার করতেই হবে, এতে বহু নীলকরের ক্ষতি হবে, আমি এদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত। তবে এদের ক্ষতি হবে বলে এই কুপ্রথা চলতে দেওয়া অসম্ভব।**

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে হরিশ্চন্দ্র নীল কমিশনের একটি বাংলা অনুবাদ নীল চাষীদের অবগতির জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রেস থেকে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। (হিঃ পেঃ ১৬ ৯ ১৮৬০)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বাধ্যতামূলক নীলচাষ (অর্থাৎ একাদশ আইন) প্রত্যাহৃত হয়। এই আইনের বলে নীলচাষ কিছু হয়েছিল, তবে অন্য বছরের তুলনায় নয়। যারা দাদন নিতে অস্বীকার করেছিল এবং যাদের দাদন নেওয়া প্রমাণিত হয়নি এমন চাষীরা ধান এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ করতে পেরেছিল। চাষীরা বহুদিন পর নিজের খুসীমত চাষ করতে পেয়ে খুসী হয়ে কলকাতার হরিশবাবুকে স্মরণ করে গান বেঁধেছিল—"ভাসছে মন মনের হরিষে, আগে লুটে খেত এক হরি সে। এখন বাঁচালে এক হরিশে। বুনে বুনে নীল, জমি হত খিল (এখন) হতেছে তাই অড়র, কলাই সরিষে"। 'আগে লুটে খেত এক হরি সে' এই পংক্তিতে ব্যবহৃত 'হরিসে' সম্ভবতঃ নীলকরকে ব্যঙ্গ করে হরি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা হয়েছে। ঐটি হরি বা Harris নামযুক্ত কোন বিশেষ নীলকুঠির ইংরাজ কর্মচারী বা বাঙালী গোমস্তার প্রতিও প্রযোজ্য হয়ে থাকতে পারে। নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর নীলকরদের

* Bengal Under the Lt. Governors (1)—Buckland, pp 238-71

** Halifax Papers, Feb 4, 1861 (Quoted in the 'Blue Mutiny, OP. Cit. P 145.)

মেরুদণ্ড ভেঙে যায় বলা যেতে পারে। নীলকরদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টারস্ এসোসিয়েশনের' নামটি বদলে এর নূতন নামকরণ করতে হয়েছিল—'ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ য়্যাণ্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশন'। শিক্ষিত ও উদার মনোভাবসম্পন্ন ইংরাজেরা ভারতে এবং ইংলণ্ডে নীলকরদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে এদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছিল। নীল বিদ্রোহ কি পরিমাণে নীলকরদের বিব্রত ও অপদস্থ করতে সমর্থ হয়েছিল তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জেমস ফার্লঙ্গ ২৩টি নীলকুঠির সর্বময় কর্তারূপে প্রায় তিন লক্ষ চাষীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। মোল্লাহাটি বা মূলনাথে এঁর সদর দপ্তর ও বাসস্থান ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইনি হিলস কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে আসেন। নীলবিদ্রোহকালে নদীয়া জেলা এর কর্মকেন্দ্র ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পদত্যাগ করে এঁকে বিহারের চম্পারণ জেলায় পলায়ন করতে হয়েছিল। নীল কমিশনের রিপোর্টে নীলচাষ প্রথার অনর্থকর দিকটি উদ্ঘাটিত হলেও কমিশন বাঙলা থেকে (তখনকার দিনের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোয়ার বেঙ্গল) নীলচাষ যাতে উঠে যায় এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেনি। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে কিছু ইংরাজ নীলকরদের উপস্থিতি রাজনৈতিক কারণে আবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষও বাঙলা মুলুকে নীলচাষ উঠিয়ে দিতে চাননি। কর্তৃপক্ষের এই অভিমত গ্রাণ্টকে মেনে নিতে হয়েছিল। অতঃপর গ্রাণ্ট তাঁর শাসনাধীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে নীলচাষ বজায় রাখা এবং তারই সঙ্গে প্রজাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখা এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কতকগুলি প্রশাসনিক পরিবর্তন করেন—এর মধ্যে প্রধান ব্যাপার ছিল যে নীলচুক্তি বা দাদন নেওয়া বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে রেজেষ্ট্রি করিয়ে নিতে হবে, এর উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের জাল বা ভুয়ো চুক্তিপত্রের জোরে চাষীকে নীলচাষে বাধ্য হওয়া থেকে মুক্তি দান। চাষীরা অভিযোগের ক্ষেত্রে যাতে সুবিচার পায় তার জন্য অনেকগুলি নতুন মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। গ্রামাঞ্চলের চাষীদের যাতে বিচারার্থী রূপে ত্রিশ মাইলের অধিক না যেতে হয় তার জন্য প্রতি ত্রিশ মাইল অন্তর অন্তর এক বা একাধিক বিচারালয় বা কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। জমি জমা সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য মুন্সেফি কোর্টের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছিল। এইসব আদালতে শুধু মাত্র দেশীয় বিচারক (মুন্সেফ) নিয়োগেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাধ্যতা মূলক নীলচাষ আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছু নীলকর তাদের অত্যাচার সংযত করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছু উদ্ধত স্বভাব নীলকর যারা নিজেদের রাজার জাত মনে করত তারা প্রজা পীড়ণের এক নূতন কৌশল অবলম্বন করেছিল। বহু নীল সংস্থা (concern) বা বিশেষ বিশেষ নীলকর জমিদারি

কিনেছিল, অনেকে দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পত্তনিদার হয়ে বসেছিল। নীলকরের জমিদারিতে যে চাষ হত তাকে বলা হত—এলাকা চাষ। নিজ অধিকৃত জমিতেও নীলকরেরা নগদ পয়সা দিয়ে মজুর নিযুক্ত করে চাষ করাত—একে বলা হত নিজাবাদ। একাদশ আইন প্রত্যাহারের পর অপরের জমিতে অর্থাৎ চাষীর নিজস্ব জমিতে তথাকথিত অগ্রিম দাদন দিয়ে চাষীকে দিয়ে নীলচাষ করানো যখন অসম্ভব হয়ে উঠল তখন জমিদার নীলকরেরা তাদের প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। এই প্রজারাও নীলচাষ করতে অস্বীকার করায় তারা বেশ অসুবিধায় পড়েছিল। এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে এরা চাষী প্রজাদের হায়রাণ করা তথা নীলচাষে বাধ্য করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছিল সেটি হল তাদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ। জমিদারি এলাকা থেকে নীলচাষে অনিচ্ছুক প্রজাদের উচ্ছেদ নীতি কোন কোন এলাকায় নীল কমিশন বসার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যশোর জেলায় নীলকরদের জমিদারি এলাকায় নীল চাষে অস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে খাজনা বন্ধ আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। অক্টোবর মাসে নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন খাজনা বন্ধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে শুরু হয়। এই সময় থেকেই প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে কৃত সংকল্প হয়। যে নীলকরেরা এতদিন দেশীয় জমিদারদের পরম শত্রু মনে করত তারাই এখন দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। অনেক দেশীয় জমিদার এই খাজনা বন্ধ আন্দোলনে ভীত হয়ে নীলকরদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ছিল। নীলকর জমিদারেরা সরকারের কাছে প্রজাদের খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আবেদন করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে খাজনা বন্ধ আন্দোলন প্রজাদের একটা নূতন আন্দোলন, নীলচাষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া গভর্ণমেণ্টকেও বিব্রত করবে সুতরাং গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সরকারী নির্দেশে নদীয়া জেলার কমিশনার মিঃ লাসিংটন এ বিষয়ে তদন্ত করে জানতে পারেন যে নীলচাষের সঙ্গে এই খাজনা বন্ধ ব্যাপারটি সম্পর্কহীন নয়। চাষী এই ভয়ে নীলকর জমিদারের কাছারিতে যেতে চায় না যে, সে সেখানে গেলেই তাকে দিয়ে বল পূর্বক 'দাদন' নেওয়ানো হবে এবং সে নীলচাষে বাধ্য হবে এবং নীল চাষের পরিণামে তাকে সপরিবারে অনাহারে মরতে হবে। চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে লাসিংটনকে জানিয়েছিল যে জেলা কালেকটারীতে তারা খাজনা জমা দিতে চায়—নীলকরের কুঠিতে গিয়ে খাজনা দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। লাসিং-টন নদীয়া ডিভিসনে নীলকরদের তরফে জেলা কালেকটরীতে খাজনা জমা নিতে সম্মত হওয়ায় 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়। বিশেষ

উপদ্রব না থাকায় নীল বিদ্রোহও এই সময় অনেকটা শান্তভাবে ধারণ করেছিল। সদ্য বিগত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নূতন বৎসরের দ্বিতীয় দিনে হরিশ্চন্দ্র যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন তার মর্ম এই রূপ ছিল যে নীল চাষ বিষয়টির গুরুত্ব শুধু নীলচাষ প্রসঙ্গেই নয়, এই প্রসঙ্গের সঙ্গে বাঙলার কৃষক সমাজের অধিকারের প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত রয়েছে। চাষীর যে জমি আছে তা তার নিজস্ব কিনা, তার নিজের শ্রমের ফলভোগের অধিকার তার আছে কিনা, তার নিজের হাল বলদ প্রভৃতির উপর তার অধিকার আছে কিনা, সর্বোপরি সরকারী প্রশাসনের কাছে অন্য সকলের মত সুবিচার পাওয়ার অধিকার তার আছে কিনা, এত গুলি প্রশ্নের উত্তর নীলচাষ প্রসঙ্গে তার প্রাপ্য। এ প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর মেলার পথ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এতটা প্রশস্ত হয়েছে যে এই বৎসরটিকে বাঙালী কৃষকের মুক্তির বৎসর রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। একটি জেলায় চাষীরা এতখানি সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছিল যে তাদের এই দৃষ্টান্ত অতিদ্রুত সমগ্র বাঙলায় কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন কি বলতে পারা যায় যে এটি সমগ্র হিন্দুস্তানের কৃষক সমাজকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। চাষীরা এখন বুঝতে পেরেছে যে তারা ক্রীতদাসের জীবন যাপন করুক এখন আর এটা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। তারা এখন বুঝে নিয়েছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাদের ন্যায্য অধিকার, এই ন্যায্য অধিকার তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে শুধু দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই অর্জন করে নিতে পারে। তাদের এই সংগ্রাম এখনও অবশ্য চলছে। যারা চাষীদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে অভ্যস্ত তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল নিপীড়ন-নীতি বিনা প্রতিরোধ এক কথায় পরিত্যাগ করবে বলে মনে হয় না। এই সংগ্রাম অনেক আগেই চুকে যেত, এটা শুধু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তব্যের গাফিলতিতে চুকে যেতে পারেনি। এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার কোন আদর্শ নেই, ওদের নীতিবোধও খুব নীচু স্তরের। অথবা এমনও হতে পারে চোখের সামনে চাষীদের মানসিকতার একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখে এরা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে এই ম্যাজিস্ট্রেটদের বুদ্ধি শুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান এত অল্প এবং মাত্রঐ কারণেই এরা তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যাই হোক, চাষীদের মুক্তির পথ অবারিত হয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঙলার চাষী তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ফিরে পাবে, তার সম্পত্তিতে অন্যের হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে। বস্তুতঃ একটি সুশাসিত দেশের প্রজার প্রাপ্য সুখ সুবিধা সবই সে ভোগের অধিকারী হবে। একটা অরাজক পরিস্থিতি থেকে চাষীদের উদ্ধার করার জন্য সরকার সম্প্রতি যে দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উচ্চ মানসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। বিপদ কেটে গিয়েছে। এখন নজর রাখতে হবে এই প্রচেষ্টার

পরিণাম যেন শুভ হয়। দেশের চাষী যেন পুনরায় বিপদগ্রস্থ না হয়।"

["Inferior in magnitude but of more intense is the Indigo-question by which is meant a question generally all ryot rights in Bengal. Whether the ryot is the master of his own land, his own labour, his own implements, whether he has a right to an equal administration of the laws with others are the points involved in the indigo question.

So satisfactory has been the progress, made towards the settlement of this question, that the year 1860 may emphatically be called the year of ryot emancipation of Bengal. The courage, intelligence and civil fortitude displayed by the ryots of one of the districts have resulted in such success that the spirit of freedom has rapidly extended itself over the whole province, and even entered Hindoosthan proper. The ryots have found out that they live under a Govt. which is not interested in keeping them in the condition of slaves; they have found out that civil liberty is theirs by right and that it can be secured in all entirety by a peaceful and determined assertion of their right. The struggle is still being waged. Those interested in keeping the ryots in their servile condition are not likely to give up their vested claims to oppress with impunity and with profit without making a fight for it. This struggle would have sooner terminated had the Magistrates fairly done their duty. But these latter habituated to a lax standard of judicial morality, and appalled parhaps by the magnitude of the change passing under their eyes, have proved themselves, with few exceptions, morally and intellectually unequl to their task. Nevertheless, the cause of ryot emancipation proceeds apace, and in a few years the ryots of Bengal will enjoy all the freedom of person, security of property and the other advantages of living under good Govt which is enjoyed in the most favoured portions of the Queen's dominion. The Govt of Bengal, which has had to control this great social change, to direct its tendencies and to

prevent it from lapsing into anarchy has hitherto performed the work with judgement, temper and ability. The crisis has passed, it remains to be seen that the sequel donot prove more painful to the country than the need be.—1860; H.P.2.1.1861.]

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একাদশ আইন উঠে যাওয়ার পর যে সব নীলকরের জমিদারি ছিল তারা চাষী প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য করার জন্য তাদের জমির খাজনা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের হায়রাণ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। তাদের এই দুশ্চেষ্টার প্রতিবাদে চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অতঃপর এই বিরোধ নিয়ে মামলা শুরু হয়। এই বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গোড়ার দিকে নীলকরেরা আবার প্রজা পীড়নের আশ্রয় নেয়, কারণ নূতনভাবে নীল বোনার সময় আসন্ন হয়ে এসেছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশম আইন বলে নীলকর জমিদারেরা তাদের খাজনা বৃদ্ধি ও জমি থেকে উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে বাঙলার কৃষক সমাজ যথেষ্ট অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছিল। নীল কমিশনের রিপোর্টে, তাদের সুপারিশ এবং ছোট লাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের শাসন সংস্কারের খবর তাদের কাছে পৌঁছেছিল। নীলকরেরা জমিদার রূপে অত্যাচার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে বহু মাতব্বর ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের পরামর্শের জন্যে আগের মতই কলকাতায় ছুটে আসা সুরু করেছিল। নীল বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে এই খাজনা বন্ধ আন্দোলনেও হরিশ্চন্দ্র দুর্গত কৃষক-প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই সময়ে কৃষকদের মধ্যে এক-প্রাণতার একটা জোয়ার এসেছিল। নদীয়া জেলার কৃষকেরা গ্রামে গ্রামে একটি করে ধন ভাণ্ডার খুলেছিল, প্রত্যেকেই এই ধন ভাণ্ডারে যার যেমন সাধ্য দান করত। কোন ইউরোপীয় নীলকর-জমিদার কোন চাষীর নামে মামলা করলে এই ধন-ভাণ্ডার থেকে মামলার খরচ জোগান দেওয়া হত। এমন কি অনেক সময় ভিন্ন গ্রামের কোন অভিযুক্ত চাষীর জন্যও এই ধন ভাণ্ডার থেকে অর্থ সাহায্য করা হত। চাষীদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান এই বিচার লুপ্ত হয়েছিল। বহু চাষী নীলকর জমিদারদের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করেছিল। চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই মামলাগুলির তদ্বির তদারক করত। বাকী খাজনার দায়ে কোন কৃষকের জমি নীলামে চড়িয়েও নীলকর জমিদার তার টাকা উশুল করতে পারত না, কারণ এক কৃষকের জমি নীলামে উঠলে আর কোনও কৃষক তা কিনতে অস্বীকার করত। নীল বিদ্রোহের সময় থেকেই চাষীরা নীলকরদের জব্দ করার জন্য একটি বিশেষ উপায় আবিষ্কার করেছিল, এই উপায়টি কোর্ট-কাছারির এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। নীলকরেরা চাষীদের উপর যে নির্যাতন যুগ যুগ ধরে চালিয়ে এসেছিল সেই অত্যাচারে তারা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ খুব কমই নিত। অধিকাংশ স্থলে, নীল কুঠির দেশীয় কর্মচারীদের

যারাই এই অত্যাচার তারা চালাত। নীল বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় চাষীরা নীলকুঠির কর্মচারীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করত, কোন কাজকর্মে তাকে ডাকা হত না, গ্রামের ধোপা নাপিতরাও তাকে বর্জন করত। এমন কি দোকানদারেরা তাকে নুন, তেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র বিক্রি করতে অস্বীকার করত। এর ফলে বহু নীলকুঠির কর্মী কর্মত্যাগ করে চাষীদের দলে ভিড়েছিল। নীলকরদের যে যে সব কর্মচারী খাজনা আদায় করত বা রসিদ লিখত তারাও এই সময় নীলকর জমিদারের বিরোধিতায় চাষীর পক্ষ নেওয়া শুরু করেছিল। নীলকরদের মধ্যে এই ঘটনায় হাহাকার পড়ে যায়, তারা চাষীদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে তা গোপন রেখে চাষীদের বিপক্ষে তাদের নিজস্ব কাগজগুলিতে প্রচার সুরু করেছিল। প্রজা চাষীদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন রোধের জন্য তারা গভর্ণমেণ্টেরও শরণাপন্ন হয়। ছোটলাটকে তারা এই মর্মে একটি আবেদন পাঠিয়েছিল যে তারা গ্রামে খাজনা আদায় করার জন্য কোন লোক পাঠাতে পারে না, কারণ গ্রামে খাজনা আদায়কারীকে ঢুকতেই দেওয়া হয় না, কুঠির কর্মচারীদের কুঠির বাইরে গেলেই লাঞ্ছিত বা অপমানিত হতে হয়, কুঠির খাস জমি জবর দখল করা হচ্ছে। ৯ই জানুয়ারি ১৮৬১ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নীলকরদের এই প্রচার মিথ্যা। নিরীহ ও অশিক্ষিত দরিদ্র চাষীদের পক্ষে এই ধরণের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সুবিধা বা শক্তি নেই বলেই তাদের বিপন্ন করার জন্যই এই মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে-[…"myths, simply gotup with theevil intention of injuring the interest of the uninformed and innocent ryots, who are not in a position to expose the false representation of their powerful opponents"], অতঃপর তিনি লেখেন যে আসল ঘটনা হল এই যে চাষী তার অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা শিখে নিয়েছে যে একবার নীলকরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তার পক্ষে আর নীলকরের কবল থেকে বেরিয়ে আসা মুস্কিল হবে, এইজন্য তারা নীলকরদের কাছারিতে খাজনা জমা দিতে যেতে চাইছে না। নীলকর-জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দিতে গেলেই তাকে আবার নূতন ভাবে নীলচুক্তি সই করতে বাধ্য হতে হবে। তারা এখন এটা জেনে গিয়েছে যে তারা ইচ্ছা করলে সরকারী কাছারিতে গিয়ে জমিদারদের খাজনা উশুল করে দিতে পারে। তাই তারা দলে দলে সরকারী কাছারিতে গিয়ে তাদের দেয় খাজনা জমা দিয়ে এসেছে। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে নদীয়ার ডিভিসনাল কমিশনার লাসিংটন উপরোক্ত মর্মে রিপোর্ট দিয়েছেন; আশা করা যায় যে লেঃ গভর্ণর মহোদয়ের গোচরে তা আসবে এবং তিনি বুঝতে পারবেন যে নীলকরদের অভিযোগ কত অসার ও অলীক।

["The degree of credence to be attached to the strong representation of the planters as to the illegal and aggressive acts of ryots against them at least as far as Nadia Dist., is concerned can now be ascertained with precision. The report of Mr. E. H. Lushington on the actul state of relation now subsisting between the planter and the ryot in his own district is direct and precise and has we doubt not undeceive the mind of our Lt. Governor"—The Present State of the Indigo Districts, H.P. 9. 1. 61.]

কর বন্ধ আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র ও ব্যাপক হতে থাকায় নীলকর জমিদার-দের এক আবেদনের ফলে লেঃ গভর্ণর গ্রান্ট, মার্চ মাসে বারাসাত ও নদীয়া জেলার জন্য একজন এবং যশোর জেলার জন্য আর একজন খাজনা আদায়কারী কমিশনার (Special Rent Commissioner) নিযুক্ত করেন, এঁদের ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়। জুন মাসে নদীয়া ও বারাসতের মিঃ মণ্টেসর (C. T Montressor) একটি রিপোর্টে লেঃ গভর্ণরকে জানান যে নীলকর জমিদারদের দ্বারা অন্যায় ভাবে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়াতেই প্রজারা খাজনা দিতে চাইছে না, খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ তথা আদালতের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার আছে। নীল চাষের সঙ্গে এই খাজনা বৃদ্ধি বা খাজনা না দেওয়া আন্দোলনের সম্পর্ক আছে। যশোরের কমিশনার অনেক চেষ্টা করেও প্রজাদের খাজনা না দেওয়া বন্ধ করতে পারে নি। তাঁর রিপোর্টে তিনি জানান যে ইউরোপীয় জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে অবিরত বিরোধ চলছে. নীলকর জমিদার ও চাষীদের মধ্যে সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে সেটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবস্থার দিন দিন অবনতি হওয়াতে লেঃ গভর্ণর ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন, যে প্রজারা কুঠির ইংরাজ কর্মচারীদের স্বাক্ষরিত রসিদ পেতে চায় এবং তার উপর স্বত্বের রূপটি কি রসিদে তার উল্লেখ দেখতে চায়,এটা তাদের দেওয়া হচ্ছে না, যে জমি বানে ভেসে গেছে সে জমির উপরও খাজনা চাওয়া হচ্ছে, অনেক সময় ৮। ১০ বছরের বকেয়া খাজনাও দাবী করা হচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে খাজনা দেওয়া নিয়ে নীল-কর জমিদার ও প্রজা বিরোধ চলেছিল। নীল বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাঙলার চাষী উচ্ছেদ, খাজনা বৃদ্ধি প্রভৃতির অভিযোগ নিয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে শিখেছিল। আগের মত তারা পড়ে পড়ে মার খায়নি। হরিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে তারা তাদের অধিকার সচেতনতার শিক্ষা নিয়েছিল। ইউরোপীয় নীলকর সমিতি বরাবর তাদের স্বদেশ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে দৃঢ়

যোগাযোগ রাখত। লণ্ডনে তাদের আপিসও ছিল। তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত করার জন্যও তারা অর্থ ব্যয় করত। অনেক সময় তারা সরাসরি ভারতের জন্য নিযুক্ত সেক্রেটারী অফ স্টেটস এর সঙ্গেও যোগাযোগ করত। ইংলণ্ডের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি যাতে তাদের সমর্থন করে তার জন্যও তারা প্রচুর টাকা খরচ করত। এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'লণ্ডন টাইমস' এদের অন্ধ সমর্থক ছিল। নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ইংলণ্ডের বহু ব্যক্তি নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ জাতির ন্যায়-অন্যায়বোধ সাধারণভাবে খুবই প্রখর। ইংল্যাণ্ডের যে র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিকরা এতদিন নীলকরদের সপক্ষে ছিলেন তারাও নীলকরদের প্রতি এখন থেকে বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নীলকরদের তরফ থেকে বাংলার ছোটলাট স্যার জন পিটর গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক একটি পুস্তিকা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় (Brahmin and the Pariahs), ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি জন ডিকিনসন এর প্রত্যুত্তরস্বরূপ নীলকরদের বিরুদ্ধেও একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। (Reply to the Indigo Planters' Pamph let –London, 1861)

নীলকরেরা এই সময়ে ইংলণ্ডের জনগণ, ও পার্লামেণ্টের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র প্রচার করেছিল। এই প্রচারপত্রের শেষদিকে লেখা হয়েছিল, "আমরা কারো সাহায্য চাই না, আমরা চাই আমাদের নিজেদের মত থাকতে। আমরা শুধু চাই একজন মূর্খ এবং দুষ্ট অত্যাচারীর নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করতে। এই লোকটি সৈন্যবাহিনীর দ্বারা গ্রাম বাঙলার দখল নিতে চাইছে। এই লোকটি যদি এখনও বঙ্গদেশে আপনাদের মন্ত্রী (অর্থাৎ ছোটলাট) থাকেন তবে শীঘ্রই এমন পরিস্থিতি আসবে যখন আপনাদের এই দেশ হস্তচ্যুত হবে অন্যথায় বেয়নেটের সাহায্যে এদেশের অধিকার রক্ষা করতে হবে" ["... We ask not to be helped but to be let alone. We ask to be relieved from oppression of an ignorant and mischievous despot, who is even now rendering it necessary to take military occupation of the rural districts of Bengal and who if he remain your minister will soon bring matters to such a pass that you will have to make your choice between abandonng the country and holding it at the point of the bayonet."]*

নীলকরদের প্রচারপত্র থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে

* বাঙলার ছোটলাট স্যার জন পিটর গ্রাণ্টের প্রতিই এই বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে।

মন্তব্য করেন যে নীলকরগণ যে পরিস্থিতির আশংকা করছেন তা উপস্থিত হলে অবশ্যই ব্রিটিশ জনগণ ও পার্লামেন্ট মিঃ গ্রাণ্টকে পদচ্যুত করে স্বদেশে ফিরতে বাধ্য করতে পারবেন। এই প্রচার পত্রের পিছনে নীলকরদের দুর্বল অথচ হীন মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়েছে। পার্লামেন্টের সদস্যরা এতদিনে জেনে গেছেন কার বিরুদ্ধে তদন্ত প্রয়োজন। স্যার চার্লস উড, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, মিঃ বিডনের চুক্তি আইন, মি· কুকের প্রচার পুস্তিকার সুবাদে এরা যতই গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করুন না কেন চাষীরা স্বাধীন মানুষ হিসেবেই তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নেবে। ["....And then inspite of Sir Charles Wood, the legislative Council, Mr. Beadon's contract law, Mr. Cook's pamphlets,' et hoi gains muse, the ryot will have severely established position as a free man"—The Indigo Explosion in London. H. P. 6, 3. 1861.]

নীল বিদ্রোহের ফলে গভর্ণমেণ্ট যে নীল কমিশন বসিয়েছিলেন তার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার একটা সুফল এই হয়েছিল যে, এই রিপোর্টে নীল বিদ্রোহের কারণগুলি জনসমাজে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছিল, নীলকরেরা অর্ধশতাব্দী ধরে চাষীর উপর যে অত্যাচার চালিয়ে এসেছিল সে বিষয়ে নীলকরেরা ব্যতীত আর কারো মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর নীলকর সমর্থকেরা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ও ভারত-সচিব সার চার্লস উডের কাছে নীলকরদের স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূল নীতি গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ও ভারতসচিব দুজনেই এদের স্পষ্টভাবে বলে দেন যে নীলচাষ যে দুর্নীতিপূর্ণ পন্থায় এতদিন চলে এসেছে সেটা জালিয়াতিওজুয়াচুরির নামান্তর, সুতরাং নীল চাষীদের স্বার্থে ভারত সরকারকে কোন আইন প্রবর্তন করতে তাঁরা অনুমতি দেবেন না। সার চার্লস উড, বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে এবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ শান্ত হওয়ার পর লর্ড ক্যানিং এর চরিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। কলকাতার যে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ তাঁকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বড়লাটের আসন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করেছিল লর্ড ক্যানিং এদের অনেকের সঙ্গেই সামাজিকভাবে মেলমেশা শুরু করেন। বাঙলার লেঃ গভর্নর রূপে পিটর গ্রাণ্ট কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের নিন্দা প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না করে যেভাবে শাসনকার্য পরিচালন করতেন, ক্যানিং তাঁর পরিবর্তিত মানসিকতার কারণে সব সময়ে তা পছন্দ করতেন না, গ্রাণ্টের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর মতভেদ ঘটত· কিন্তু গ্রাণ্ট এত আইন-সঙ্গতভাবে পদক্ষেপ নিতেন যে শেষ পর্যন্ত ক্যানিংকে গ্রাণ্টের মতকেই শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে হত। গ্রাণ্টের কড়া আইন ও সুবিচার প্রবর্তনের পর নীলকরদের স্বার্থে বেশ

বড় রকমের আঘাত লেগেছিল। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের ফলে অনেক নীলকর জমিদার সময় মত সরকারে তাদের দেয় টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। লর্ড ক্যানিং এদের টাকা জমা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন অন্যথায় এদের জমিদারি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে হস্তচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ল্যাণ্ড হোল্ডারস য়্যাণ্ড কর্মাসিয়াল এসোসিয়েশনের স্বার্থরক্ষার্থে লর্ড ক্যানিং-এর ইঙ্গিত পেয়ে মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সিসিল বিডন চুক্তি সংক্রান্ত একটি আইন (Criminal Contract Bill) উত্থাপন করেন। এই বিলটি ছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের একাদশ আইনের অনুরূপ এমন একটি প্রস্তাব যার দ্বারা চাষীকে আইনের ভয় দেখিয়ে নীলচাষে বাধ্য করা সম্ভবপর।

এই বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পেশ হওয়া মাত্র হরিশ্চন্দ্র প্রস্তাবিত এই বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়টের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। ২৭ মার্চের হিন্দু পেট্রিয়টে একটি সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন "গত বৎসর থেকে যে প্রথায় নীলচাষ চলে এসেছিল তা বন্ধ করা হয়েছে। আমরা ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করছি যে এই প্রথাটি যে প্রতারণা, বলপ্রয়োগ ও বে-আইনির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এসম্বন্ধে কি তাঁরা স্থিরনিশ্চয় হননি? এই প্রথায় নীলকরেরা ছিল অপরাধী আর চাষীরা ছিল এদের অত্যাচার ও শোষণের শিকার। ভারত সরকার নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে গত বৎসা কত কঠিন পরিস্থিি দেখা দিয়েছিল। ভারত সরকার বঙ্গীয় সরকারকে কি এমন একটি ঘোষণা জারী করার অনুমতি দেননি যার মর্ম এই ছিল যে এখন থেকে শুধু আইনের অর্থাৎ ন্যায় বিচারের রাজত্ব চলবে, বে-আইনি কোন কাজ গভর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভারত সরকার এখন এমন একটি প্রস্তাব আনছেন যা সমাজের (কৃষকদের) পক্ষে অবর্ণনীয় ক্ষতির কারণ হবে। ভারত সরকার প্রস্তাবিত এই বিলটি দ্বারা বাঙলা সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এতে বাঙালী জনসাধারণের প্রতিও বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। মুষ্টিমেয় সামান্য কয়েকজন নীলকরের চেঁচামেচি বন্ধ করতে যে প্রস্তাব আনা হচ্ছে তাতে বহু মানুষের স্বার্থহানি হবে। এর ফলে বাঙলার মানুষদের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের সততার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হবে। সিপাহী বিদ্রোহ কি ভারত সরকারের কাছে এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করে দেয়নি যে ভারতের বৃহত্তর জনসমাজে ব্রিটিশ জাতির সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি কত অল্প! ভারতে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী। এঁরা তাঁদের স্বদেশবাসীর মতামতকে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে অনুকূল রাখার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ নীতির সমর্থক এই সব ব্যক্তি এই ধরনের 'বিল' গৃহীত হওয়ার পর তাঁদের দেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করাতে পারবেন কি? পরিশেষে আমরা ভারত সরকারকে জানাতে চাই যে

প্রস্তাবিত এই বিলটি তুলতে ভারত সচিব অনুমতি দেননি। চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে আনীত এই বিলটি আমরা বিশ্বাসভঙ্গকারী বিলরূপে অভিহিত করছি।

["...And first let us turn to Govt of India to whom we would say 'you must be convinced that the system of indigo cultivation in lower Bengal was up to its stoppage last year, a system of fraud, force and illegalities in which the manufacturers were the offenders and by which they were gainers and of which the Ryots were the victims in body, soul and estate ....you can not have forgotten that at a critical period of agitation you authorised the issue by the Govt of Bengal of a proclamation in which the essential point of that policy was broadly and unequivocally announced, namely that existing law haveits couhse and noneothers. You now change the whole drift of your past policy and introduce a measure fraught with incalculable mischief to the community.. you thereby break your faith with the Govt (of Bengal) and people of Bengal and compromise interests infinitely larger than the petty clamourous indigo interest by bringing into doubt and disbelief your most solemn profession. The mutinies must have taught you that your reputation for truth and fidelity does not stand very high with the people of India at large. You by your present act make it impossible for the few who understand your motives and appreciate items to justify your conduct to their countrymen. Lastly, the Secy. of State has not directed you to introduce and promote the measure which we have termed as your Breach of Faith Bill"—A Few Words to All concerned, H.P. 27. 3. 61]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারত সচিব স্যার চার্লস উডের তীব্র আপত্তিতে ভীত হয়ে ভারত সরকার ব্যবস্থাপক সভা থেকে এই বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। উড্ এই মত প্রকাশ করেন যে বিলটির ধরন দেখে মনে হয় যে এটি নীলকরদের স্বার্থেই রচিত। "The legislative council...gave the look of a special Indigo tint in it) এই বিলটিকে তিনি ভয়ংকর ঘৃণিত এই আখ্যা দিয়েছিলেন (Monstrous)।*

* Halifax Papers, March 26, April 5,1 61 (Quoted by Blair Kling O. p. cit. pp. 191)

প্রজাদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে আনীত এই বিলটি প্রত্যাহৃত হলেও পর বৎসর নব সৃষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিকর অনুরূপ একটি বিল (Rent Recovery Bill-Act-VI of 1862) আইনে পরিণত হয়। 'এই বিলটি যখন গৃহীত হয় তার প্রায় এক বৎসর পূর্বে হরিশ্চন্দ্র ইহলোক থেকে অপসৃত হয়েছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ছোটলাট পিটর গ্রাণ্ট ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন।* এই প্রস্তাবিত বিল গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও হাত ছিল কারণ এতে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হরিশের মৃত্যুর পর নিছক জমিদারদের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। প্রজাবন্ধু হরিশ্চন্দ্র যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত জনস্বার্থে নিযুক্ত রেখেছিলেন, এর জন্য তাঁকে জমিদারদের বিরুদ্ধতাও সহ্য করতে হত।

* নীলকরেরা ছোটলাট গ্রাণ্টের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা রটনা করেছিল। ১৮৬১খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ই মার্চ ইংলিশম্যান কাগজে তাঁকে গালাগালি দিয়ে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে এই রকম শাসানিও দেওয়া হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ জুন নদীয়া জেলায় নীলকরদের সঙ্গে জমিদার হরনাথ রায়ের লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ব্যক্তি মারা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নীলকরেরা গ্রাণ্টের নামে একটি মানহানির মামলা এনেছিল, মামলায় গ্রাণ্ট দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁর মাত্র ১৲ টাকা জরিমানা হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে Knight Commander of Bath (K. C. B.) উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নীল বিদ্রোহের শেষ পর্যায় ও হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু

নীল বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে প্রজাদের নিকট বাকী খাজনা আদায় করার অজুহাতে কোন কোন নীলকুঠি মালিক পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা চালিয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সিন্দুরি নীল এলাকায় চাষী ও নীলকরদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। নীলকরেরা সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে একটিগ্রাম আক্রমণকরলে সহস্র প্রজাএই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়েএসেছিল। সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে ছয়জন প্রজার প্রাণহানি হয় ও অনেকে আহত হয়। প্রজাদের এই দৃঢ় প্রতিরোধ নীলকরদের সন্ত্রস্ত করেছিল। সিন্দুরি বা সাধুহাটির এই ঘটনাকে বিকৃত করে নীলকর সমাজ ও তাদের সংবাদপত্রগুলি অপপ্রচার শুরু করেছিল। হরিশ্চন্দ্র ২৯ মে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিলেন, "বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর ম্যানেজার রবার্ট লারমুরের বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে-যে সিন্দুরি কুঠির অধীন প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে কুঠির কর্মচারী ও পুলিশকে আক্রমণ করে তাদের অনেককে নিহত অথবা আহত করেছে। এই ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহের মত এক বিদ্রোহের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। লারমুরের মতে এই বিদ্রোহ এক অপ্রকৃতিস্থ (insane) প্রশাসক ছোটলাট গ্রাণ্টের অপশাসন নীতির (insane policy) পরিণাম। লারমুরেরা অবিলম্বে নীলচাষ এলাকায় সামরিক শাসন এবং রক্ষীদলের ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। লারমুরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশ্চন্দ্র এর পর মন্তব্য করেন যে আসল ঘটনা হল যে ব্যাপারটি ঘটার পর বঙ্গীয় সরকার নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে দিয়ে এটি অনুসন্ধান করিয়েছেন। কমিশনার তদন্ত করে জানিয়েছেন যে পুলিশ সহ সরকারী কর্মীরা নীলকরের লোকজনের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আক্রমণ করতে এসেছিল। গ্রামবাসিরা আক্রমণ কারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীই প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল এর ফলে ছয় জন প্রজা নিহত হয় ও বহু প্রজা আহত হয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর দোষী সরকারী কর্মচারীদের বদলী করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত তথ্য প্রকাশের পর হরিশ্চন্দ্র মফঃস্বলে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন যে শান্তি রক্ষার বাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু মাত্র অপর পক্ষ অর্থাৎ প্রজাদের বিরুদ্ধেই এদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্র আরও লিখেছিলেন "আমরা সশ্রদ্ধভাবে বঙ্গীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সরকার তাঁর কর্মচারীদের যে শাস্তি দিয়েছেন সেটা কি পর্যাপ্ত হয়েছে? ক্ষমতার চূড়ান্ত অপ-ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই লঘুদণ্ড কি ভবিষ্যতে অনুরূপ অত্যাচার প্রবৃত্তি রোধ

করতে পারবে? এতে তারা সতর্ক হবে? অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অন্যত্র বহাল কি বিনা প্ররোচনায় ছয়জন চাষী হত্যা ও বহু চাষীকে আহত করার মত গুরু অপরাধের যোগ্য দণ্ড? ["We respectfully ask the Bengal Govt, is this punishment allotted to the officers in question proportionate to their offences? Is it a sufficient check to them and warning to others for such gross abuse of power and authority? Is cold blooded murder of six innocent ryots and the serious bodily harm to as many more avenged and atoned for by the simple removal of the officers to another station?"]

এই প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি লেখেন যে ছোট লাট মিঃ গ্রাণ্ট্ এখন ত বেশ বুঝতে পারছেন যে নীলকর ও নীলচাষ সম্বন্ধে তাঁর (গ্রাণ্টের) অভিমত ও অনুসৃত নীতি, ভারত গভর্ণমেণ্টের অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং 'টাইমস' পত্রিকার আর্তনাদ ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ইংলণ্ডের জনমতকে সপক্ষে আনতে পেরেছে। এখন তাঁর উচিত হচ্ছে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে নীলচাষ ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। এটা যদি তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য হয় তবে সিন্দুরির অনুরূপ ঘটনা গুলিকে এড়িয়ে যাওয়া বা লঘুভাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে। তাঁকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর কর্তব্য পালন ও ন্যায় বিচার করতে হবে। সিন্দুরির মত ঘটনা ইউরোপে ঘটলে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হত। তিনি যদি সত্য সত্যই চাষী দের অত্যাচারী নীলকরদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান তবে এখনও তাঁকে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

["Mr. Grant has now seen that his policy has been acespted in England not withstanding the vaccilation of the Govt. af India and the wails and threats of the Times. What he has now to do is to carry it to its legitimate issue. This he can not do by glossing over events as in Sindoorie case which would have made a rebellion in Europe but by adhering resolutely to the path of duty and justice. He has yet much to do if he really wishes to free the ryot, wholly and permanently, from the grinding serfdom of the Indigo factory"]
—The Indigo Rebellion, H. P 29. 5. 61.

এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটি রচনাকালে হরিশ্চন্দ্র গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে শয্যা-শায়ী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র চিরকাল অমানুষিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। রাত্রিকালে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের সময় ব্যতীত সব সময় তিনি কর্মব্যস্ত থাকতেন।

নীল বিদ্রোহের সূচনা কাল থেকে তাঁর এই ঘুমের সময়েও টানাটানি পড়ে। সকালবেলা এবং অফিস থেকে ফেরার পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত মফঃস্বলবাসী প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হত, অনেক সময় নিজেই তিনি এদের আবেদন পত্র মুসাবিদা করে দিতেন, মফঃস্বলে এদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য মোক্তার ঠিক্ করে প্রজাদের হাত দিয়েই মোক্তারদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাতেন। গভীর রাত্রিতে তাঁকে রাত জেগে হিন্দু-পেট্রিয়টের কাজ করতে হত। এ বিষয়ে তাঁর মায়ের অনুযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র নিজের আপিসের কাজ অতি মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে সম্পন্ন করতেন। কোনদিন তিনি কাজে ফাঁকি দেননি। গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়া সত্বেও তিনি আপিস থেকে ছুটি নেননি। হরিশের আপিসের বড় কর্তা চ্যাম্পনীজ সুপণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চোখে দেখতেন। শাসক-ইংরাজ বিদ্বেষী হরিশ্চন্দ্রের ইংরাজ বিদ্বেষ উভয়ের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল চ্যাম্পনীজ দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে স্বদেশে যান। হরিশ্চন্দ্রের শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁকে ছুটি নেবার পরামর্শ দেবার মত কোন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন না, তাঁর স্বদেশীয় সহকর্মীরা ছুটিনেওয়ারপরামর্শ দিলে হরিশ্চন্দ্র জবাব দিতেন, 'মরি ত মরব, যতদিন পারি কাজ করব, ভারতীয়েরা কাজে ফাঁকি দেয়, এ অপবাদ কিছুতেই সহ্য করব না।' কিন্তু একদিন এমন অবস্থা এসেছিল যখন হরিশ্চন্দ্র কে শয্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তাঁর বরাবর হাঁপানি বা শ্বাস-কষ্ট রোগ ছিল, এখন প্রত্যহ তাঁর জর হতে লাগল। হরিশের বহু বন্ধু ছিলেন, হরিশ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় এঁরা চঞ্চল হয়ে পড়লেন। তৎ-কালে হরিশের বাসস্থান ভবানীপুর পল্লী অঞ্চল ছিল, এখানে রেখে সুচিকিৎসার অভাব হবে এই বুঝে হরিশের পরম বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাতনামা উকিল রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য অনেকটা জোর করে উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট ষ্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। এখানে কলকাতা শহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ এডোয়ার্ড গুডিভ (Dr Goodeve) ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা করেন। তাঁর রোগ ক্ষয় কাশ বা যক্ষা বলে নির্ণীত হয়। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অবস্থান কালে হরিশ্চন্দ্র চিকিৎসক ও আত্মীয় বন্ধুদের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে যাবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি শুরু করেন। হরিশের কাতর আবেদনে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে তাঁর ভবানী-পুর পল্লীর চাউলপটি রোডের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। অসুস্থ শয্যাশায়ী হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের কাজ থেকে ছুটি নেননি, যতদিন পেরেছেন তিনি পেট্রিয়টের জন্য সম্পাদকীয় লিখে গিয়েছিলেন। অন্যান্য কাজগুলির দায়িত্ব ছিল

তার এক যোগ্য সহকারীর উপর। এঁর নাম ছিল শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪) উত্তরকালে ইনি সাংবাদিক রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দুই তরুণ যুবক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল হরিশ্চন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। হরিশ্চন্দ্র এই দুই প্রতিভাবান ও শিক্ষিত যুবকদ্বয়কে নিজে পক্ষ পুটে আশ্রয় দিয়ে এদের সাংবাদিকতায় দীক্ষিত করেন। এই বৎসরই হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে সেই পদে কৃষ্ণদাস পালকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। হরিশ্চন্দ্র দীর্ঘকাল এই পদে অবৈতনিক ভাবে কাজ করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণদাস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এই জন্য হরিশ্চন্দ্র বহু চেষ্টা করে তাঁর ১২৫ টাকা বেতনের ব্যবস্থা করে দেন। কৃষ্ণদাস এই চাকুরির অবসরে সাধ্যমত হিন্দু-পেট্রিয়টের সেবা করতেন। শম্ভু চন্দ্র ১৮৫৮ থেকে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করেন, মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি অন্যত্র কাজ পেলে চলে যেতেন কিন্তু কিছুদিন পর আবার ফিরে এসে হিন্দু-পেট্রিয়টে যোগদান করতেন। শম্ভুচন্দ্রের উপর পেট্রিয়টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হরিশ্চন্দ্র ন্যস্ত করেননি, প্রায় সব কাজের তত্ত্বাবধান তিনিই করতেন, সম্পাদকীয়ও লিখতেন। নীলকর হিলস কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলা চালানোয় হরিশ্চন্দ্রের বেশ সময় নষ্ট হত, এজন্য যথেষ্ট উদ্বেগও ভোগ করতে হয়েছিল। এই হায়রানি ও তার সঙ্গে স্বাস্থ্যহানিতে বিব্রত হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রকাশ অসম্ভব হয়ে উঠত কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের সেবা ও আনুগত্যই এই দুর্দিনে হিন্দু-পেট্রিয়টকে জীবিত রেখেছিল। হরিশ্চন্দ্রের শারীরিক অবস্থা যখন শোচনীয় হয়ে এসেছে, হরিশ্চন্দ্র তখনও হিন্দু পেট্রিয়টে লেখা ছাড়েননি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নীল প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। নীলকরপক্ষীয়েরা নিজেরাই এই প্রসঙ্গটি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করেছিল, তাদের আশা ছিল নীল কমিশনের সুপারিশ ও বাঙলার ছোটলাট গ্রাণ্টের কৃষকদের সহানুভূতি-মূলক নীতি পার্লামেণ্টের সাহায্যে তারা নাকচ করে দিতে পারবে। আলোচনা শুরু হলে হাওয়া অবশ্য উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছিল। পার্লামেণ্টের 'র‍্যাডিক্যাল' সদস্যগণ জন ব্রাইটের নেতৃত্বে নীলকরদের অত্যাচার আর চলতে দেওয়া উচিত নয় দৃঢ় ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করায় ভারত সচিব স্যার চার্লস উড সরকারী তরফ থেকে পার্লামেণ্টে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে এতকাল নীল চাষীদের নীলকরেরা ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করে এসেছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দাসত্ব প্রথা চলতে দেওয়া হবে কিনা? (Slavery or no slavery that is the question)। কয়েকদিন নীলকরপক্ষীয়েরা পার্লামেণ্টে খুব লম্ফ ঝম্ফ করে অবশেষে পশ্চাদাপসরণ করেছিল। এ সম্বন্ধে এক গোপনীয় পত্রে ভারত সচিব লেঃ গভর্ণর পিটর গ্রাণ্টকে লেখেন যে নীল বিতর্ক শেষ পর্যন্ত

এড়ানো গিয়েছে, নীলকর সমর্থকেরা শেষ পর্যন্ত নীলচাষ ব্যবস্থা সমর্থনে লজ্জা পেয়ে সরে পড়েছে ("We have avoided an indigo debate here as those who are for the planters are ashamed of the case.")* .

১২ জুন হিন্দু পেট্রিয়টে পার্লামেণ্টে (হাউস অফ কমন্সে) নীল বিতর্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখা হয় যে পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ লেয়ার্ড নীল বিতর্কে যোগদান কালে বলেছেন যে নীল প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে উনি নীল চাষীদের প্রতি অনুকম্পা, নীলকরদের প্রতি ঘৃণা এবং যে ঘৃণিত আচরণ ব্রিটিশ জাতির কিছু লোক করে আসছে তজ্জনিত লজ্জা এই বিরোধী মনোভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত অবস্থায় বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। লেয়ার্ডের ভাষণটি জ্বালাময়ী হয়েছিল। স্বয়ং ভারত সচিব স্যার চার্লস উড এই ব্যবস্থাকে ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে তুলনা করেন। পার্লামেণ্টে বিতর্কের গতি লক্ষ্য করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন-বিচারফল কি হবে তা জানতে আর বাকী নেই। এখন নীলকরদের কর্তব্য হল ব্যবসা বাণিজ্যের যে স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি মেনে চলা। তাঁরা সেভাবেই চলুন। ন্যায় বিচারও সদবুদ্ধিকে পদদলিত করে চলার পথ তাঁদের ত্যাগ করতে হবে। ["The verdict is complete and let the planters set aright their affairs by following the natural laws of trade and industry instead of croaking against reason and justice"] সম্ভবত নীলকরদের প্রতি এই আবেদনই হরিশ্চন্দ্রের অন্তিম রচনা। এই রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার দুদিন পর ১৪ই জুন শুক্রবার সকাল সাড়ে নটার সময় হরিশ্চন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বে হরিশ্চন্দ্র জ্বর বিকারের ঘোরে চীৎকার করে ওঠেন "ওরে পেট্রিয়ট মেসিনে ওঠাস নে, প্রুফটা আর একবার আমাকে দিয়ে দেখিয়ে তবে ছাপিস্", এইটিই হরিশ্চন্দ্রের মুখের শেষ কথা। হিন্দু পেট্রিয়টের চিন্তা জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত হরিশের মনে জাগ্রত ছিল।

মৃত্যুকালে তাঁর ৩৭ বৎসর বয়সও পূর্ণ হয়নি। সম্পদ বলতে ছিল একটি বাড়ি ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস। নীল বিদ্রোহের সময় কলকাতায় আগত মফঃস্বলের চাষীদের আহার ও আশ্রয় সমস্যা মেটাতে এক সময় তিনি বাড়িটি 'মর্টগেজ' বা বন্ধক রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়িটি বন্ধক মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। তবে একটি কপর্দকও তিনি সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেননি। হরিশ্চন্দ্রের পরিবার বলতে আইনতঃ ছিল আরও তিন জন, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিধবা পত্নী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভবানীপুর পল্লীতে এবং কলকাতা শহরে বহু সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর অতি মধুর হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। এঁরা সকলেই তাঁকে পরমাত্মীয় মনে করতেন।

---

* Halifax Papers—Wood to Grant, May 9. 1861, and July3,1861, (Quoted by Blair Kling op. cit pp. 114)

হরিশের এই স্বজন মণ্ডলীর মধ্যে রাজা মহারাজা শ্রেণীর মানুষ থেকে অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও স্থান ছিল। হরিশের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত শোকার্ত মানুষের সমাবেশে হরিশের চাউল পটি রোডের পার্শ্ববর্তী স্থান লোকে লোকারণ্যের রূপ ধারণ করে। মফঃস্বলে এই সংবাদ পৌছালে গ্রাম বাংলার মানুষ হরিশের অকাল মৃত্যুর সংবাদে শোকে স্তম্ভিত হয়ে যায়। গ্রাম বাংলার শিক্ষিত মানুষেরা বিশেষতঃ হিন্দু পেট্রিয়টের পাঠকেরা হরিশকে তাদের পথের দিশারী মনে করতেন, এদের মুখ থেকে গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষেরা হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনে তাঁর উপর ভরসা রাখত। বহু কৃষক প্রজা তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শেও এসেছিল, যারা তাঁকে চোখে দেখেনি তারাও এদের মুখ থেকে হরিশ্চন্দ্রের মহাপ্রাণতা ও তাদের প্রতি তাঁর দরদের কথা শুনে তাঁর ভক্ত হয়েছিল। হরিশের মৃত্যুতে সেকালের অবিভক্ত বাংলার শহরে ও মফঃস্বলে যে শোকের সঞ্চার হয়েছিল তা উনবিংশ শতাব্দীতে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। রাজা রামমোহন রায়ের মত জগদ্বিখ্যাত মনীষীর মৃত্যুতে দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ শোক গ্রস্ত হয় নি, কারণ তারা রামমোহনের নামও কোন দিন শোনেনি। রামমোহনের মৃত্যুতে শুধু মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক শোকগ্রস্ত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বাংলার বাইরে ভারতের সুদূর প্রান্তেও শোকের ছায়া ফেলেছিল।

১৯ জুনের হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘোষণা করে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (সম্ভবত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) লেখেন যে কাগজটি হাতে তুলেই পাঠক বুঝবেন এটি এখন অন্তঃসার শূন্য। নিজের মত গঠন করতে এবং অনুসরণীয় পথের নিশানা পেতে পাঠক যে কাগজের উপর নির্ভর করতেন তার প্রাণ তাকে ছেড়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছে ["This lifeless paper which the reader hastily takes up to form his opinion on public affairs by the guidance of the soundest and most disinterested politician will proclaim to him too loudly that the spirit which breathed into it whatever it has been, has taken wing and fled to a more congenial world where it may continue its mission of beneficience unhampered by flesh and all that flesh is heir to…The harp indeed lies at the foot of the willow but he made it a living thing whose sound sent a scourge to thc evil doer, a balm to the suffering and wisdom to all who sought it reverentially, is not beside it Ths lyre is there but the music-O where the music is gone" ।]

অতঃপর লেখক বলেন নিঃসন্তান উত্তরাধিকারীবিহীন হরিশ্চন্দ্রের এই কাগজটি তাঁকেই চালাতে হবে। জনসাধারণ যদি এখন ভাবেন যে সিংহের অস্ত্র মর্কটের হাতে পড়েছে তবে সম্ভবতঃ তাঁরা ভুল বলবেন না ["The public will not mistake if they say that by the revolutions of time the monkey now plies the lion's weapon.—H. P. 19. 6. 61.]

এই দিনই হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয় (সম্ভবত এটি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের রচনা) এই প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় যে হরিশের মৃত্যু একটি জাতীয় দুর্দৈব ("a national misfortune of equal magnitude can not be concentrated into epigram more acceptable to the electric telegraph office....Hurrish's death is a public calamity")

অতঃপর লেখক বলেন যে হরিশ্চন্দ্র ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে একটা শুভদায়ী বিপ্লব এনে গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এক শতাব্দী ধরে ভারতীয় রাজনীতি শুধু ব্যর্থতার ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছিল। সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে নিঃস্বার্থ স্বাদেশিকতার মনোভাবের তিনিই যে জন্মদাতা ছিলেন একথা বলা যেতে পারে ("He may be said to have introduced disinterested Patriotism in Asia")

"...হরিশ্চন্দ্র যদি আবির্ভূত না হতেন তবে সুসভ্য গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে থেকেও ভারতবাসীর সব উচ্চাশা বিফল হত, মুঘল সম্রাটেরা তাদের যে অবস্থায় রেখে যান ব্রিটিশ শাসনেও তাদের সেই ভাবে থেকে যেতে হত "had it not been for Hurrish tha people of India might have lived a life of centuries more under the progressive rule of Gr. Britain without being anywise other than the unmitigated dreamers ever the Mogul Statemen left them.)

"... ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে উন্নত চিন্তা ও প্রবৃত্তি ও আচরণ লক্ষিত হচ্ছে এগুলি হচ্ছে হরিশের দান। নীরবে এবং ধীরে ধীরে হরিশ ভারতের শিক্ষিত সমাজকে এই মানসিকতায় দীক্ষিত করেছেন' হরিশের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটেছিল। এই শিক্ষা শুধু শিক্ষিতদের এডিসন ও সেক্সপীয়রের গ্রন্থ পড়তে শিখিয়েছিল। ব্যস এই পর্যন্ত। ....হরিশের অভ্যুদয়ের পর শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করেছিল জাতীয় লক্ষ্য কি হওয়া উচিত...। নিজের আচরণ দিয়ে হরিশ্চন্দ্র দেশবাসীকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কিভাবে জাতীয় ও ব্যক্তিগত আত্মসম্মান বজায় রাখতে হয়। হরিশ দৃঢ়চেতা ছিলেন কিন্তু বিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শক্তিধর হয়েও তাঁর মধ্যে ভদ্রতার অভাব ছিল না। সর্বত্র তাঁর উদারতার পরিচয় পাওয়া যেত যদিও

তাঁকে কোন কোন সময় গোষ্ঠিবদ্ধ হতে হত। কখনও তাঁর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়নি। তাঁর মধ্যে ছিল সাহস ও মৌলিকতা কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আত্মম্ভরিতামুক্ত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই নেতা ছিলেন এমনই এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব যা উরাল পর্বতমালার পূর্বভাগে আর কখনও দেখা যায় নি। ["The entire demeanur and allmost all the better ideas which we now observe in the advance section of Indian population are fruits of his influence. That influence has been exerted so silently....There were 40 years of English education—older than the late editor of Hindoo Patriot, but education merely taught the youth Addison and Shakespeare. Thus far it went and no further....It was not until Hurrish appeared that the end was distinctly appreciated...by his living example did he teach his countrymen individual and national self respect. Firm though respectful, strong though decent, generous at all times, sometimes a partisan, though scarecly insincere, with wit, forgiving and bold and original, without ostentation, the leader of the Hindoo Patriot presented a spectacle never before observed east of Ural mountains....We have not touched upon the political and religious movements he organised and led, as also his private virtues.—] H. P. 19. 6. 1861.

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখার্জিস ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা (জুন, ১৮৬১) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় হরিশ্চন্দ্রের অনুজতুল্য স্নেহভাজন সুহৃদ ও সহকর্মী গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ স্বনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটির মর্মানুবাদ উদ্ধৃত করা হল —"ভারতীয় সমাজের উপর বজ্রপাতের মত একটি নিদারুণ আঘাত নেমে এসেছে। প্রতিটি দেশীয় মানুষের কণ্ঠ আজ ভাষাহীন, চোখের দৃষ্টিও আজ পলকহীন। দরিদ্রের বন্ধু, ধনীর পথ প্রদর্শক অভিভাবক, দেশের মুখপাত্র ও স্বদেশ প্রেমিক, যিনি সাহসী হৃদয় নিয়ে বিপদকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিতেন সেই পুরুষ আমাদের অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে আজ কোথায় যেন চলে গিয়েছেন...। আমাদের ক্ষতি কত হল তা বলার নয়। স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার যে সুখ, সেই কল্প-বৃক্ষের পত্র পল্লব ও কুঁড়িগুলি সবে আমরা পেতে অভ্যস্ত হচ্ছিলাম। যুগ যুগান্তের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আমরা সবে মাত্র ক্ষীণ আশার রশ্মি দৃষ্টি গোচর করতে পেরেছিলাম, আমাদের যাত্রা পথ আমরা অতিকষ্টে অতিক্রম করেছিলাম, আমাদের

চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়া আমাদের দম বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করছিল। তবুও আমরা অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য পদক্ষেপ করেছিলাম। এই সবে মাত্র আমরা শিখেছি রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য কতখানি।...আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার এই যে আন্দোলন তার প্রাণ-পুরুষ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ["A thunder bolt has fallen upon the native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the mentor of the rich, the spokesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled foremost in the strife of politics has been swept like a vision from our aching eyes ...our loss is great. We were just pulling forth the buds and blossoms of a healthy existence. From the darkness of ages, we were only faintly emerging into light, groping our way through a choking mass of prejudices and struggling fully, thought earnestly, through obstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty,....Hurrish Chunder Mukherjee was the soul of this movement"]

ইউরোপীয় পরিচালিত 'ফিনিক্স' সংবাদ পত্রে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর যে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা থেকে বঙ্গ দেশে বাসকারী সাধারণ ইউরোপীয় সমাজের মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ফিনিক্স নামীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রটি ভারত-প্রবাসী ইংরাজ সমাজের মুখপত্র রূপে হরিশের জীবদ্দশায় তাঁর তীব্র সমালোচক ছিল। এই পত্রে লেখা হয়েছিল যে-হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে হিন্দু জাতির যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল তার জন্য আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই। তবে এই জাতীয় দুর্দৈবের গভীরতা ও তীব্রতা এত বেশী যে আমাদের এই সহানুভূতি তাতে কোন সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে অক্ষম। জীবনের প্রায় প্রথম ভাগেই কর্তব্যগুলি যখন সবে শুরু করেছেন, সমাধান হয়নি, ঠিক তখনি বর্তমান যুগের সব থেকে বিশিষ্ট এই বাঙালী চির বিশ্রাম নিলেন। জাতির সেবায় তাঁর মূল্য খুব বেশী ছিল, কিন্তু সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক এমন কাউকে তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করার জন্য রেখে যেতে পারলেন না। ["In the prime of life, with his task only begun, not finished, the most remarkable Bengalee of the age has gone to his eternal repose leaving no one to succeed to the inheritance of glorious usefulness to his

people"] দেশীয় সমাজের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় তবু ও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, হরিশ যে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে ভীষণ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেখানে তিনি ছিলেন একক ও সহায়হীন ["in the path struck out for himself, he stood single and alone to fight the great fight to which he had consecrated himself "] "যে সময় পড়েছে সেই সংকটকালে দেশীয় সমাজে যে নেতার আবির্ভাব হয়েছিল- যাকে জনগণ নেতৃত্ব ভার দিয়েছিল তাঁর মহাপ্রয়াণ তাই দেশীয় সমাজের কাছে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছে। বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনের ফলে এই জাতির মধ্যে একতা ও জাতীয়তা বোধ বিস্ময়কর ভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল, স্বদেশ-প্রেম নামক বস্তুটি এদের চেতনায় হারিয়ে গিয়েছিল। যারা এদেশ বলপূর্বক অধিকার করে নিয়েছে তাদের অত্যাচার ও অন্যায় কাজের জন্য কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের যে প্রয়োজন একথা মুহূর্তের জন্যেও এরা মনে স্থান দেয়নি। এদেশ বাসীর মধ্যে সর্ব প্রথম হরিশই তাঁর দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে এবং পরপক্ষের সম্মানহানি না করে কি করে দাবী আদায় করে নিতে হবে। তার প্রতিপক্ষ ছিল দুটি—শাসক গোষ্ঠী (Govt.) এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী ইউরোপীয় সমাজ। এই দুই গোষ্ঠীরই সংস্পর্শে দেশীয় সমাজকে আসতেই হয়। নিজ নিজ স্বার্থেই দেশীয় ও ইউরোপীয় দুটি গোষ্ঠিকেই পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয়। হরিশ্চন্দ্রের লেখার মধ্যে উগ্রতা ছিল না, তাঁর লেখাগুলি সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হত। গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিচালনায় এর প্রভাব পড়ত, এবং এর ফলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটত। সরকারের বাইরে যে সাধারণ সমাজ যাদের সঙ্গে অত্যাচার বা প্রতারণামূলক কাজ কর্মের কোন সম্বন্ধ নেই তারাও সবাই হরিশ্চন্দ্রের রচনার অনুরাগী ছিলেন।* ....হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় জনমতের প্রতিফলন হত এটা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সুবিধাজনকই প্রমাণিত হয়েছিল কারণ এতে তাদের শাসন কার্য পরিচালনার নির্দেশ থাকত কাজেই হরিশ্চন্দ্র গভর্ণমেণ্ট কেই সাহায্য করেছেন এটা বলা যেতে পারে।

নীল বিদ্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্র যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে মানুষের নিজস্ব অধিকারে বিশ্বাসী কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। নীল ব্যবসায়ে কিছু বেসরকারী ব্যবসায়ী মানুষের জন্মগত অধিকার পদদলিত করে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে চেয়েছিল।

* "...his writings, had a most whole some effect on the conduct of government and commended the admiration of all not directly interested in fraud and injustice']—কিনিয়ের এই মন্তব্যটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে জুয়াচুরি ও প্রতারণায় অভ্যস্ত নীলকরগণ ব্যতীত অপর ইউরোপীয়েরা হরিশ্চন্দ্রের রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন।

যে অত্যাচার গভর্ণমেণ্ট সংযত করতে পারেননি, অথবা সংযত করতে চান নি, বাঙলার সমগ্র জমিদার মণ্ডলী যে অত্যাচার দমন করতে ভয় পেয়েছিল সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ব্যক্তি ছিলেন হরিশ্চন্দ্র, যিনি জনগণের ইচ্ছানুসারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সংগ্রাম একটি পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছে। এটা হচ্ছে যে প্রচুর অর্থ এবং সৈনিক (লাঠিয়াল) হাতে নিয়েও একটি বহু প্রচলিত পুরাতন অন্যায়কে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। অত্যাচারিত মানুষদের কাছে গিয়ে বলতে হবে, তাদের ন্যায্য অধিকার অন্যে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে। মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের ঈশ্বর একটা বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন, এই শক্তি নিয়েই তারা জয়ী হয়ে থাকে। চাষীদের যখন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা শৃঙ্খলিত দাস নও, তখন আর তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা সম্ভব হয়নি। সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিগুলি একসঙ্গে মিলে কি ইতালীকে পদানত রাখতে পেরেছিল?……হরিশ লেখা পড়া বেশী করতে পারেননি; খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন সুরু হয়। কিন্তু তাঁর ভিতরে এমন একটা কিছু ছিল দারিদ্র্য যেটাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। পরিশ্রম শক্তি ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সমাবেশ তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল, এরই বলে তিনি সরকারের কাছে এবং তাঁর দেশবাসীর কাছে অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে বহু সাহায্য প্রার্থীর সমাগম হত। অর্থ ও অন্যবিধ সাহায্য তাঁর কাছে চাওয়া মাত্রই পাওয়া যেত। তিনি এত উদার ও মুক্ত হস্ত ছিলেন যে কিছুই সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি। তাঁর ভাগ্যে নিজের খুসিমত কিছু উপভোগ করাও ঘটত না, কারণ তাঁর জীবন উপভোগের এই অবসরও জুটত না।…

এই প্রবন্ধটিতে পরিশেষে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে দেশবাসী নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে [**"It will rest with the native community whom he signally served without fear or reward for so many years, whether his family is to be well looked after…of course the memory of such a man can not be allowed to pass away with the present generation, and we shall be glad to our native friends, hastening themselves suitably in the matter." [The Phoenix 17. 11. 1861]**

হিন্দু পেট্রিয়টের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা নিউজ'। নীলকরদের অর্থে এটি প্রকাশিত হত। হরিশের মৃত্যুর কিছুদিন পর পত্রিকায় লেখা হয় হরিশ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সেবায় প্রাণ

উৎসর্গ করে গিয়েছেন, এটা সন্তোষের বিষয় যে কলকাতাবাসী তাঁর ঋণ স্বীকার করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে চলেছে। হরিশের শত্রু পক্ষীয় বলে গণ্য এই পত্রিকার মর্মস্পর্শী মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

["The natives of Calcutta have acted nobly by marking their appreciation of the worth of him who in his poverty could give them his lamp and his constitution alone, but this was all that good Hurrish could afford to give and it was done cheerfully. Twelve years of useful disinterested and trully philanthropic labour he had paid down at the feet of his mother country and she is generous and present in responsing to the summons to perpetuate the memory of a beloved son" (৯ আগস্ট, ১৮৬১ হিন্দু পেট্রিয়টে উদ্ধৃত)]।

ইউরোপীয় মালিকানায় প্রকাশিত ও কিশোরী চাঁদ মিত্র সম্পাদিত পত্রিকা ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল- "রামমোহন রায়ের মত দেশীয় মহৎ ব্যক্তিগণ দেশবাসীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টিত ছিলেন। এঁদের নামের সঙ্গে দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা জড়িত হয়ে আছে। আর একদিকে হরিশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তিনি ছিলেন নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নির্লজ্জ কৃষক-পীড়নের, ভাগ্যান্বেষীদের (interloper) অবাধ অত্যাচার ও সরকারী কর্মচারীদের বেআইনি কাজকর্মের প্রবল শত্রু। ক্ষমতার অপব্যবহার আইন সম্মত ভাবে প্রতিরোধ করাই ছিল তাঁর নীতি। বাঙলা দেশ আজ তাঁর শোকে কাতর-এখন দুচার কথায় তাঁর চরিত্র বর্ণনা করার সময় নয়···। তাঁর কাগজ হিন্দু পেট্রিয়টেরপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম। রাজনৈতিক বা অপর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনায় তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বোধের পরিচয় পাওয়া যেত।

লর্ড ডালহৌসির দেশীয় রাজ্য গ্রাস নীতির প্রবল বিরোধিতা তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসির চোখে সংবাদিক হিসেবে তাঁর স্থান অতি উচ্চ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনায় ব্রিটিশ জাতি বিশেষ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিল। এরা প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত ইংরাজ এবং ভারতের জনগণ এই দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেশে তখন এক দারুণ দুর্দৈব দেখা দিয়েছিল। বেসরকারী সম্প্রদায় প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে লর্ড ক্যানিংএর দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাঁকে

গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে অপসারণের দাবীও তারাও তুলেছিল। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্র একদিকে দেশবাসীকে বৈধভাবে গঠিত সরকারকে সহায়তার আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই সরকারকে ন্যায় বিচারের পথ নিতে সজাগ করেছিলেন। বিদ্রোহ দমনের নামে নিরীহ জনগণকে দমন পীড়নের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। অসহায় প্রজার তিনি ছিলেন বন্ধু ও পরামর্শ দাতা। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন নীলকরদের এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। এই নীলকর-শত্রু হরিশের হাতে এত তথ্য ও যুক্তি থাকত যার কাছে নীলকর পক্ষের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠত। হিন্দু পেট্রিয়টে যে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন সেটি তার চরিত্রের গুণাবলীকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। এই লেখাগুলি থেকে একজন অসাধারণ বাঙালী পুরুষের একাগ্র ও অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট রয়েছে। হরিশ্চন্দ্র অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন, এই ধীশক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল বিচারবোধ ও স্থৈর্য (He was a man, great, robust and massive), তিনি বুঝেছিলেন এমন একটা সময় এসেছে যখন দেশবাসীর রাজনৈতিক জাগরণ আশু প্রয়োজন। তাঁর সব কিছু শক্তি ও দুর্বলতাকে হরিশ্চন্দ্র দেশের রাজনৈতিক জাগরণের কাজে লাগিয়ে ছিলেন, কারণ তাঁর মনে বিশ্বাস জেগেছিল এটাই তাঁর পরম কর্তব্য। তাঁর এই কর্মোদ্যমে যারাই বাধার সৃষ্টি করত তাদেরই তিনি শত্রু মনে করতেন। দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ছিল, কিন্তু এসবের চেয়েও দেশবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টি তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি স্পষ্টভাবেই বলতেন সর্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক অধিকার, দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেয়ে এর প্রয়োজন বেশী। অনেকে এজন্যে তাঁকে একজন ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক বলে মনে করতেন। যাইহোক, হরিশ তাঁর মত পরিবর্তন করেননি, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনেই তিনি অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন।

......হরিশ্চন্দ্র আশাবাদী দেশপ্রেমিক ছিলেন, তিনি দেশের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন। হরিশের অন্তঃকরণ ছিল সরল ও আন্তরিকতা পূর্ণ, মহৎ এবং উদার। তিনি দানেও মুক্ত-হস্ত ছিলেন। আতিথেয়তা কাকে বলে তা তিনি জানতেন। যে কোন পরামর্শ বা সাহায্য প্রার্থীর কাছেই তাঁর গৃহ-দ্বার ছিল অবারিত। অনেক সময় তাঁকে সাহায্য-প্রার্থীদের জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হত এবং তিনি এই ত্যাগ স্বীকারে কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না। কে না জানে যে আত্ম-স্বার্থ বিসর্জন না দিলে দেশকে ভালবাসা সম্ভব নয়" (ইণ্ডিয়ান ফীল্ড, ২২. ৬. ১৮৬১)। হরিশের শত্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় পরিচালিত 'বেঙ্গল হরকরুতে, হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ জনৈক দেশীয় সংবাদদাতার দ্বারা প্রেরিত রূপে চিহ্নিত হয়ে বিনা মন্তব্যে নিম্ন-

লিখিত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল "গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপিত করছি। .....তিনি বহুদিন ধরে জটিল পীড়ায় ভুগছিলেন। ....তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী তাদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ও একজন উৎসাহী দেশ-প্রেমিককে হারিয়েছে। গত বার বৎসর ধরে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা পরিচালন করে গিয়েছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ টাউনসেণ্ড তাঁর কোন কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে এই ধরণের লেখার জন্য লণ্ডনের সাংবাদিকেরা ও গর্ববোধ করতে পারেন" ["He conducted the Hindoo Patriot most ably and cleverly and some of his editorials as remarked by Mr. Townsend, late of Friend of India done credit even to Englishmen in London. Bengal Harkaru 17. 6. 1861"]*

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর মফঃস্বলের নানাস্থানে তাঁর জন্য শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বহরমপুর কৃষ্ণনগর, জঙ্গীপুর ও নড়াইলে অনুষ্ঠিত শোকসভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

* এই সময়ের Friend of India ও Englishman পত্রিকা দুটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে এই পত্রিকা দুটির মতামত জানা যায় না। যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় হরিশের মৃত্যুর পর Englishman পত্রে তাঁর প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের দ্বারা একটি জনসভা আহুত হয়। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভা আহ্বান করেন—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার), প্রতাপচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া), রমানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, সত্যশরণ ঘোষাল (ভূকৈলাস), ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর), প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, (উত্তরপাড়া) আব্দুল লতিফ ও আমীর আলি।

৪ঠা জুলাই প্রচারিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভা কক্ষে (১, লার্কিনস লেন, কলিকাতা) বাবু রমানাথ ঠাকুরের (পরবর্তী কালে রাজা) সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভারম্ভের পর রামগোপাল ঘোষ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন "এই সভা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে দেশীয় সমাজের যে নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তার জন্য গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছে। বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সকল কর্মক্ষমতা ও অক্লান্ত উদ্যম দেশবাসির হিতার্থে উৎসর্গ করেছিলেন।" এই প্রস্তাবটি সত্যশরণ ঘোষাল (ভূকৈলাস রাজ) কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর রামগোপাল ঘোষ নিম্নলিখিত মর্মে ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দান করেন, ..."গত দশ বৎসর যাবৎ হরিশ্চন্দ্রকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখনই আমার মনে হয়েছিল এই যুবকের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে সেটা শীঘ্রই বিকশিত হয়ে উঠবে। তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা বেশ চমকপ্রদ ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ঘটায় এই প্রতিষ্ঠান প্রচুর লাভবান হয়েছিল। হরিশ এই প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের সদস্য ছিলেন না, যাঁরা শুধু মাথা নেড়ে নিজেদের সম্মতি জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেন। তিনি সেই ধরনের সদস্য ছিলেন যাঁরা কাজ করেন। তাঁর উপর যে কাজের ভার দেওয়া হত, তা তিনি সম্পন্ন করতেন। কাজ ঘাড়ে চাপার জন্য কোন অভিযোগ তিনি করতেন না, নিজের আপিসের কাজ সেরে এসে তিনি এসোসিয়েশনের কাজে বসতেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে মোম-

বাতি জ্বেলে তাঁকে কাজ করতে দেখা যেত, অনেক সময় মোমবাতিও জুটত না, তবু তিনি এসোসিয়েশনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যেতেন। এই ভাবে তিনি এই এসোসিয়েশনের একটি বিশাল স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন, যে এসোসিয়েশন ভারতের এই প্রান্তে দেশীয় মানুষদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এই সেবার জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। তবে শুধু এই জন্যই নয়, তাঁর প্রতি দেশবাসী আরও বহু বিষয়ে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে গিয়েছেন। যখন ঐ কাগজটি প্রবর্তিত হয়, তখন দেশের সামনে 'চার্টার য়্যাক্ট' বিষয়ে একটি গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এই নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদও চলেছিল। এই 'চার্টার য়্যাক্ট' বিষয়ক আলোচনায় তিনি সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে তিনি গভর্ণমেণ্ট ও স্বদেশ উভয়েরই মঙ্গল সাধনের জন্য বেশ ধীরতা ও বুদ্ধি তার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেন। ইংরাজ জাতি সিপাহীদের কাজকর্মে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছিল, তাদের ক্ষোভেরও যথেষ্ট কারণ ছিল। হরিশচন্দ্র অতি ধীর ভাবে সতর্কতার সঙ্গে এই জাতি-বৈরতা সংযত করেছিলেন। দেশবাসীর হিতচিন্তক হরিশচন্দ্র বন্যার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় বাঁধের মত দাঁড়িয়ে এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রতিরোধ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর অচঞ্চল নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সকলের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিস্ময় আকর্ষণ করেছিল। হরিশ শুধু প্রতিষ্ঠান বিশেষের কার্যকরী সমিতির সদস্য রূপে কার্য বিবরণ, আবেদন ইত্যাদি লেখাতেই দক্ষ ছিলেন না। বহু জনের অন্তর স্পর্শ করার মত লেখকও তিনি ছিলেন। নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে নিজের কাগজের লেখাতেই নিয়োগ করতেন না, অন্যের প্রয়োজনেও তাঁকে অনেক লিখতে হত। যে কোন লোক যখনই কোন বিপদে পড়ত সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তখন তার কাছে একটি মাত্র পথ খোলা থাকত। সেটি হল, হরিশের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা। লোকটি যতই দরিদ্র বা নগণ্য হক না কেন, হরিশ তা গ্রাহের মধ্যে আনতেন না। সাহায্য প্রার্থী পরিচিত, অপরিচিত, ধনী বা দারিদ্র এসব চিন্তা তিনি করতেন না। তিনি শুধু দেখতেন যে শরণাপন্ন ব্যক্তির অভিযোগ সত্য কিনা, তার প্রতি কেউ অবিচার করেছে কিনা? অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর স্বভাব ধর্ম। এরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর আর এক কাজ ছিল তাঁর ধনী বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে তাদের দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষাদান তথা অনুরোধ। ধনী ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দরিদ্রের প্রতি মমতাবোধ সঞ্চারের এই প্রচেষ্টা হরিশ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এক সময়ে হরিশকে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণের কথা উঠেছিল, হরিশ এর জন্য প্রস্তুতও

ছিলেন কিন্তু সামাজিক প্রথা তাঁর কালাপানি পার হওয়ার অন্তরায় হয়েছিল। হরিশের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। হরিশ আইনজীবী ছিলেন না, আইন ব্যবসায়ের সনদ তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি এত তীক্ষ্ম ছিল যে আইনের জটিল ব্যাপার গুলির মধ্যে তিনি সহজেই প্রবেশ করতে পারতেন। ওকালতি ব্যবসায় রত হলে তিনি সদর আদালতে একজন প্রথম শ্রেণীর আইনজীবী রূপে পরিগণিত হতে পারতেন। এক সময়ে আমি তাঁকে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলাম, আর একবার আমি তাঁকে ব্যবসায় বাণিজ্যে নামাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি গত ত্রিশ বৎসর ধরে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছি, আমি আমার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। আমার পক্ষ থেকে হরিশকে বড়লোক করার এই দুই উদ্যোগেই হরিশ সাড়া দেননি। তিনি বলতেন যে তাঁর আপিসের সায়েব (মিঃ স্যাম্পনীজ) অসময়ে তাঁকে চাকুরি দিয়ে তাঁর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁকে পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া দশটা-পাঁচটা চাকুরির পর তাঁর হাতে যে সময় থাকে সেই সময়টা তিনি দেশ ও দেশবাসীর বিশেষতঃ বিপন্ন মানুষের সেবা করার সুযোগ পান। ওকালতি বা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলে কারো কোনো সেবা করার সময় তাঁর হাতে থাকবে না।" রামগোপালের পর সভায় ভাষণ দেন 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮২২-১৮৭৩ কিশোরীচাঁদের ভাষণের মর্মানুবাদ নিয়ে দেওয়া হল…"তাঁর চরিত্র এত গুণাবলী মণ্ডিত ছিল যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁদের আসার সুযোগ ঘটত, তাঁরা তাঁকে গভীরভাবে ভাল না বেসে থাকতে পারতেন না। …তিনি ছিলেন সরল ও অকপট। এই সারল্য ও অকপটতা তাঁকে অভ্যাস করতে হয়নি, এটি ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর হৃদয় ছিল আন্তরিকতা ও উদারতায় পরিপূর্ণ। তাঁর মন ও মুখ এক ছিল, মনে এক মুখে অন্য এক এই স্বভাব তাঁর ছিল না। কেউ তাঁর দয়া প্রার্থনা করে কখনও হতাশ হয়নি। অপরের দুঃখ কষ্ট নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করা এবং তাতে সাড়া দেওয়া তাঁর স্বভাব ধর্ম ছিল। অপরের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারতেন না…নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তিনি বিপন্নের যতটা সম্ভব দুঃখমোচনের চেষ্টা করতেন। দানে যেমন তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন, তাঁর হৃদয় ও সেই পরিমাণে উন্নত ছিল। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন শুধু তাঁরাই জানেন যে অপরের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তিনি নিজ হৃদয়ে কত গভীরভাবে অনুভব করতে পারতেন। আমি একথা অবশ্যই বলতে চাইছি না, যে তাঁর দানের অঙ্ক খুব বিরাট ছিল বা তাঁর কাছে উপকৃত মানুষের সংখ্যা খুব বিরাট ছিল। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে হরিশ্চন্দ্রের আয় খুব সীমিত ছিল, এবং তাঁর নিজের সুযোগ সুবিধাগুলিও বেশী ছিল না। এই সীমিত ক্ষমতা থেকেই তিনি যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতেন সেটাই ছিল বিস্ময়জনক।

বাবু হরিশ্চন্দ্রের মহত্ব ছিল স্বভাব সিদ্ধ। অপরের দুঃখ মোচনের কাজে তিনি অশেষ শ্রম স্বীকার করতেন, স্বার্থত্যাগ করা ছিল তাঁর পক্ষে আনন্দজনক আর এটাই হল প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্র-লক্ষণ। নিজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেশের মঙ্গলের জন্য যিনি হরিশের মত অকাতরে বলি দিতে পারেন, তাঁকেই আমরা প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক আখ্যা দিতে পারি। হরিশের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার কথাই লোকে বিশেষভাবে জানে, কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে তিনি কত মহান পুরুষ ছিলেন সে কথা বেশি লোকে জানেন না। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন শুধু তাঁরাই তাঁর চরিত্রের এই দিকটির বিষয় জানেন। আমি এই জন্য আজ হরিশের হৃদয় কত মহান ছিল তার পরিচয় তুলে ধরতে চাইছি। হরিশের চিন্তাশীলতা, সতেজ বোধ-শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি বিশ্লেষনী শক্তি, অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও তাৎপর্য বোধ প্রভৃতি মানসিক গুণাবলীর কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন কারণ হরিশের এই গুণাবলীর কথা সকলেই জানেন ও স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দু পেট্রিয়টের উৎপত্তি, কিভাবে হরিশের সম্পাদনায় এটির উন্নতি হয়েছিল, কি ভাবে হরিশ এটিকে বাঙলার দেশীয় সমাজের চিন্তা-ভাবনার দর্পণরূপে গড়ে তুলেছিলেন, কি নির্ভীকতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও সাধারণ অবস্থার পর্যালোচনা করতেন, স্বার্থলেশ না রেখে কিভাবে দরিদ্র ও অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে প্রবলের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের মাধ্যমে লড়াই চালিয়েছিলেন এসব খবর সকলেরই জানা আছে। হরিশ ছিলেন অত্যাচারিতের সহায় এবং অত্যাচারীর শত্রু। গত দশ বৎসর কালের মধ্যে দেশের এক বৃহৎ জন সমষ্টির উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সম্ভবতঃ আর কোন হিন্দু নেতা এ যাবৎ তা পারেননি। দমন-পীড়নের বিরোধিতাই তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ। হরিশের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ বড় ধরনের ছিল, এতে কোন গলদ ছিল না, এলোমেলো ও অবাস্তব স্বপ্নালুতা থেকে তাঁর চিন্তাশক্তি ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। এই যুক্তি নির্ভরতা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হত,এই জন্যই তাঁর মতামতগুলি সকলের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। এই যুক্তি-নিষ্ঠা তিনি নিজে চেষ্টা করে অর্জন করেছিলেন এবং এই যুক্তি-নিষ্ঠা তাঁর সঙ্গে তাঁর পাঠকের একটা হৃদ্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলত। তাঁর মতামতগুলি ছিল মৌলিক ও বিচার বুদ্ধি সহ জাত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন না, অলীক কল্পনার দ্বারা তিনি চালিত হতেন না। রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তবেই তিনি কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে উচিত মত পন্থা গ্রহণ করতেন। ···গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা এবং সদ্‌ভাবনা পূর্ণ তাঁর রচনাগুলি শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর উপর একটা হিতকর প্রভাব বিস্তার করতে পারত। দেশের শাসন ব্যবস্থায় আধুনিক কালে যে সব হিতকর পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে তার মূলে হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর দান নগণ্য নয়।

সিপাহী বিদ্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্র যেভাবে লেখনী পরিচালনা করেন তার জন্য দেশবাসীর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। বিশেষ দক্ষতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর কিছু কিছু রচনা বেশ আক্রমণাত্মক ছিল, তবে একথা স্বীকার করতে হয়, তাঁর এই উত্তেজনার পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে এক ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল, কৃষ্ণচর্মের প্রতি অন্ধ ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিচালিত ইউরোপীয় সমাজ যখন ভারতবাসী মাত্রেরই উপর প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্র সেই সময় ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের দাবী তুলেছিলেন।

নীল বিদ্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্র এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যও দেশবাসীর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। পদদলিত ও ক্রীতদাসবৎ দাসত্ববদ্ধ বাঙলার কৃষককে তিনি শুধু মুক্তই করেননি, তাদের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় তার জন্যও তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হরিশ্চন্দ্র নীলচাষ প্রথা যে আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা প্রকাশিত করেন। তাঁর এই কণ্ঠস্বর বহুজনের কাছে পৌছেছিল। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এই কাজে প্রকাশ পেয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য ছিল হরিশ্চন্দ্রের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। তাঁর স্বভাব ছিল যে কোন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরোধিতা। অত্যাচারী দেশীয় কি বিদেশীয় এটা তাঁর বিচার্য ছিল না। তিনি ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করতেন দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধেও ঠিক তেমন ভাবেই সংগ্রামে নামতেন। শ্বেতকায় রাজ কর্মচারীদের অত্যাচার যেমন বরদাস্ত করতেন না ঠিক তেমনি দেশীয় সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারও তিনি সহ্য করতেন না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধতাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। অন্যায়কারী দেশীয় জমিদার, ইউরোপীয় নীলকর অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট কেউই তাঁর সমালোচনা ও আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। কৃষক প্রজা বন্ধু হরিশ কৃষক প্রজাদের অন্যায় আচরণেরও নিন্দা করতে ভুলতেন না। ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনও সহ্য করতেন না। শাসক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি সরকারী ব্যবস্থার প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। (Rent law) খাজনা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় হরিশ এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ এই আইনে প্রজাদের বিশেষতঃ ঠিকা প্রজাদের (under tenure) স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছিল। ["When the rent law was enacted he was the first to hail them as declarations of the just and constitutional rights of ryots and under-tenure holders"] *

---

* Rent law-সম্পর্কিত হরিশ্চন্দ্রের রচনা থেকে আধুনিক কোন কোন গবেষক প্রমাণ

হরিশ বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার আগে তিনি ভাল করে জেনে নিতে চেয়েছিলেন যে দেশবাসী তার প্রাত্যহিক জীবনে এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কিনা। ["Hurrish was essentially a patriot, not a dreamy or unpractical patriot, revelling in visions of liberty, but one who enquired whether every day life in Bengal hold in it an answer to his generous aspirations...."] তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কিন্তু আত্ম-গর্বী ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মত মহৎ কাজে নেতৃত্ব করার উচ্চাশা তাঁর ছিল না, তবে তিনি এই উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত দেশ প্রেমিকের মধ্যে যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন সে গুণগুলি তাঁর ছিল। নিজেই যে নেতৃত্ব ভার তিনি স্কন্ধে নিয়েছিলেন তার দায়িত্ব পালনে তিনি তাঁর দেহ-মন উৎসর্গ করেছিলেন। রাজনৈতিক পঙ্গুতার অভিশাপ থেকে তাঁর দেশ ও দেশবাসীকে উদ্ধার করাই ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। তাঁর এই সাধনার জন্য সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য। এমন একজন মানুষের স্মৃতি লোপ পাবে এমন সম্ভাবনা নেই। সহস্র সহস্র শিক্ষিত দেশবাসীর মনের মন্দিরে তিনি যেমন স্থান পাবেন লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত মানুষও তেমনি ভাবে হৃদয় মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসী শুধু তাঁকে মনে রাখবে না সেই সঙ্গে তাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে থাকবে। আমাদের এবং আমাদের দেশ-বাসীর উচিত কর্তব্য হবে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির স্মৃতিরক্ষা করা। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও যাতে তাঁকে স্মরণ রাখতে পারেন তার ব্যবস্থা করাও আমাদের কর্তব্য হবে।"

অতপর আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) প্রয়াত এই মহাপুরুষের স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন যে "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোন বিশেষ স্বার্থ বা সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন না, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ও সমগ্র দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যে শুধু হিন্দু জাতির সেবায় নিরত ছিলেন একথা মনে করা উচিত নয়। তাঁর কর্মশক্তি মুসলমান, খ্রীষ্টান সব সম্প্রদায়ের কল্যাণেই নিয়োজিত ছিল। বনাঞ্চলের অধিবাসী ভীলদের * দুখ কষ্ট মোচনেও তিনি তৎপর ছিলেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এদের কৃতজ্ঞতাও

করবার চেষ্টা করেছেন যে হরিশ্চন্দ্র জমিদার গোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ ছিলেন [errand boy of the zamindars], কারণ তিনি এই আইনের কিছু বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন যেহেতু এটি জমিদারী স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কিশোরীচাঁদের সাক্ষ্য থেকে আধুনিক গবেষকদের ধারণা যে ভুল এটা প্রমাণিত হয়।

* সম্ভবত: 'ভীল' কথাটি 'সাঁওতাল' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

হরিশের প্রাপ্য। হরিশ কোন সম্প্রদায় বিশেষের সেবক ছিলেন না, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র দেশেরই সেবক ছিলেন। এই মন্তব্যটি তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজেরই এটা যে মনের কথা এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত"।

["What he said about the late lamentable Hurrish Chunder was also the feeling and sense of the entire Mahomedan community"] এরপর আব্দুল লতিফ সাহেব হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে নির্বাচিত কমিটি গঠিত হওয়ার পর কমিটির হাতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও মফঃস্বলে স্মৃতিরক্ষা সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। আব্দুল লতিফ কমিটির সদস্যরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করেন-(১) রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (২) রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর (৩) রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (৪) বাবু রমানাথঠাকুর (৫) বাবু রামগোপাল ঘোষ (৬) বাবু দিগম্বর মিত্র (৭) বাবু তারিনীচরণ বন্দোপাধ্যায় (৮) শম্ভুনাথ পণ্ডিত (৯) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১০) প্যারীচাঁদ মিত্র (১১) কিশোরী চাঁদমিত্র (১২) রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৩) জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৪) যাদবকৃষ্ণ সিংহ (১৫) চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮) ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২০) যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (২১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২২) মৌলভী আব্দুল লতিফ ও (২৩) কৃষ্ণদাস পাল (সদস্য ও সম্পাদক)। মৌলভী আব্দুল লতিফ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন যে তাঁর বিশ্বাস রাজা রামমোহন রায়ের পর হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় মানুষ। ["Hurrish Chandra Mookherjee, he belived was the greatest Hindoo that had lived since the days of the Raja"] তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রাণ দিলেন, এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের মর্যাদা হানি না করেও একথা বলা চলে। চতুর্দশ বৎসরেরও অধিক কাল ঘনিষ্ঠতার ফলে একথা বলতে তাঁর দ্বিধা নেই যে 'ভদ্রলোক' বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর মত প্রকৃত ভদ্রলোক মেলা কঠিন। সাধারণ কাজকর্মে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত। কর্মে তাঁর নিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে এইটিই তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। নিজের আপিসে তাঁর উপর কাজের চাপ খুব বেশি ছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও আপিসে যেতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর শরীরের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে অন্য যে কোন ব্যক্তির পক্ষে শয্যা ছেড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল, আপিস যাওয়া ও কাজ করা ত দূরের কথা। গুরুতররূপে অসুস্থ হয়েও কেন তিনি আপিসে ছুটির আবেদন করেননি তার কারণটি তিনি মৃত্যুদশায় জানিয়ে দিয়ে যান। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর

আপিসের বিলাতী কর্তাদের তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে একজন বাঙালীও নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তার কর্তব্য পালন করতে জানে। অতঃপর গিরিশচন্দ্র এই আশা প্রকাশ করেন যে দেশবাসীর সক্রিয় সহায়তায় স্মৃতি রক্ষা কমিটি তাঁর পরলোকগত সুহৃৎ মহান পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। গিরিশচন্দ্রের পর কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ব্যারিস্টার মিঃ মণ্টিয়ো একজন ইংরাজ হিসেবে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে যদিও খুব কম সংখ্যক ইংরাজ সভায় এসেছেন তবুও তিনি বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছেন যে বহু ইংরাজ এই অতি বিশিষ্ট পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মসূত্রে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উল্লেখ করে মিঃ মণ্টিয়ো বলেন যে— হরিশের কর্মদক্ষতা দেখেই শুধু তিনি মুগ্ধ হননি তাঁর চরিত্র ও সৌজন্যও তাকে মুগ্ধ করেছিল। এই মানুষটির মহৎ চরিত্র ও লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার কোন কারণই তাঁর অভিজ্ঞতায় ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের বহুবার সাক্ষাৎ ও রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও গুণাগুণগুলি সবই জানেন এমন গর্ব তিনি প্রকাশ করছেন না, তবে তাঁর ধারণা যে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে চিনতে ভুল করেননি। মিঃ মণ্টিয়ো আরও বলেন যে হরিশ্চন্দ্র বিশেষ কোন দল বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন এমন কথা বলা বা ভাবা ভুল হবে। তিনি বলেন যে অদ্যকার এই সভায় বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি সমবেত দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ কি এটা দাবী করতে পারেন যে হরিশ তাঁদের মধ্যে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন? তিনি এঁদের কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি [He has lashed you all]। মিঃ মণ্টিয়ো সভায় উপস্থিত সভ্যদের সম্বোধন করে বলেন আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা হরিশের গালাগালি খেয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সবাই এসেছেন। হিন্দু জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে পুরোভাগে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, দোষ ত্রুটিগুলি সংশোধনেরও চেষ্টা করে গিয়েছেন ["He stood in the van ,a guide, a champion, a censor, champion for the Hindoos certainly for their progress, politilcal and social."] ইংলণ্ডে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আপনারা তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, এই নির্বাচন বেশ সঙ্গতই হয়েছিল তিনি উচ্চবংশজ ছিলেন (ফুলিয়া মেলের কুলীন ব্রাহ্মণ) কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি সত্যানুসন্ধানী ছিলেন, কোন অন্ধ বিদ্বেষ, ভয় অথবা স্বার্থপরতা তাঁকে কর্তব্য

ভ্রষ্ট করতে পারত না। যেটা তিনি ন্যায্য বলে বিচার করতেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করতেন। ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি লড়াই করতে ভয় পেতেন না, তাঁর মেরুদণ্ড ছিল ইংরাজদের মেরুদণ্ড। হরিশের মেরুদণ্ড ইংরাজদের মত ছিল বলার জন্য আমি ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ডহীনতার ইঙ্গিত করছি না, দৃঢ় চিত্ততা ও নির্ভীকতার ক্ষেত্রে 'English Backbone' এই শব্দাবলী একটি বাগ্‌ধারা (idiom), আমি এই বাক্‌ধারাটিই ব্যবহার করতে চেয়েছি। বহু ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্যের কারণ ঘটেছে, আমি এক্ষেত্রে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতাম যে আমি ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী ছিলেন, তাঁর মন ও মুখ একছিল, এজন্য আমি তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। উত্তেজিত ভাবে তিনি কখনও কখনও তীব্র ভাষার প্রয়োগ করতেন। বিশেষ কোন পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তির (advocate) এই তীব্র ভাষা ব্যবহারের অধিকারটি অবশ্য স্বীকৃত। মিঃ মণ্টিয়ো তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে একবার হরিশ্চন্দ্রকে একটি সম্মান ও উচ্চ বেতনযুক্ত পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।* হরিশ এই প্রলোভনের ফাঁদে পা দেন নি। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-কে বিসর্জন দিয়ে তার পরিবর্তে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রীর পদ গ্রহণেও তিনি অনিচ্ছুক। মিঃ মণ্টিয়ো আরও বলেন যে হরিশ কোন একটি বিশেষ ব্যাপারেই নেতৃত্ব দিতে পটু ছিলেন না, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি সঠিক পন্থা নির্বাচন করে নিতে জানতেন। তাঁকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা এটা স্বীকার করবেন যে হরিশের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা স্বভাবসিদ্ধ, তাঁর অসাধারণত্ব যে কোন ক্ষেত্রে এবং যে কোন সময়েই প্রকাশমান ছিল। হরিশ যদি এদেশে না জন্মে অন্য কোথাও জন্মাতেন, তথাপিও তিনি একজন অসামান্য পুরুষ রূপে পরিগণিত হতেন ["his superiority was intrinsic and must have shown himself at any time and any place"] মিঃ মণ্টিয়ো একটি উপমা দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেন যে শশার ক্ষেতে একটি 'ওক' গাছের চারা বসিয়ে দেওয়া হলে অল্পদিনের মধ্যে এই শিশু বৃক্ষ একদিন শাখা প্রশাখা সমন্বিত হয়ে বনস্পতির রূপ ধারণ করে থাকে। হরিশ্চন্দ্রও এই মহা-মহীরুহ বনস্পতি গোত্রের মানুষ ছিলেন। অতঃপর মিঃ মণ্টিয়ো বলেন যে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে কোন কোন মহল থেকে একটা অভিযোগ উঠে থাকে যিনি তিনি জমিদার শ্রেণীর তথা জমিদারি স্বার্থের সমর্থক ছিলেন। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে মিঃ

* লর্ড ডালহৌসি সরকারী একটি উচ্চপদে বসিয়ে হরিশ্চন্দ্রের সরকার তথা ইংরাজ বিরোধিতা সংযত করতে চেয়েছিলেন, পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ মণ্টিয়োর ভাষণ থেকে এই ঘটনায় সমর্থন লক্ষণীয়।

মণ্টি্‌য়ো মন্তব্য করেন যে হিন্দু পেট্রিয়টের স্তম্ভগুলি যদি কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে অসহায় নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষ নিয়ে হরিশ্চন্দ্র যে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, দেশীয় জমিদারদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রজাপীড়ক দেশীয় জমিদারেরাও তাঁর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য বস্তু ছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি থেকে হরিশ্চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় সব থেকে বেশি পাওয়া যাবে। এরপর মিঃ মণ্টি্‌য়ো সমবেত শ্রোতাদের কাছে বিশেষতঃ অর্থশালী ব্যক্তিদের নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে তাঁরা যেন এমন একটি স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন যার মারফতে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রকাশ অব্যাহত রাখা যেতে পারে। মিঃ মণ্টিয়ো এই আশাও প্রকাশ করেন যে অর্থ ভাণ্ডার (fund) থাকলে সুদক্ষ সম্পাদক ও লেখক নিয়োগ দ্বারা হিন্দু পেট্রিয়টের প্রকাশ ও মান অব্যাহত থাকবে এবং যে আয় হবে তার সাহায্যে হরিশের পরিবারবর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হতে পারবে। হিন্দু পেট্রিয়টের প্রকাশ অব্যাহত থাকলে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। মিঃ মণ্টি্‌য়ো আরও বলেন যে হরিশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য আর যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন তিনি তার সাফল্য কামনা করেন, তবে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রকাশ ও হরিশের পরিবার প্রতি-পালনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হবে। মিঃ মণ্টি্‌য়োর ভাষণের পর জাতীয়তাবাদী তরুণ যুবক নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪) হরিশের মৃত্যুর পর ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান রিফর্মারে প্রকাশিত বিরূপ মন্তব্যের বক্তব্যগুলি খণ্ডন করে একটি ভাষণ দেন।

সভায় হরিশ্চন্দ্রের নামে বৃত্তি প্রবর্তনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, অপর একটি প্রস্তাবে স্মৃতি রক্ষা কমিটিকে হরিশ্চন্দ্রের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠাসহ অন্য উপায়েও স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অতপর সভাপতিকে ধন্যবাদনান্তর সভা ভঙ্গ হয়। *

স্মৃতিরক্ষা কমিটির কার্যালয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আপিসেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জন সাধারণের নিকট অর্থদানের আবেদনে ঐ ঠিকানায় অথবা হিন্দু পেট্রিয়টের কার্যালয়ে অর্থ প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্মৃতি রক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য বিদ্যোৎসাহী তরুণ যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি আবেদন পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।** ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকা থেকে বোঝা যায় যে তৎকালে তরুণ যুবকদের মনের উপর

* হিন্দু পেট্রিয়ট (১৭. ৭. ১৮৬১) থেকে সংকলিত ইংরাজীতে প্রদত্ত ভাষণগুলির বাংলা মর্মানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

** মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপনের জন্য বঙ্গবাসিগণের নিকট আবেদন-কালীপ্রসন্ন সিংহ, সারস্বতাশ্রম, (কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগর), শকাব্দ ১৭৮২

হরিশ্চন্দ্র কতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এই জন্য এই পুস্তিকাটির উল্লেখ প্রয়োজন।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার সংবাদ পত্রে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি 'কমিটি' গঠিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বোম্বাইবাসীগণ তত্রস্থ জন সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রচার করেন। নিম্নে উদ্ধৃত এই আবেদন পত্রটি থেকে বোঝা যায় যে হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে সুদূর বোম্বাই বাসীগণ কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই আবেদন পত্রটি থেকে বোঝা যায় যে কলিকাতাবাসী বাঙালী হরিশ্চন্দ্র তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে শুধু মাত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সূত্রে নিজেকে সর্ব ভারতীয় নেতায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সম্বন্ধীয় আবেদন (Testimonial in memory of the late Baboo Hurrish Chunder Mookerjee of the Hindoo Patriot).

"কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়ট নামীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত মাসে ইহধাম পরিত্যাগ করে গিয়েছেন। এই ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সময়, উদ্যম ও প্রতিভাকে তাঁর দেশ-বাসীর স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত করেছিলেন। এই কাজে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধি ত দূরের কথা, এই কাজে তাঁর বহু ক্ষতি ও অর্থনাশ হয়েছিল; তাঁর এই নিঃস্বার্থ সেবা বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ রয়ে গিয়েছে। ["This individual, with praiseworthy disinterestedness devoted his time, energy and the talents to the cause of his fellow countrymen and did this not only without any gain to himself, but with much loss and expense and we owe a deep debt of gratitude to him"]

তাঁর হাতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজটি ছিল একটি শক্তিশালী অস্ত্র। এরই মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাতেন। ["This Hindoo Patriot was a powerful instrument in his hands for the advocacy of the rights and privileges of our countymen"] তিনি সার্থক নামা ছিলেন, নিজের কর্তব্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হতেন না। তাঁর মতামতগুলির মধ্যে নির্ভুল বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত এবং এই কারণে তাঁর মন্তব্যগুলি আমাদের শাসকদলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত, এবং তাঁরা এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় প্রবৃত্ত হতেন। [" ..his views and opinions were characterised by a soundness of judgement which commanded the respect and sound consideration of the rulers of the country"] আমাদের

দেশবাসীর হরিশ্চন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ থাকার সঙ্গত কারণ আছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি নির্ভীকতা সহকারে একক ভাবে দিনের পর দিন ন্যায়-বিচার ও সহৃদয়তার সঙ্গে বিদ্রোহ পরিস্থিতির মধ্যে দেশ শাসন যে উচিত একথা শাসক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দিতেন। কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত প্রায় সকল প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি এই নীতির বিরোধী ছিল। এই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহ-কালে লর্ড ক্যানিং সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশ ও দেশের অসংখ্য অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবহারে যে সুসভ্য নীতি অবলম্বন করেন, তার পেছনে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রেরণা অল্প ছিল না। বঙ্গদেশের হতভাগ্য নীলচাষীদের দুর্দশার কাহিনী সুবিদিত। মাত্র কিছুকাল আগে বিষয়টি সরকারীভাবে তদন্তের পর নীলচাষীর প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সদ্য-মৃত হরিশ্চন্দ্র নীল চাষীদের দুঃখ দুর্দশার বিষয় সরকারের গোচরীভূত করার কাজে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাবু হরিশ্চন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক সক্রিয় ও বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একথা সকলেই জানেন যে এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় দেশবাসীর কল্যাণকর বহু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে গভর্ণমেণ্ট জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বহু ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানেরই পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। পরলোক-গত হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত পরিমাণ উপকৃত হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র দেশবাসীর যে পরিমাণ সেবা করেছেন তা সামান্য নয়। এমন একজন মহান ও কৃতী পুরুষের স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার আমাদের দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর স্মৃতি যেন চিরস্থায়ী হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি অর্থ সংগ্রহ করে হরিশ্চন্দ্রের নামে ছাত্রদের বৃত্তি [scholarship] দানের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া স্মৃতি রক্ষার অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করা হবে। হরিশ্চন্দ্রের সম্মানার্থ স্মৃতি সভায় মিঃ মন্টিয়ো এই প্রস্তাব করেন যে হরিশের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা ছাড়াও যেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য একটি অর্থভাণ্ডার [endowment] সৃষ্টি করা হয়। এতদ্বারা শুধু হিন্দু পেট্রিয়ট সুপরিচালিতই হবে না, হরিশের পরিবার প্রতিপালনেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এটা বলা ভুল হবে যে হরিশবাবু শুধু বাঙলার জনসাধারণের উপকারার্থেই তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা উৎসর্গ করেছিলেন, বস্তুতঃ ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষই তাঁর সেবায় উপকৃত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কলকাতার ভ্রাতৃ-বৃন্দ হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহের যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের প্রদেশবাসীরও যুক্ত হওয়া উচিত। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার

ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশবাসীর সহযোগিতার একটা সুদূর প্রসারী সুফল এই হবে যে ভবিষ্যতে যাঁরা হরিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ সেবায় ব্রতী হবেন তাঁরা এই ভেবে উৎসাহিত হবেন যে দেশবাসী তাঁদেরও স্মৃতিরক্ষায় যত্নবান হবেন। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দেশের সকল প্রদেশেরই স্বার্থ এক। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অথবা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এই দুই প্রদেশবাসীই সমস্বার্থ বিশিষ্ট। কলকাতাবাসীগণ হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদকের স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার সঙ্গে যদি আমরা সহযোগিতা করি তবে আমাদের এই দুই প্রদেশের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য তথা ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হবে।...আমাদের বিশ্বাস আমাদের এই আবেদনে বোম্বাই প্রদেশবাসীগণ আন্তরিক ভাবে সাড়া দেবেন।

যাঁরা হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চাঁদা দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত তিন স্বাক্ষরকারীর যে কোন এক জনের কাছে তাঁদের নাম ও চাঁদার পরিমাণ জানিয়ে দেবেন। সংগৃহীত চাঁদা কলকাতায় হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত কমিটির এখান থেকে সংগৃহীত অর্থ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এর জন্য অথবা হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য কাজে খরচ করার স্বাধীনতা থাকবে।

ইতি স্বাঃ-*(১) ভাওদাজী (২ সোরাবজী সাপুরজী ৩) রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ। বোম্বাই, ১ আগস্ট ১৮৬১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর বোম্বাই থেকে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের নিকট উপরোক্ত তিন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত একটি পত্র সহ ২০০১ টাকার একটি বিল (cheque) প্রেরিত হয়েছিল। এই পত্রের মর্ম এইরূপ ছিল—"বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ এখানে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছিল কারণ বহু লোক তাঁর রচনা শক্তি ও দেশসেবার প্রচেষ্টার কথা জানেন। অত্রস্থ স্মৃতিরক্ষা কমিটির তরফ থেকে এতৎসহ প্রেরিত অর্থ হরিশের স্মৃতির প্রতি দেশের এই প্রান্তের অধিবাসিদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন। আমাদের প্রেরিত অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে তা আপনারাই স্থির করবেন। হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব যদি এখন হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গের হাতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে এই টাকা হিন্দু পেট্রিয়ট ফাণ্ডে আপনারা দিতে পারেন অন্যথায় এটা স্মৃতিরক্ষা কমিটির ইচ্ছামত খরচ করার অধিকার থাকবে।"

হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার আবেদন প্রচারিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রচুর সাড়া পাওয়া যায়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের অবসান

* ডাঃ ভাওদাজী (১৮২১-১৮৭৪) বোম্বাই শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বোম্বাই এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ হিসাবেও ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হওয়ার পূর্বেই স্মৃতিরক্ষা তহবিলে দশ হাজারের বেশি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। চাঁদা দাতৃগণের নামের তালিকায় দেশের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। কবি মাইকেল মধুসূদন স্থায়ী অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও ১০০০ টাকা দান করেন। আব্দুল লতিফ নিজে ২৫.০০ টাকা চাঁদা দিয়েই তৃপ্ত থাকেননি, সমাজের ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু এক টাকা চাঁদা নিয়ে একাধিকবার কিছু থোক টাকা স্মৃতিভাণ্ডারে জমা দেন। মফঃস্বলের স্মৃতিরক্ষা কমিটিগুলি তাদের সংগৃহীত টাকা কলকাতায় স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে পাঠাত। মফঃস্বলের দরিদ্র কেরানী, স্কুল পাঠশালার শিক্ষক ও উকীল মোক্তারেরা যথাসাধ্য চাঁদা দিতে কার্পণ্য করেনি।

স্মৃতিরক্ষা কমিটি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দিষ্ট করতে পারে নি। হরিশ্চন্দ্রের নামে ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হবে কিম্বা তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হবে এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। এই সময়ে জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের নিকট নিম্ন মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন—"হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে বহু লোকের মত এই যে হরিশ্চন্দ্রের নামে দু একটি ছাত্রবৃত্তির পরিবর্তে তাঁর নামে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি 'ভবন' নির্মিত হওয়া উচিত।

কমিটি যদি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন তবে আমি বাদুড়বাগান নামে সমধিক পরিচিত সুকিয়াস স্ট্রীটের উপর অবস্থিত কিঞ্চিদধিক দুই বিঘা ভূমিদান করতে প্রস্তুত— এই ভূমিখণ্ডের পূর্বে আপার সার্কুলার রোড ও উত্তরে সুকিয়াস স্ট্রীট্। দেশীয় মানুষ অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি প্রস্তাবিত ভবনের উপযুক্ত স্থান। ··· যতদূর জানি এ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র ভবনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার আশা এই যে এর জন্য প্রচুর টাকা আসতে থাকবে। আমি বহু চাঁদা দাতার সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, যে চাঁদা আসবে। হরিশ্চন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি পরিমিত চাঁদা শেষ পর্যন্ত না আসে, তবে টাকার জন্য কাজ আটকাবে না। বাকী টাকার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। প্রস্তাবিত এই ভবনটিতে থাকবে পাঠাগার, পাঠকক্ষ, বক্তৃতাদানের সভা-গৃহ ও নাট্য মঞ্চ সহ প্রেক্ষাগৃহ। মোটকথা সভ্য সমাজ অনুমোদিত আমোদ প্রমোদ গৃহও এটি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরলোকগত হরিশ্চন্দ্রের কাছে দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও ভাব বিনিময় খুব পছন্দজনক ব্যাপার ছিল। দেশীয়দের মধ্যে এমন একটি মিলন স্থানের অভাব আছে। কমিটি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমি এই দুই বিঘা জমি কমিটি নিযুক্ত ট্রাস্টীদের কাছে হস্তান্তরিত করার জন্য আইনসঙ্গত 'দলিল' প্রস্তুত করে দেব। এই জমির একটা খসড়া নক্সা এই

সঙ্গে দেওয়া হল। স্বাঃ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯ই নভেম্বর, ১৮৬১। (কৃষ্ণদাস পালের নিকট প্রেরিত মূলপত্রের সারানুবাদ)।*

কালীপ্রসন্ন সিংহের এই প্রস্তাবটি হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সদস্যদের এক সভায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর আলোচিত হয়। এই সভায় রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ভূমিদানের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য কালীপ্রসন্নকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করেন যে এই ভূমিখণ্ডের উপর হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ এক ভবন বা সৌধ নির্মিত হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রস্তাবিত ভবনের জন্য একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অফ ট্রাস্টিস্) গঠিত হয়: রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল (ভূকৈলাস), রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধানাথ বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও দ্বারকানাথ মল্লিক। সভায় ট্রাস্ট ডীডের খসড়াটিও অনুমোদিত হয়।

প্রায় ছয় মাস পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির আর একটি সভা রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থির হয় যে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতার্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর নির্মিত ভবনটি 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামে অভিহিত হবে। এই সভায় সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সভ্যদের জানান যে 'ট্রাস্ট বোর্ড' ও জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল (Deed of Conveyance) যথারীতি প্রস্তুত করা হয়েছে। (Hindu Patriot 23.6. 1862)

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে সমসাময়িক সংবাদপত্রাদিতে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রগুলি একটু খতিয়ে দেখলে হরিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটির এই নিষ্ক্রিয়তার রহস্যটি ভেদ করা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং অবসর নিয়ে স্বদেশে চলে যান। এর অল্পদিন পরই ছোটলাট স্যার জন পিটর গ্রাণ্টও অবসর নিয়ে স্বদেশে চলে যান।' ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এই দুইজনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা ও এঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলকাতার রাজা মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয় কৃষ্ণদাস পাল এই উভয় কমিটিরই নামতঃ সহকারী সম্পাদক এবং কার্যতঃ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হরিশ্চন্দ্রের চেষ্টায় বেকার যুবক কৃষ্ণদাস ১২৫ টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত

* দ্রঃ Memoirs of Kali Prasanna Sinha, Manmatha Nath Ghosh, Calcutta—1920, pp-51-53.

হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ ধনী সদস্যগণ এই দরিদ্র ও অথচ সুশিক্ষিত যুবকের প্রতি ভৃত্যবৎ ব্যবহার দেখাতেন। কৃষ্ণদাস এই অপমান গায়ে না মেখে ধীর স্থির ভাবে এদের আজ্ঞা পালন করে এদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতেন। কৃষ্ণদাস অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য তিনি সব কিছু বাধা উপেক্ষা করে চলতে শিখেছিলেন। বিনয় ও সেবা দ্বারা এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে কৃষ্ণদাসকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এসোসিয়েশনের সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরম আস্থাভাজন প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বেতন বৃদ্ধি হতে হতে শেষ পর্যন্ত ৩৫০ টাকা হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সর্বময় কর্তৃত্বও তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। কৃষ্ণদাস হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই সুকৌশলে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদকের আসনটিও দখল করেন। * বড়লাট ও ছোটলাটের নামের সঙ্গে জড়িত স্মৃতিরক্ষা কমিটির তরফ থেকে সহকারী সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদাস যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদাস সেই তৎপরতার কিছুমাত্র নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি। ক্যানিং টেস্টিমোনিয়েল কমিটির তরফ থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে (১০ই জুন, ১৮৬২ পর্যন্ত) ৪০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। এক্ষেত্রে এমন একটা সন্দেহ মনে জেগে উঠা সম্ভব যে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য যাঁরা দান করতে মনস্থ করেছিলেন, তাঁদের ক্যানিং টেস্টিমোনিয়েল ফাণ্ডেই টাকা দিতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করা হয়েছিল। হরিশ স্মৃতি তহবিলে চাঁদা উশুলের চেষ্টা নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষা ব্যাপারটি ধামা চাপা পড়ে যায়। স্মৃতিরক্ষা তহবিলের টাকার সুদ থেকে হরিশ্চন্দ্রের মাতা ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য যথাক্রমে মাসিক ৫ ও ১০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হরিশের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর শোকাতুরা জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। বেশি দিন তাঁকে এই দাক্ষিণ্য ভোগ করতে হয়নি। হরিশ-জননীর শ্রাদ্ধের খরচও এঁরা বহন করেছিলেন এ সংবাদ সুপ্রচারিত হয়েছিল। যাঁরা হরিশ-জননীকে স্মৃতি তহবিল থেকে মাসে পাঁচ টাকা ভাতা দিতেন, তাঁরা তাঁর শ্রাদ্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকার বেশি যে খরচ করেননি, এটা ধরে নেওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস তাঁর রাজভক্তির পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'জাস্টিস অফ দি পীস' ও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং মাসিক তিনশত টাকা বেতনে মিউনিসিপ্যাল মেজিস্ট্রেট পদলাভ করেন।

* এই বিষয়টি পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী লেখক লিখেছেন যে "হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হইতে অর্থ আসিয়াছিল। কিন্তু কার্য নির্বাহক সমিতির কার্য কিছু মাত্র অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে স্মৃতি রক্ষা হইবে সে বিষয়ে কোন মীমাংসা হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কালী প্রসন্ন সিংহ কার্য নির্বাহক সমিতির নিকট স্মৃতি মন্দির স্থাপন প্রস্তাব পাঠান ও স্বকীয় বাগান স্ট্রীটস্থ দুই বিঘা জমি দান করিতে সম্মত হন। ·· তাঁহার এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয় · কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের ঔদাসীন্যে এই শুভ অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয়।···" *

হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা প্রসঙ্গে হরিশ জীবনী লেখক এই মন্তব্য করেছেন যে "ফল কথা এই যে হরিশের সম্মানের জন্য তৎকালীন কোন শ্রেণীর লোক বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। 'রাইজ ও রায়তের' সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন যে সেই সময়ে কোন এক প্রসিদ্ধ জমিদার হরিশের স্মরণ চিহ্ন সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে হরিশের জন্য যদি প্রস্তর মূর্তি সংস্থাপিত হয় তবে রাজা রাজড়ারা মরলে কি হবে?

বাস্তবিক পক্ষে হরিশের স্মৃতি রক্ষার বিষয়টি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে একটি কলঙ্ক কাহিনী হয়ে আছে। স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হওয়ার পর পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত ব্যাপারটি ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়। হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবেরা এই সময়ের মধ্যে অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। জনমানসেও হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি স্বাভাবিক নিয়মে কিছু স্তিমিত হয়ে আসে। এই সুযোগে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা তহবিল থেকে দশ সহস্র পঞ্চশত মুদ্রার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঞ্চিত তহবিলের টাকা এবং আরও কিছু টাকা অর্থাৎ মোট ৪০,০০০ টাকা দিয়ে ১৮, রানী মুদিনীর গলিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্য একটি নিজস্ব বাড়ি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রয় করা হয়। অতঃপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আপিস লার্কিন লেনের ভাড়া বাড়ি থেকে এখানে উঠে আসে। হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষার তহবিল থেকে ১০,৫০০ মুদ্রা সরিয়ে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ি কেনা হয় এই বিষয়টি জনসাধারণ বা চাঁদা দাতাদের জানানো হয়নি। পরবর্তী কালে জানা যায় যে, হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের এই মর্মে একটি চুক্তি হয়েছিল যে হরিশ্চন্দ্রের নামে একটি পাঠাগার বা লাইব্রেরী স্থাপিত হবে তার জন্য এই ক্রীত বাড়ির নীচের তলার ঘরগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে। এই চুক্তির আর একটি ধারা ছিল যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যদি উঠে যায়

---

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ-মন্মথনাথ ঘোষ, কলিকাতা- ৩২২ পৃঃ-৭১

** হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী-রামগোপাল সান্যাল-কলিকাতা ১৮৮৭ (পৃঃ-৪৮-৪৯)

এবং এর এক বৎসরের মধ্যে যদি অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত
তবে সমস্ত বাড়িটিই হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির অধিকারে আসবে।

[For the sum of ten thousand, the trustees (of the memorial fund) got the Association to agree to place at their disposal three rooms on the ground floor of the new house with necessary out-offices with the reversion of the whole house in the event of the Association being dissolved and no new one on the same principle being formed within a year]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ণধার। স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ই সময়ে খাতায় পত্রে এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক থাকলেও তিনিই ছিলেন এর আসল সম্পাদক। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর নামেই ছিলেন সম্পাদক। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থানান্তরিত হওয়ার কিছুকাল পর রানা মুদির গলির নামটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিটে পরিণত হয়। (কয়েক বৎসর পূর্বে এই নামটি আবার পারবর্তিত হয়ে আব্দুল হামিদ স্ট্রীটে পরিণত হয়েছে)। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিজস্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ আট বৎসর পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ভবনের নীচের তলায় হরিশ্চন্দ্র লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল হরিশ্চন্দ্রের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রথম নয় বৎসর অর্থাৎ মৃত্যু কাল পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র এসোসিয়েশনের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। হরিশের স্মৃতি রক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদত্ত আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ২ বিঘা জমির উপর হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি ভবন প্রতিষ্ঠা করাই হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির লক্ষ্য ছিল। এই ভবনে একটি লাইব্রেরী, সভাকক্ষ, রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও ছিল। এর জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, নক্সাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট টাকা না ওঠায় এই পরিকল্পনা ত্যক্ত হয়।" * অতঃপর হরিশ লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজেন্দ্র লাল বলেন যে হরিশ নিজের চেষ্টায় নানা ধরনের পুস্তক পড়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হরিশ্চন্দ্রের স্থান অধিকার করতে পারবেন এমনি ভবিষ্যৎ হরিশ্চন্দ্রদের শিক্ষাদানই হরিশ্চন্দ্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ["In short the object of establishing the Hurrish Chunder

* Speeches & Writings of Raja Rajendralal Mitra—by Raj Jogeswar Mitra. Calcutta—1892. (pp—57-58)

Library was to prepare a training school for future Hurrish Chunders*]

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই ভাষণে যতই সদিচ্ছা প্রকাশিত হ'ক না কেন হরিশ্চন্দ্র লাইব্রেরীটি এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ মুখ রক্ষা বা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যে প্রতিষ্ঠা করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। লাইব্রেরীটি জরাজীর্ণ ও অচল অবস্থা নিয়ে কিছুকাল মাত্র টিকে ছিল, তারপরই এটি বিলুপ্ত হয়। "Harish Library" নামাঙ্কিত একটি ফলক বাড়ির নিচের তলায় সংলগ্ন ছিল—সেটিও এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। হরিশের স্মৃতি রক্ষার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে হরিশ জীবনী লেখক তাঁর একটি গ্রন্থে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কতিপয় মাতব্বর ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে 'ষড়যন্ত্র' করে হরিশ স্মৃতি রক্ষা তহবিলের টাকা এসোসিয়েশনের বাড়ি তৈরীর কাজে অপব্যবহার করেন, তারপর ঐ বাড়ির নিচের তলার অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরে হরিশের নামে একটি লাইব্রেরী তাঁর মৃত্যুর ষোল বৎসর পর স্থাপন করে শুধু নামমাত্র তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনাটি বাঙালি জাতির পক্ষে লজ্জাকর। জনসাধারণের দানে পুষ্ট অর্থ ভাণ্ডারের এই অপব্যবহারের ফলে বর্তমান কালে অনুরূপ উদ্দেশ্যে স্থাপিত ব্যাপারে যে কেউ অর্থদানে এগিয়ে আসে না এটা পরিলক্ষিত হয়েছে ["After a lapse of full 16 years, a dark room in the lower floor of the building of the B. I Association was solemnly inaugurated and declared as the 'Hurrish Chunder Library'. The truth of the matter is that some of the influential members of the Association who had handsomely contributed to the fund, contrived in collusion with Babu Kristodas Pal, to appropriate the entire fund to the erection of the building of the Association and a nominal memorial was raised to the great shame of the Bengalee nation. The moral effect of this misappropriation of public fund has been felt in our times"]*

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাড়ি কেনার আগে থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা) এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন। খাতা পত্রে এ যাবৎ সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কৃষ্ণদাস এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পদে আসীন থেকে জমিদার

মণ্ডলীর উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়িকেনার সময় আইনত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহু জনের সমবায়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান রূপে সরকারী তালিকা (রেজিস্টার্ড) ভুক্ত হয়নি। এর কোন অছি পরিষদও (বোর্ড অফ ট্রাষ্টীজ) ছিল না। এই সব কারণে বাড়ি ক্রয়ের দলিলটি যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরেরনামে নিষ্পন্ন হয় (Deed of conveyance in the name af Babu Jotindra Mohan Tagore)। বাড়ি কেনার বাইশ বৎসর পরে বৃদ্ধ মহারাজা যতীন্দ্র মোহন বাড়িটি নিজমালিকানায় আর অধিক কাল রাখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁর মনে এই আশঙ্কা জন্মেছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ির স্বত্ব নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী এবং এসোসিয়েশনের মধ্যে বিবাদ বাধতে পারে। ইতিমধ্যে বাড়ি ক্রয় নাটকের প্রধান নায়ক কৃষ্ণদাস পাল কয়েক বৎসর পূর্বেই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করে চলে যান। যতীন্দ্র মোহন অতঃপর তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী গণেশ চন্দ্র চন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গণেশ চন্দ্র এই সময়ে এসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। গণেশ চন্দ্রের পরামর্শে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যদের এক সভা আহুত হয়। মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বাড়ি কেনার আনুপার্বিক ইতিহাস বর্ণনা করে গণেশ চন্দ্র চন্দ্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে এসোসিয়েশনটি আইন সঙ্গত ভাবে রেজেষ্ট্রী করে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসোসিয়েশনের একটি ট্রাস্ট বোর্ড (Board of Trustees) গঠন করা হক। ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর নামে কেনা বাড়িটি আইন সঙ্গত ভাবে হস্তান্তর করুন। এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হওয়ার পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'রেজিষ্ট্রীকৃত' হয়। পরবর্তী একটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়ঃ

(১) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২) মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব (৩) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৪) দুর্গাচরণ লাহা (৫) রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। এই সভাতেই গণেশ চন্দ্র মহাশয় সভ্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বাড়ি কেনার সময় হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির সঙ্গে এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের এই মর্মে একটি চুক্তি হয়েছিল যে এই সম্পত্তি শুধু এসোসিয়েশনের কাজেই ব্যবহৃত হবে না, হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হবে।*

এই সভার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে ১৮নং

রানী মুদিনী গলির বাড়িটি আইন সঙ্গত ভাবে এসোসিয়েশনের ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে এসেছিল। সংবাদ পত্রে (হিন্দু পেট্রিয়ট) প্রকাশিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এসোসিয়েশনের হাতে হরিশ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের ১৫০০, টাকা বার্ষিক চার টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজে (Govt. security on 4 p.c. interest p. a.—) লগ্নী ছিল। এই টাকা উত্তরকালে কি ভাবে ব্যয়িত হয়েছিল তা জানা যায় না। এই টাকা যদি খরচ না হয়ে থাকে তবে প্রায় শতবর্ষ পরে বর্তমানে টাকার অঙ্কটি বেশ স্ফীত অবস্থায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হাতে জমা রয়েছে ধরে নিতে হবে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বর্তমানে কোন কর্ম করে থাকেন জনসাধারণের পক্ষে তা জানার কোন উপায় নেই। এই প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রগুলিও কোন গবেষককে দেখতে দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন একটি জীবন্মৃত প্রতিষ্ঠান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ৪০ বৎসর পরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামটি শুধু নিরর্থকই নয় রীতিমত বিরক্তি-জনক। প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা উচিত হরিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন। হরিশ্চন্দ্রের আদর্শে জনসেবামূলক কর্মসূচী অনুসরণ এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই এসোসিয়েশনের বর্তমান কর্মকর্তৃগণ অতীতের রাজা মহারাজাদের উত্তরাধিকারী অথবা নয়া-যুগের শিল্পপতি। এঁদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ-সম্পদ সবই আছে। এঁরা হরিশ্চন্দ্রের নামে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হলে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন। এতদ্বারা তাঁদের পূর্বসূরিদের কৃত পাপেরও স্খালন হবে।

১৩

হিন্দু পেট্রিয়টের পরিণাম

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুকালে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। হরিশের মৃত্যুর পর তিনিই এই পত্রিকার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। হরিশের মৃত্যুকালের প্রায় তিন বৎসর আগে থেকে হরিশের পরম-বন্ধু ও আপিসের সহকর্মী গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পেট্রিয়টের সম্পর্ক বেশ শিথিল হয়েছিল। হরিশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গিরিশচন্দ্র স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, কারণ তরুণবয়স্ক শম্ভুচন্দ্র তখন পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়টের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর একটি ইংরাজী সংবাদপত্র চালানোর মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। গিরিশ নিজে পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে এর বৈষয়িক দিকটি দেখার ভার শম্ভুচন্দ্রকে অর্পণ করেন। প্রকৃত পক্ষে শম্ভুচন্দ্র এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক বা ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন। এই সাময়িক ব্যবস্থা চলা কালে হরিশের মাতা হরিশের পরম-বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসটি বিক্রয় করা ছাড়া হরিশের পরিবারের অন্ন সংস্থানের আর কোন উপায় ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৪ জুলাই পাঁচ সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের স্বত্ব ক্রয় করেন।

হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ক্রীত হওয়ার পর প্রথমে প্রেসটি ৪১নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন নবীনকৃষ্ণ বসু, পেট্রিয়টের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ছিল রাধানাথ সেন। কিছুদিন পর প্রেসটি ১৪-১৫ বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। তখন এর প্রিণ্টার ও পাবলিশার হন রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। কালীপ্রসন্নের অন্যতম বন্ধু রাধানাথ বিদ্যারত্ন কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত বিদ্যোৎসাহিনী সভারও সম্পাদক ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন কর্তৃক পেট্রিয়টের স্বত্ব ক্রয়ের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী লেখক লিখেছেন "হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া কালীপ্রসন্ন প্রথমে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উহার পরিচালন ভার প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ ও সহচর, হিন্দু পেট্রিয়টের এর

জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র হরিশের মৃত্যুর পরই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয় সহধর্মিনীর সাহায্যার্থ পত্র খানির সম্পাদন ভার গ্রহন করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভু এডিটর পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশই তাহার প্রধান সম্পাদক রহিলেন।... কিন্তু এই অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে কৃষ্ণদাস পাল ইতি পূর্বে বি আই এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিশ্চ-ন্দ্রের শেষাবস্থায় কৃষ্ণদাস শম্ভুচন্দ্রের সহিত সহকারী সম্পাদকের কার্যও করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ছিল। এক্ষণে তিনি উক্ত পত্রখানির পরিচালন ভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। কালীপ্রসন্ন এই সর্বজন হিতকর পত্রখানিকে বিঃ ইঃ এসোসিয়েশন সভার জমিদার পক্ষের মুখ-পত্রে পরিণত করিয়া পত্রখানির উদার নীতি সংকীর্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদাসকে নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালন ভার প্রদানের চেষ্টা করিতেন। শম্ভু-চন্দ্র কালীপ্রসন্নের বাটিতে থাকিতেন এবং কালীপ্রসন্নও তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিতেন। একটা গুজব রটিল যে কালীপ্রসন্ন যে সৎকার্যে দান ধ্যান করিয়া অর্থ অপব্যয় করিতেছেন তাহা শম্ভুচন্দ্রের ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায়। শম্ভু ইহা শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসন্নের গৃহ ও সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসন্নের বিশেষ অনুরোধ সত্বেও শম্ভুচন্দ্র পত্রিকা পরিচালনে সম্মত হইলেন না। গিরিশ চন্দ্রও (১৮৬১, নভেম্বর) পেট্রিয়ট সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর ক্রমান্বয়ে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদন করাইয়া দেখিলেন যে সংবাদপত্র পরিচালনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা হিন্দু পেট্রিয়ট পরিচালনায় পত্রখানির গৌরব হ্রাস পাইতেছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিন জনের উপরে পেট্রিয়ট সম্পাদন ভার প্রদান করিলেন। নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাসের সহযোগিতায় পত্রখানি কিছুদিন সম্পাদিত হইল, অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণদাসের অধীন হইয়া পড়িল। এই সময় কৃষ্ণদাস বি. ই. এ. সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসন্নকে অনুরোধ করাইলেন যে কাগজখানির পরিচালন ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হউক। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে কয়েকজন ট্রাস্টীর উপর এই ভার অর্পণ করিতে সম্মত হন।"* ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার ভার পান কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনেও

*মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহ-মন্মথনাথ ঘোষ, কলিকাতা, ১৩২২ (পৃঃ-৩৫-৩৯)

নির্দেশে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি কালীপ্রসন্নের অভিভাবক ও পিতৃস্বস্থপতি হরচন্দ্র ঘোষের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষের অনুরোধ বা নির্দেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কালীপ্রসন্নের ছিল না, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রাস্ট বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এই ট্রাস্ট বোর্ড গঠন সম্বন্ধে রাম গোপাল সান্যাল লিখেছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন যে কালী প্রসন্নর কাছ থেকে পেট্রিয়ট পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে তিনিই কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক মনোনীত করেন। কৃষ্ণদাস তাঁর অধীনে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করে গোপনে গোপনে কালীপ্রসন্নকে পত্রিকা পরিচালন ভার ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে তুলে দেবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন (... clandestinely carried on negotiation, with Kaliprasanna to make over the paper to a body of trustees... । *

কৃষ্ণ দাসের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানা মাত্র বিদ্যাসাগর পেট্রিয়টের পরিচালন ভার ত্যাগ করেন। উপায়ন্তর না দেখে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্ট ডীড, মারফৎ হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদ পত্র ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে সমর্পণ করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ট্রাস্ট ডীডের ৯টি শর্ত ছিল এই রূপ —: হরিশ্চন্দ্রের নাম স্থায়ী রাখার জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামটি বজায় রাখতে হবে. কখনও এর নাম পরিবর্তন করা চলবে না। অন্য কোন কাগজের সহিত ইহা মিশ্রিত হবে না (২) হিন্দু-পেট্রিয়টের 'গুড উইল' বিক্রয় করার অধিকার ট্রাস্টিদের থাকবে না। তবে প্রেসকে বা প্রেসের কোন সরঞ্জাম বিক্রি করার অধিকার প্রয়োজন হলে ট্রাস্টি-দের থাকবে. তবে এক্ষেত্রে বিক্রির টাকা দিয়ে প্রেসের দেনা শোধ করে বাকী টাকা হরিশ স্মৃতি রক্ষা ফাণ্ডে জমা দিতে হবে। হিন্দু পেট্রিয়টের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে ট্রাস্টিদের লক্ষ রাখতে হবে (৩) ট্রাস্টিদের কাছ থেকে পেট্রিয়ট আয় ব্যয় হিসাবাদি লওয়ার ক্ষমতা ট্রাস্ট স্রষ্টা কালীপ্রসন্ন সিংহের থাকবে না, ট্রাস্টই হিন্দু পেট্রিয়টের মালিক থাকবেন। (৪) ট্রাস্ট বোর্ড হিন্দু-পেট্রিয়টের গুড উইল বিক্রয় করতে পারবেন, তবে দেশের উপকারার্থ উপযুক্ত ক্ষেত্রে উহা দান করা যেতে পারে (৫) ট্রাস্টিদের কারো মৃত্যু হলে, বা কেউ পদত্যাগ করলে তার জায়গায় বাকী ট্রাস্টী গণ উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করতে পারবেন। (৬) ট্রাস্টির সংখ্যা তিনজনের কম বা পাঁচ জনের অধিক হবে না। (৭) ট্রাস্টিরা অকর্মণ্য হয়ে পড়লে বা কোন অনুচিত কাজ করলে তাদের

* Reminiscences & Anecdotes—I (pp 51) R. G. Sanyal, Calcutta 1894.

অপসারিত করা যাবে। এই শর্ত গুলির সঙ্গে আর একটি শর্ত কালীপ্রসন্ন জুড়ে দেন যে তিনিও একজন ট্রাস্টী থাকবেন, এবং যে শর্তে ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হল সেই নয় দফা শর্ত মানতে বাধ্য থাকবেন, এর কোন অন্যথা হলে তাকে অন্য ট্রাস্টীরা অপসারিত করতে পারবেন। এই ডীডের শেষ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছিল যে "উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্বক হিন্দু পেট্রিয়টের কার্য নির্বাহ হইবেক ও দুই দফায় লিখিত অনুসারে বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে বিক্রয় হইবেক, এতদর্থে পেট্রিয়ট কাগজ ও অক্ষর জমায় লওয়া জমা মালিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া ট্রাস্টি নামা লিখিয়া দিলাম।" ১৯শে জুলাই ১৮৬২ (বাং ৫ শ্রাবণ ১২৬৯) কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহা স্বাক্ষর করেন। এই স্বাক্ষর কালে সাক্ষী ছিলেন শ্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণদাস পাল।* ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হওয়ার পর কৃষ্ণদাস পালকে বোর্ড একটি নির্দিষ্ট বেতনে পেট্রিয়টের সম্পাদক নিযুক্ত করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে কৃষ্ণদাস পাল ট্রাস্টীদের সম্মতি অনুসারে এর সমুদয় আয় ভোগ করতেন। কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণদাস ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হওয়ার সময় থেকেই সুবিধার অধিকারী হন, কোন দিনই তিনি এর বেতনভুক সম্পাদক ছিলেন না। হরিশের মৃত্যুর পর পেট্রিয়টের প্রচার সংখ্যা ২৫০ খানিতে নেমে এসেছিল, এক বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণদাস তাঁর নিপুণ সম্পাদনা ও পরিচালনায় এর প্রচার সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন।** হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং শাসক মহলেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এর ফলে তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার জাস্টিস অফ দি পীস্ (১৮৬৩), বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাউন্সিলর (১৮৭২), ও ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদলাভ করেন (১৮৮৩)। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদাস দেশের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, তবে জন-কল্যাণ অপেক্ষা জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি যত্নবান ছিলেন। জনস্বার্থের চেয়ে জমিদারদের এবং সেই সূত্রে আত্মস্বার্থ রক্ষা তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। অসাধারণ অধ্যবসায়, কর্ম নিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা ও বৈষয়িক বুদ্ধির সহায়তায় দরিদ্র মুদির সন্তান কৃষ্ণদাস নিজেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মৃত্যুকালে বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও তিনি নগদ ষাট হাজার টাকা রেখে যান। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙালী

** ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ মে ইণ্ডিয়ান ফীল্ড নামের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রটি হিন্দু পেট্রিয়টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই পত্রিকাটি একটি আর্মানী কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৫ পর্যান্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র এই পত্রিকার বেতনভুক্ সম্পাদক ছিলেন।

সমাজের অন্যতম কৃতী পুরুষ, দক্ষ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পালের চরিত্রটি আদর্শ স্থানীয় একথা বলা যায় না। শিক্ষা গুরু ও পরম উপকারী বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক হয়েতিনি তাঁর উপরন্যস্ত দায়িত্ব ও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেননি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে জুলাই কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হয়। তাঁর একটি মর্মর মূর্তি দেশবাসীর চেষ্টায় কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের গভর্ণর জেনারেল এই মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় শাসক কুলের নিকট কতদূর সমাদৃত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী পরিবারের সন্তান সুপণ্ডিত রাজকুমার সর্বাধিকারী (১৮৩৯-১৯১১) কে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার ভার দান করেন। ইতিপূর্বে রাজকুমার তাঁর বন্ধু রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ যান ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ-এর ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। এই সঙ্গে তিনি 'লক্ষ্ণৌ টাইমস' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকপত্রও প্রবর্তন করেন। রাজকুমার কি সর্তে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক নিযুক্ত হন তা বলা কঠিন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদন কালে ট্রাস্ট বোর্ড যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণদাস যে ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনতা মানেন নি এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পূর্বেই আদি বোর্ডের তিনজন সদস্য প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রমানাথ ঠাকুরের যথাক্রমে ১৮৬৬, ১৮৭০ ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে দিগম্বর মিত্র ট্রাস্টি নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁরও মৃত্যু হয়। রাজকুমারের সম্পাদন ভার গ্রহণ কালে আদি ট্রাস্টিদের মধ্যে মাত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর জীবিত ছিলেন। মনে হয়, রাজ কুমার ট্রাস্ট বোর্ডের ইচ্ছা ক্রমেই হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক রাজকুমার হিন্দু পেট্রিয়টের মান নিম্নগামী হতে দেননি। এক সময়ে রাজকুমার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকও নির্বাচিত হন। তাঁর চেষ্টায় সর্ব প্রথম ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুপণ্ডিত ও আইনজ্ঞ রাজকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল'লেক্‌চারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাজকুমার হিন্দু পেট্রিয়টকে দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন বলে শোনা যায়। হিন্দু পেট্রিয়টের দৈনিক পত্রে রূপান্তর গ্রহণের পর 'সংবাদ

প্রভাকর'-এ নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল "আমরা হিন্দু পেট্রিয়ট, সাপ্তাহিকের পরিবর্তে প্রাত্যহিক দেখিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম। আমরা কায়মনোবাক্যে ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি। এই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা আজকের নয়। ৩৭ বৎসর অধিক হইল ইহা অবিবাদে অতি যোগ্যতার সহিত চালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্মদাতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কেমত দক্ষতার সহিত ইহার সম্পাদকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই" (২ই চৈত্র, ১২৯৮)। দৈনিক হিন্দু পেট্রিয়ট, রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হত।

দৈনিক হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রকাশ কালে রাজকুমার তাঁর এক জ্ঞাতিপুত্র শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারীকে (১৮৫৮-১৯১২) সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন। রাজকুমারের বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার ভার পান। শ্রীশচন্দ্রের অন্যতম সহকারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' প্রকাশ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই সময় ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্তক পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের নিকট হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব হস্তান্তর করেন। ঐ সময়ে ট্রাস্ট বোর্ডের আর কোন সদস্য সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন না, অথবা অন্য এক বা একাধিক সদস্যের সম্মতিক্রমেই বিজয়চন্দ্র সিংহকে হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব অর্পিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্নের ন্যায়-সঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে বিজয়ের পক্ষে এই সময়ে অন্যতম ট্রাস্টি থাকাও সম্ভব ছিল। যাই হোক, কালী প্রসন্নের অর্থে ক্রীত হিন্দু পেট্রিয়ট, কালচক্রের আবর্তনে তাঁর আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীর হাতে প্রত্যর্পণের ব্যাপারটি নীতি বিগর্হিত হয়নি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত হিন্দু পেট্রিয়ট দৈনিক পত্ররূপে জনৈক শরৎচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হিন্দু পেট্রিয়ট, সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে হিন্দু পেট্রিয়ট সাপ্তাহিক পত্রটি ১৪৮, বারানসী ঘোষ স্ট্রীট্ থেকে প্রকাশিত, সম্পাদকের নাম নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বত্বাধিকারীর নাম বিজয়চন্দ্র সিংহ। সরকারী রিপোর্টে এটি রাজভক্ত পত্রিকা রূপে চিহ্নিত হয়েছে, সেই সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে এর কোন প্রভাব নেই (Loyal but of little influence)।*

মুমূর্ষু প্রায় অবস্থায় হিন্দু পেট্রিয়ট আরও কয় বছর টিকে ছিল। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের বড় সাধের ও সাধনার ধন হিন্দু পেট্রিয়ট্ পঞ্চত্ব লাভ করেছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশ স্থগিত হওয়ার পর পেট্রিয়টের দুটি

* Report on Native Newspapers—Govt. of Bengal-1918

মেশিন বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিনে নিয়েছিলেন। বিজয়চন্দ্র সিংহ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। *

যে গভীর স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশবাসির প্রতি মমত্ব বোধ হরিশ্চন্দ্র সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়টের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সেই বৈশিষ্ট্য ততটা রক্ষিত হয়নি, যদিও সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঙলার তথা ভারতের সংবাদপত্র জগতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র রূপে আসন চ্যুত হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জাতীয় চেতনার যে ভাব-বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়ট সে স্রোতোধারায় সম্মিলিত হতে পারেনি। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ৭১ বৎসরের মুমূর্ষু হিন্দু পেট্রিয়টের বিলুপ্তির ঘটনাটি প্রায় লোক চক্ষুর অগোচরেই ঘটে গিয়েছিল।

* মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৪০

১৪

হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার পরিণাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

হরিশ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত সেই অবস্থায় দেশে নতুনভাবে এক চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) রচিত 'নীল দর্পণ' নাটকটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বাঙালী চাষীদের উপর নীলকরদের নানা উৎপাতের কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল। বহু বাস্তব ঘটনা এই নাটকে চিত্রিত হয়েছিল। ডাক বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরূপে দীনবন্ধুর সঙ্গে গ্রাম বাঙলার পরিচয় ছিল, নাট্যকার রূপে দীনবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগিয়েছিলেন। নাটকটি 'কস্যচিৎ পথিকস্য এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পর নীল চাষী দরদী খ্রীষ্টধর্ম যাজক রেভাঃ লঙ (১৮১৪-১৮৮৭) এই নাটকটি সম্পর্কে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সীটন কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে সীটন কার বেশ ভালই বাংলা ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। সীটন কার এই বইটি পড়ে বেশ প্রভাবিত হন। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নীল কমিশনের তিনিই ছিলেন সভাপতি (chairman); বাঙলার লেঃ গভর্ণর স্যার জন পিটর গ্রাণ্ট (১৮০৭-১৮৭৩) বাঙলার নীলচাষীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। সীটন কার এই বইটির কথা জানালে গ্রাণ্ট সীটন কারকে বইটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়ে বইটির সামান্য কিছু কপি ব্যক্তিগত খরচে ছাপিয়ে নিতে বলেন। গ্রাণ্ট প্রস্তাবিত এই অনুবাদটি নিজে পড়তেও আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী ও ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব কে বইটি পড়ার সুযোগ দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এর পর সীটনকার লঙের মারফৎ বইটি প্রায় রাতারাতি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়ে এটি সি এইচ, ম্যানুয়াল নামে এক মুদ্রাকর কে দিয়ে প্রকাশ করিয়ে নেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অতি দ্রুত 'নীলদর্পন' ইংরাজীতে অনূদিত করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, তবে এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বইটিতে মূল গ্রন্থকার বা অনুবাদকের নাম ছিল না, শুধু মুদ্রাকরের নাম ছিল। বইটি যখন ছাপা হয়ে আসে তখন ছোটলাট স্যার জন পীটর গ্রাণ্ট মফস্বলে ছিলেন। সীটন কার এরই মধ্যে এই বইয়ের দুশ দুখানি কপি সরকারী খরচে ইংলণ্ডে

কিছু পার্লামেণ্ট সদস্য, সমাজসেবী ও ভারত থেকে অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের এবং কিছু কিছু সংবাদপত্র সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন। কলকাতায় ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের কাছে এই বই পাঠানো হয়নি। ইংলিশম্যান সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট এ বইয়ের একটি কপি সংগ্রহ করে এটির প্রতি নীলকর ফাগুসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টারস এসোসিয়েশন ইতিমধ্যে 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস এণ্ড কমার্সিয়েল এসোসিয়েশন' নামে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন ফার্গুসন। ফার্গুসন সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা গভর্ণমেণ্টকে একটি চিঠি লিখে জানতে চান যে এই দুষ্ট ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ মানহানিকর বইটি সরকার থেকে প্রচারিত হয়েছে কিনা? বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এর উত্তরে জানান যে বইটির প্রকাশ ও প্রচার কালে লেঃ গভর্ণর কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে বইটি ছাপা হয় এবং এজন্য তাঁরা দুঃখিত। সরকারী তরফ থেকে অবশ্য এটা যে কারো মানহানিকর তা স্বীকার করা হয়নি। ছোটলাট গ্রাণ্ট গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার কাছেও এ বিষয়ে একটি পত্রে জানান যে বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারী সীটন কার তাঁর অভিপ্রায় ঠিক মত বুঝতে না পেরে কাজটি করে ফেলেছেন, এ জন্য তিনি নিজে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই কৈফিয়তে নীলকর সমাজের ক্রোধ শান্ত করা যায়নি। নীলকরেরা এই পুস্তকের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের নামে এবং গ্রাণ্ট ও সীটন কারের নামে মানহানির মামলা আনতে কৃত সংকল্প হয়। বাঙলার ছোটলাট এবং তাঁর সেক্রেটারীর নামে মানহানির অভিযোগে ফৌজদারী মামলা উঠলে স্বয়ং ভারত সরকারেরও মর্যাদাহানি হবে এই আশঙ্কা করে বড়লাট লর্ড ক্যানিং সরকারী ভাবে গ্রাণ্ট ও সীটনকারকে ভর্ৎসনা করেন। অতঃপর নীলকর-সমাজ গ্রাণ্ট ও সীটন কারকে অব্যাহতি দিয়ে বইটির মুদ্রাকর হিসেবে 'ম্যানুয়েলের নামে মানহানির মামলা এনেছিল, বইয়ের মূল লেখক ও অনুবাদকের নাম তারা জানতে পারেনি। নীলকর সমাজের ক্ষোভ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে এই অবস্থায় মৃত্যুপথ যাত্রী হরিশ্চন্দ্র ১০ জুন তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ সমর্থন করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন যে এটি মানহানির ব্যাপার নয়, বাস্তব অবস্থার একটা চিত্র। বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে দেশবাসীর যে মনোভাব প্রকাশিত হয় গভর্ণমেণ্টের তা গোচরে আনা অন্যায় নয়। ১০ জুন এই নিবন্ধটি প্রকাশের চারদিন পরই হরিশের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর নামে যে মানহানির মামলা চলছিল, সেটিও মৃত্যুপথ যাত্রী হরিশের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। নীলদর্পণ এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ সংক্রান্ত মানহানির

মামলায় নীলকর সঙ্ঘ তথা ল্যাণ্ড হোল্ডারস য়্যাণ্ড কমার্সিয়েল এসো-সিয়েশনের সঙ্গে ইংলিশম্যান সম্পাদক-ওয়াল্টর ব্রেটও যোগদান করেন। ম্যানুয়েলের নামে মানহানির মামলা উপস্থিত হলে রেভাঃ লঙ নির্দোষ ম্যানুয়েলকে অনুরোধ করেন আত্ম পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি যেন আদলতে প্রকাশক হিসেবে রেভাঃ লঙের নামটি প্রকাশ করে দেন। অতঃপর ম্যানুয়েল লঙের নাম প্রকাশ করে দেওয়াতে লঙের নামে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। হরিশের মৃত্যুর প্রায় একমাস পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই থেকে লঙের বিচার শুরু হয়। প্রথমে ১৫ জুন জুরির সাহায্যে ভারত-বিদ্বেষী সার মরডেণ্ট্ ওয়েলসের আদালতে বিচার শুরু হয়। জুরিদের মধ্যে ১২ জন ছিলেন ইংরাজ আর একজন করে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও পার্শী। ভারত বিদ্বেষী বিচারপতি লঙকে কঠোর সাজা দেবেন এটা বিচার কালে তাঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। বিচারপতি রায় দেওয়ার আগেই লঙের আইনজীবীগণ মামলাটির পুনর্বিচার প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ২৪ শে জুলাই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পীককের নেতৃত্বে অন্যান্য বিচারপতিদের সাহায্যে লঙের বিচার শুরু হয়। লঙ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্‌কালে ভারতবাসীর মনে গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে পুঞ্জীভূত অভিযোগ জমে আছে সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অবহিত ছিলেন না, কেউ যদি এই ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করত তবে বহু অযথা রক্তপাত বন্ধ করা যেত। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা তিনি প্রজাদের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে, যা কোন দিন বিপ্লবে পরিণত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পিকক্ লঙের এই বিবৃতিদান কালে তাঁর প্রতি বিশেষ বিরাগ প্রকাশ করেন। তিনি লঙকে এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। লঙের প্রতি এই কঠোর দণ্ডাদেশে দেশীয় ও ইউরোপীয় বহু ব্যক্তি মর্মাহত হলেও এই ঘটনায় নীলকর ও তাদের সমর্থকেরা বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। লঙের বিচারের সময় আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত। দেশীয় দর্শকদের মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে তৎকালের বহু প্রসিদ্ধ বাঙালীও উপস্থিত থাকতেন। দণ্ডাদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ লঙের দেয় জরিমানা ১০০০ টাকা দিয়ে দেন, এতে কিন্তু লঙের কারাবাস রোধ করা যায়নি। হরিশের মৃত্যু গ্রাম বাঙলার মানুষকে মর্মাহত করেছিল। বিদেশী পাত্রী প্রজা-বন্ধু লঙের কারাদণ্ডও গ্রাম বাঙলার মানুষকে বিচলিত করেছিল। এই সময় গ্রাম বাঙলার মানুষের মুখে মুখে এই

গানটি ধ্বনিত হত—'নীল বাঁদরে সোনার বাঙলা করলে ছারখার। অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার। চাষীর প্রাণ বাঁচানো ভার।'

হরিশের নামে আলিপুরের সদর আমীনের আদালতে নীলকর আর্কিবল্ড হিলস্ দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের দাবীতে যে মানহানির মামলা এনেছিল, সেটি হরিশের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও হরিশ মামলাটি লড়ে গিয়েছিলেন। এই মামলাজনিত উদ্বেগ ও পরিশ্রম হরিশের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সকলের ধারণা ছিল যে হরিশের অকাল মৃত্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি প্রত্যাহৃত হবে নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ নীলকর সমাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। লঙের কারাদণ্ডের ঘটনাটি নীলকর সমাজেব প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহাকে উৎসাহিত করেছিল। আর্কিবল্ড হিলস্ হরিশের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি তুলে না নিয়ে হরিশের বিধবা স্ত্রী ভগবতী দেবীকে বাদিনী খাড়া কবে মামলাটি চালাতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। আর্কিবল্ড হিলসের আবেদন অনুযায়ী ভগবতী দেবীকে আদালতে আসামী বা বিবাদিনী নির্দ্ধারিত কবা হয়। অগত্যা নিঃসম্বল বিধবা ভগবতী দেবী এই মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হন। প্রায় দুবছব পূর্বে মফঃস্বলে সংঘটিত নারী হরণ ও বলাৎকারের অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মামলা চলা কালে মফস্বলে নীলকরদের বহু অত্যাচারের ঘটনা আদালতের গোচবে আসলেও হরমণি নাম্নী গৃহবধূ হরণ বা তার উপর অত্যাচারের সঙ্গে আর্কিবল্ড হিলস্ যে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী এটি প্রমাণ করা বিবাদী পক্ষের দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আর্কিবল্ড হিলস্ সাক্ষ্য প্রমাণগুলি লোপ করে ফেলতে কোন ত্রুটি রাখেনি। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী আলিপুরের প্রধান সদব আমীন (Principal Sudder Amin) তারকনাথ সেনের এজলাসে এই মামলাব যবনিকাপাত হয়। বাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা ব্যারিস্টার মিঃ বেল, বাদিনীর পক্ষ সমর্থন করেন অপর এক প্রখ্যাত ইংরাজ ব্যারিস্টাব মিঃ মন্টিয়ো। মামলাটিতে ভগবতী দেবীব পবাজয় এড়ানো অসম্ভব এটা হৃদয়ঙ্গম করে মিঃ মন্টিয়ো ভগবতী দেবীকে আদালতে আর্কিবল্ড হিলসের মানহানির জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করতে পরামর্শ দেন এবং বাদীব পক্ষেব আইনজীবী স্বজাতীয় মিঃ বেলকে এই অনুবোধ করেন যে তাঁরা যেন এই ক্ষমা প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি তুলে নেন। সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়ে দেন যে দশ হাজার টাকা ডিক্রি পেলেও তাঁদেব পক্ষে কোন লাভ হবে না, হরিশের বিধবার হাতে এমন কোন সম্পত্তি নেই যেটা 'ক্রোক' করে এই টাকা উশুল হবে। মিঃ বেল মিঃ মন্টিয়োর যুক্তি মেনে নিয়ে তাঁর মক্কেল হিলস্‌কে এই ব্যবস্থায় রাজী করান। তবে ঠিক হয় যে বিবাদিনীকে বাদী হিলসের মামলার খরচা স্বরূপ কিছু ক্ষতিপূরণ করতে

হবে। মিঃ মন্টি্রয়ো ভেবে চিন্তে এই প্রস্তাবে রাজী হন। অতঃপর উভয়পক্ষের সম্মতিতে ভগবতী দেবী আদালতে আর্কিবল্ড হিলসের মানহানির জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং মামলার খরচা মামলার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে সম্মত হন। মামলার খরচা প্রায় ৭০০ টাকা ধার্য্য হয়। এইভাবে মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। মামলাটির বিবরণ বিশেষতঃ ভগবতী দেবী কর্তৃক হিলসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও মামলার খরচা বহনের সম্মতির সংবাদ ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলিতে বিশেষ উৎসাহ সহকারে প্রকাশিত হয়।* এই মামলা প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টে এই মর্মে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়-"গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর কোর্টে হিন্দুপেট্রিয়টের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমাটির মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। ...আমাদের নীলকর বন্ধুগণ এই মামলার ফলাফলে খুব উল্লসিত। যে মহান আত্মা বাঙলায় একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আজ ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এটা নীলকর বন্ধুরা মনে রাখলে ভাল করতেন। আমরা জানতে পেরেছি যে মামলায় বিবাদী পক্ষ থেকে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল তদ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে আর্কিবল্ড হিলসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হলেও নীলচাষ প্রথা সম্বন্ধে এত অভিযোগ সেখানে প্রমাণিত হয়েছে যে তার জন্য একটি দ্বিতীয় নীল কমিশন বসানো যেতে পারে।" [The libel case against H.P was decided on 6.2.62 at Alipur Court....we can not however felicitate our planter friends on the result when remembered that the master spirit which with its giant strength set to the working out of the great social revolution in lower Bengal has unhappily taken flight to its long home. We have been informed that though the evidence did not support the charges against Hills personally still it disclosed facts about the indigo system which when published will do the work of a second Indigo Commission. H.P.—10.2.1862]

মানহানির মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও ভগবতী দেবী মামলার খরচ বাবদ প্রায় সাতশত মুদ্রা কি ভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন। দুর্ভাগ্যবশতঃ হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই সময়ে জীবিত ছিলেন না। অন্য ঘনিষ্ঠ বান্ধবদেরও অনেকেই ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেন। ভগবতী দেবী নিরুপায় হয়ে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের কাছে আবেদন করেন।

* ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া-১৩. ২. ১৮৬২

হরিশ স্মৃতি তহবিলের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল হরিশ পত্নীর এই কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেননি। মামলায় খরচা আর্কিবল্ড হিলসকে দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিলস্ আবার তার পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল। আদালতের আদেশে হরিশের ৪৬ নং চাউলপটি রোডের বাড়ি ক্রোকের ডিক্রি হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মধ্যে হিলসের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা না হলে বাড়িটি নিলামে চড়িয়ে সেই টাকা থেকে পাওনা আদায়ের অধিকার হিলসকে দেওয়া হয়।*

হরিশের মৃত্যুর ঠিক পরেই গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক এই পত্রের স্বত্ব ক্রয়ের পর এর সংস্রব পরিত্যাগ করেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হরিশের সাধের হিন্দু পেট্রিয়ট কৃষ্ণদাসের সম্পাদনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তথা ধনী জমিদার বর্গের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি-ফলনের উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তিত নব প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। উত্তর কালের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) এই পত্রটির প্রকাশক ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে 'বেঙ্গলী' পত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গিরিশ অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন কিন্তু তিনিও হরিশের মত মিলিটারী অডিট্ আপিসের কেরানী ছিলেন। হরিশের বিধবার এই বিপদে অর্থ সাহায্য করার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। হিলস বনাম ভগবতী দেবীর মামলায় হরিশের যে অল্প সংখ্যক বন্ধু ভগবতী দেবীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, গিরিশ তাঁদের অন্যতম ছিলেন। হরিশের বাড়িটি সামান্য কিছু টাকার দায়ে নীলামে বিক্রি হয়ে যাবে, হরিশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি তার প্রতিকারে এগিয়ে আসছে না, এতে গিরিশ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে ওঠেন। উপায়ান্তর না দেখে গিরিশ তাঁর বেঙ্গলী কাগজে পাঠকের নিকট হরিশের বসতবাটি রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের একটি আবেদন প্রকাশ করেন (২৯ ৬. ১৮৬৩)। অতি অল্প দিনের মধ্যেই মামলার খরচা বাবদ বেশ কয়েক শত টাকা বেঙ্গলী আপিসে জমা পড়েছিল। আবেদন পত্র প্রকাশের পর চাঁদা দাতাদের নামের যে তালিকা বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বহু গণ্য মান্য লোকের নামের সঙ্গে বহু অখ্যাত ব্যক্তিরও নাম ছিল, মফস্বল শহর থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল। বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশিত চাঁদা দাতাদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১০০.০০ (একশত) টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। 'বেঙ্গলী' পত্র সৃষ্ট 'ফাণ্ড' থেকেই হরিশের ভদ্রাসনটুকু নীলকরের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে প্রচার

* **Celebrated Trials in India, Vol I—J. Ghosal, Calcutta, 1902.**

করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যদের চেষ্টায় হরিশের বাড়িটি রক্ষা পেয়েছিল, এটা অর্দ্ধসত্য মাত্র। চাঁদা দাতৃগণের মধ্যে কেউ কেউ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরসদস্য ছিলেন এটা অবশ্য সত্য কিন্তু এঁরা ব্যক্তিগত ভাবে চাঁদা দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অথবা হরিশ স্মৃতি রক্ষা কমিটি তাঁদের কর্তব্য পালন ত করেনই নি বরং এঁদের অনেকে হরিশের বিধবাকে সাহায্য করার বিরোধিতাও করেন। ক্ষুদ্ধ গিরিশচন্দ্র এদের এই গর্হিত আচরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই সূত্রে এসোসিয়েশনের কিছু নেতার চরিত্রের কুৎসিত দিকটিও উদ্ঘাটিত করে দেন। গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিকে এই মর্মে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন, "প্রথম দশ বৎসর হরিশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিশেনের জন্য প্রাণ পণ পরিশ্রম করেছিলেন – এজন্য অনেকে হরিশ্চন্দ্রকে এসোসিয়েশনের বেতনভুক কর্মচারী বলে ভুল করেছেন, কারণ এমন নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত বিরল।" হরিশের জীবদ্দশাতে এই এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে কি নির্মম ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র অতঃপর লেখেন যে মফঃস্বল বাঙলায় নীল বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করার সময় হরিশের ভবানীপুরের বাড়িতে তাঁর পরামর্শ ও অন্যবিধ সাহায্যের জন্য মফঃস্বল থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসত। এদের পক্ষে কলকাতা ছিল অপরিচিত স্থান। এদের আহার আশ্রয় ও পাথেয় জোটাতে হরিশের আর্থিক অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়ে। তিনি ঋণগ্রস্থও হয়ে পড়েন। হরিশের এই অর্থ সংকটের কথা জানতে পেরে বি আই এসোসিয়েশনের তরফে একটি 'ইণ্ডিগো ফাণ্ড' সৃষ্ট হয়।* এই অর্থ ভাণ্ডারের কিছু অর্থ হরিশের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হরিশ নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত নীলচাষীদের সাহায্য দিয়ে প্রয়োজন স্থলে এসোসিয়েশনের ফাণ্ডের টাকা খরচ করতেন। হরিশকে নিয়মিত এই টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিতে হ'ত। হরিশের জীবনের আশা যখন লুপ্ত, তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ হরিশের কাছে ন্যস্ত টাকা মারা যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁর বাড়িতে টাকার হিসাব ও বাকি টাকা আদায়ের জন্য লোক পাঠিয়েছিল। এই লোকেরা প্রভুদের আজ্ঞামত হরিশের বাড়ি গিয়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করে টাকার হিসেব দাবী করেছিল। হরিশ এই সময় পাশের ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। হরিশ নিজের উপার্জিত অর্থ পরহিতার্থে অকাতরে ব্যয় করতেন কিন্তু অন্যের অর্থ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন থাকতেন। ইণ্ডিগো ফাণ্ডের প্রতিটি পাই-পয়সায় তিনি হিসেব রেখেছিলেন, খরচ হয়নি এমন টাকাও তিনি হিসেব মিলিয়ে মায়ের কাছে এসোসিয়েশনে ফেরৎ দেবার

* এই অর্থভাণ্ডারটি উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সৃষ্ট হয়। [A Bengal Zamindar—N. Mukherjee, Calcutta, 1975 (pp 237-8)]

জন্য জমা রেখেছিলেন, এসোসিয়েশনের লোক আসার ব্যাপারটি বুঝতে পারা মাত্র সেই অবস্থাতেই হরিশ মাকে তাদের হাতে টাকা ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এসোসিয়েশনের লোকেরা হরিশের মায়ের কাছ থেকে হিসেব পেয়ে, 'হিসেব ঠিক নেই, আরও টাকা তাদের পাওনা আছে।'—এই নিয়ে তর্ক তুলেছিল। প্রায় অচৈতন্য হরিশ যখন পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে এসোসিয়েশনের লোকেদের তর্ক বিতর্ক চেচাঁমিচির শব্দ শুনতে পান তখন তিনি মাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, "ওরা বলছে হিসেব ঠিক নেই, আরও টাকা মার কাছে পাওনা আছে, ওরা যে টাকা পাওনা আছে বলছে, কোন রকমে সেটা জোগাড় করে দিয়ে দাও মা, চেচাঁমিচি, টাকা নিয়ে ঝামেলা আমি আর সহ্য করতে পারছি না"। অতঃপর হরিশ জননী এসোসিয়েশনের লোকজনকে তাদের দাবী মত টাকা দিয়ে বিদায় করেন। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই হরিশের মৃত্যু হয়। বেঙ্গলী, ২৯. ৭ ১৮৬৩)।

হরিশের মৃত্যুকালে তাঁর আপিসের বড় কর্তা কর্নেল চ্যাম্পনীজ দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে স্বদেশে বাস করছিলেন। ছুটির শেষে তিনি যখন কাজে যোগদান করেন তখন হরিশ পরলোক গমন করেছেন। হরিশের অসহায় পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা নেই জেনে তিনি হরিশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রকে নিজের আপিসে একটি কাজ জুটিয়ে দেন। হারাণচন্দ্র সম্ভবতঃ খুব অল্প বেতনের চাকুরী পেয়েছিলেন। হরিশের মৃত্যুর অল্প দিন পর হরিশের জননীর মৃত্যু হয়। হরিশের বিধবা পত্নী ভগবতী দেবী হারাণচন্দ্রের অভিভাবকত্বে ভবানীপুর পল্লীর ৪৬ নং চাউল পটি রোডে দীর্ঘকাল বাস করেন। রামগোপাল সান্যাল যখন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের জীবনী রচনা করেন তখন হারাণচন্দ্র জীবিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ এর দু-তিন বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। হারাণচন্দ্র সম্ভবত অকৃতদার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বা সন্তানাদি সম্বন্ধে কোন সংবাদ দুর্লভ। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরিশ পত্নী ভগবতী দেবী নূতনভাবে বিপদগ্রস্ত হন। হারাণের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তথা হরিশ স্মৃতিরক্ষা তহবিল থেকে প্রদত্ত মাসিক ১০.০০ টাকা সাহায্য তার জীবনধারণের একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু এটা অপর্যাপ্ত ছিল। ভবানীপুর পল্লীর কিছু ভদ্র ব্যক্তি ভগবতী দেবীর দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তাঁকে অর্থ সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের কাছে একটি আবেদন সংবাদপত্রে প্রচার করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে এই আবেদনের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল যে - "হরিশ্চন্দ্র এক সময়ে দেশের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা তহবিলে নানা জায়গা থেকে চাঁদা এসেছিল, সেই টাকায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশন 'হরিশ হল' প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃখের বিষয় ঐ সময়ে কেউ তাঁর বিধবা পত্নীর ভরণ-পোষণের কথা ভাবেননি। এই বৃদ্ধা এখনও বেঁচে আছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাঁকে মাসিক দশ টাকা ভাতা দিয়ে থাকেন কিন্তু এই টাকায় তাঁর ব্যয় সংকুলান হয় না, ঋণ-ধার করে তাঁকে চালাতে হয়। তাঁর বাড়িটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, বাসযোগ্য করতে হলে বাড়িটির মেরামত প্রয়োজন সে টাকাও তাঁর নেই। প্রকৃত মহান স্বদেশ-প্রেমিক হরিশ্চন্দ্রের বিধবাকে সাহায্য করার জন্য যে আবেদন প্রচার করা হয়েছে, দেশবাসী আশা করি তাতে সাড়া দিয়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য পাঠাতে কুণ্ঠিত হবেন না" (বেঙ্গলী, ১৩.৪.১৮৯৫)। এই আবেদনে কোন সাড়া মিলে-ছিল কিনা জানা যায় না। এর তিন চার বছর পর হরিশের অসহায়া বিধবা পত্নী আর এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হন, এতদিন তাঁর মাথা গোঁজার উপযোগী একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি ছিল, এখন তাঁর সেই আশ্রয়টুকুও হস্তচ্যুত হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নূতন এক আইনবলে সার্কুলার রোডের পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত শহরতলীগুলিকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আনা হয়। লোয়ার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য জগদীশ বসু রোড) দক্ষিণে অবস্থিত বালীগঞ্জ, চেতলা, কালীঘাট, ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি অঞ্চল এইভাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর এই অঞ্চলগুলিতে সুপ্রশস্ত রাজপথ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই রাস্তাগুলির মধ্যে দুইটি পথ নির্মিত হওয়ার পর হাজরা রোড ও হরিশ মুখার্জি রোড নামে পরিচিত হয়েছে। হাজরা রোড থেকে লোয়ার সার্কুলার রোডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী যে দীর্ঘ পথটি সরলরেখাকারে পরিকল্পিত হয়েছিল চাউলপটি রোডের চারিটি বাড়ির উপর দিয়ে তার গতিপথ নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এই বাড়ি চারটির নম্বর ছিল ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮। একদিকে ৪৪নং বাড়ি (বাসিন্দা কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী) ও অপর প্রান্তে ৪৯নং বাড়ি (বাসিন্দা—হারাণচন্দ্র বসু) প্রস্তাবিত পথের দুই প্রান্তে পড়ায় এই বাড়ি দুটি বেঁচে যায়। ৪৬নং বাড়িটি ছিল হরিশ্চন্দ্রের বিধবা ভগবতী দেবীর বাসস্থান একথা পূর্বে বলা হয়েছে। হরিশের বাড়ির উপর দিয়ে রাজপথ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগবতী দেবী বাড়ির ও জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থ পেয়েছিলেন সেটা অনুমান করা যায়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের স্ট্রীট ডাইরেকটরীতে ৪৬নং চাউলপটি রোডের উল্লেখ আছে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডাইরেক্টরীতে ৪৫ থেকে ৪৮নং বাড়ি বা তাদের মালিক বা বাসিন্দার উল্লেখ নেই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডাইরেক্টরীতে সর্ব প্রথম হরিশ মুখার্জি রোডের উল্লেখ দেখা যায়। মনে হয় পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর রাস্তাটি বর্তমান শতাব্দীর শুরু হওয়ার কিছুকাল পর ব্যবহারযোগ্য হয়েছিল। বর্তমানে ভবানীপুরে চাউল পটি রোড নামে কোন পথের অস্তিত্ব নেই। সুবার্বণ

স্কুল রোড নামে (বর্তমানে সুহাসিনী গাঙ্গুলি সরণি) একটি রাস্তার ৪৮-এ সংখ্যক বাড়ির পশ্চিম দিকের যে অংশ ৬৮।৩ এ হরিশ মুখার্জি রোডের উপব অবস্থিত বর্তমানে সেখানে প্রাচীর গাত্রে একটি মর্মর ফলকে ইংরাজী ও বাংলায় লিখিত আছে :

Here stood the house in which lived, worked and died Harish Chandra Mookerjee, Editor-Hindoo Patriot and father of Indian Journalism, Born 1824, Died 1861.

বর্তমান ভারতের রাজনীতি শিক্ষা দাতা
স্বদেশ সেবক ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'
পত্রের অমব সম্পাদক
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসভবন এই ভূমিখণ্ডেব
উপব অবস্থিত ছিল
জন্ম—১২৩১ সাল মৃত্যু -১২৬৮ সাল

এই ফলকটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক দুইশত টাকা ব্যয়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* মনে হয় যে প্রাচীরের গায়ে এই ফলকটি বসানো আছে তাব নিম্নস্থ পথ ফুটপাথ) এবং সংলগ্ন পথের পশ্চিম ভাগেব একাংশ জুড়ে হরিশের বাড়িটি অবস্থিত ছিল। মূল বাড়িটির উপর দিয়েই পথটি নির্মিত হয়েছিল। নিজস্ব বাড়ির আশ্রয়চ্যুতা ভগবতী দেবী অবশিষ্ট জীবন ভবানীপুব পল্লীতেই সম্ভবতঃ কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অথবা কোন সহৃদয় ব্যক্তিব আশ্রয়ে কাটিয়েছিলেন। হরিশের মৃত্যুর প্রায় ৬১ বৎসর পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁব বিধবা পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৫ই জুলাই, ১৯২২, মফস্বল সং) সংবাদে মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়নি, সম্প্রতি পরলোক গমনের কথা লেখা হয়। ** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষাব জন্য দেশবাসী আর একবার উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত স্মৃতি রক্ষা কমিটি হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য পাঠাগার ও পাঠগৃহ সমন্বিত একটি লাইব্রেরী, সাধারণ মিলন স্থানের জন্য একটি চত্বর ও একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে অর্থ প্রদানের আবেদন প্রচার করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' সংবাদ পত্রে এই আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়েছিল যে হরিশ্চন্দ্রের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও জনসেবার কথা মনে রেখে তাঁর স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

* **Chronicles of the B. I. Association (1851—1952) Calcutta, 1965 (pp. 361).**

** শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই সংবাদটি পাওয়া গিয়েছে।

দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশের মহাপুরুষদের স্মৃতির প্রতি আমরা যে ঔদাসীন্য দেখিয়ে থাকি সেটা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। এই কলঙ্ক স্খালনের এই যে সুযোগ এসেছে দেশবাসী আশা করি তার সুযোগ গ্রহণ করবেন। হরিশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমরা নিজেদেরই সম্মানিত করব ["And in so honouring Hurrish we should but be nonour--ing overselves". Bengalee, May 20, 1899.]

এই স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যমও মনে হয় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দক্ষিণ কলিকাতায় 'হরিশ মুখার্জি রোড' ও এই পথের ধারে একটি 'পার্ক' এর 'হরিশ পার্ক' নামকরণের পেছনে অবশ্য এই স্মৃতিরক্ষা কমিটির প্রচেষ্টা কার্যকর হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হরিশ্চন্দ্রের স্মরণার্থ একটি স্মৃতি স্তম্ভ হরিশ পার্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এই স্মৃতি স্তম্ভ গাত্রে মর্মর ফলকে ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় নিম্নলিখিত শব্দাবলী ক্ষোদিত আছে। হরিশের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শনটিই হরিশ্চন্দ্র অনুরাগীদের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়। হরিশের নামাঙ্কিত এই উদ্যানটিতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে বহু জনসভা হয়েছে। বহু বরেণ্য জননায়কের পদধূলি হরিশ পার্কে পড়েছে।

স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যিনি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অধিনায়ক ছিলেন এবং স্বসমকালে বহুবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা সহকারে ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার বিতর্ক দ্বারা স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন,

যিনি অসামান্য সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন,

যিনি বিদ্রোহ সংকুল সংকট সময়ে রাজপুরুষদিগকে সৎ পরামর্শ দিয়াছিলেন ও রাজনীতির প্রকৃত অভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন, যিনি উৎপীড়িত দীন দরিদ্রের পিতৃস্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করিতে সাধ্যপক্ষে কখনই বিমুখ হইতেন না, যিনি স্বীয় জীবনে স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন,

যিনি একাধারে প্রজাবৃন্দের শরণ্য পৃষ্ঠপোষক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন এই কীর্তিস্তম্ভ—

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ কর্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল।

কলিকাতা ভবানীপুরে ১২৩১ সালে তাঁহার জন্ম ও ১২৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(ইংরাজী)

....

Sacred to the memory
of
Hurrish Chunder Mookherji
Who, as Editor of the Hindoo Patriot,
As a guiding spirit of the British Indian Association,
And in connection with various
movements of his time,
Rendered conspicuous services to the country
By his able and disinterested discussion
of public affairs,
Who waged war against wrong and vindicated justice
With a rare courage, honesty and independence,
Who in a critical period of transition
Gave counsels of wisdom to the rulers and interpreted
their policy,
Who was a father to the aggrieved poor,
And never denied them any personal help in his power,
Who lived a life of
Self sacrifice and heroic devotion to duty,
Who was at once
A tribune of the people and pillar of the empire.
This monument is erected
By his grateful countrymen with funds raised
By public subscription
Born 1824 : At Bhowanipur, Calcutta.
Died 1861 :

সম্ভবত এই স্মৃতিস্তম্ভটি সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্রে উল্লিখিত স্মৃতি রক্ষা কমিটি কর্তৃকই স্থাপিত হয়েছিল। এই স্মৃতি'ক্ষা সমিতির সম্পাদকের নাম ছিল শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী। এই স্তম্ভটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে মর্মর ফলকে খোদিত লিপিটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

কলিকাতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পি. টি. নায়ার সম্প্রতি তাঁর প্রকাশিত একটি গ্রন্থে লিখেছেন, "পূর্বতন লোয়ার সার্কুলার রোড, (বর্তমানে আচার্য জগদীশ বসু রোড,) থেকে পিপুলপটি পর্যন্ত পথটি (বর্তমানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেদিয়া পাড়া রোড, নামে পরিচিত ছিল। হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির আবেদন ক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক এই পথটি হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি রোড নামে চিহ্নিত হয়। এই রাস্তাটি ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে কালিঘাট রোড ও পরে হাজরা রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতীর চেষ্টায় বর্তমান জগদীশ বসু রোড থেকে হাজরা রোড পর্যন্ত সমগ্র পথটিই হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি রোড নামে পরিচিত হয়।

বর্তমানে ৬১ হরিশ মুখার্জি রোড, সংলগ্ন প্রায় সাতবিঘা পরিমাণ একটি উদ্যান 'হরিশ পার্ক' নামে পরিচিত। পূর্বে এটি রাজার বাগান নামে পরিচিত ছিল।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশন এটিকে একটি পার্কে পরিণত করেন। এই পার্ক সংলগ্ন এক ভূমিখণ্ডের উপর হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয় ও এই ভূমিখণ্ডও উদ্যানটির অন্তর্ভুক্ত হয়। পার্কটি যখন নির্মিত হয় তখন সরকারী ভাবে এটির নাম ছিল 'কিংস পার্ক'। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি স্তম্ভটি নির্মিত হওয়ার পর সকলেই এটিকে 'হরিশ পার্ক' নামেই অভিহিত করত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট কলকাতা কর্পোরেশন জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সরকারীভাবে এটিকে হরিশ পার্ক নামে ঘোষিত করেন (মর্মানুবাদ)।"*

৫

হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম চিন্তা

হরিশের মনে ধর্ম ভাব অতি গভীর ছিল। স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণগুলির উৎস উপনিষদ্। রামমোহনের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সূত্র ধরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন তার ভিত্তি বেদান্ত বা উপনিষদ্। এই ধর্ম হরিশ্চন্দ্রকেও প্রভাবিত করেছিল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী হরিশ্চন্দ্রের বক্তৃতাগুলিকে ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন যে হরিশ্চন্দ্রই সর্ব প্রথম ইংরাজীতে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করেন।

হরিশ্চন্দ্র প্রদত্ত একটি ভাষণের মর্ম এইরূপ- (২৩. ৬. ১৮৫৪) "সৃষ্টির প্রথম থেকেই এক ঈশ্বরের ধারণা বর্তমান, তবে কালের গতিতে কোথাও এ ধারণা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হয়েছে।...বেদ আমাদের ধর্মবোধের ধারক, এর প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা আছে। বেদ পবিত্রতম ও মহত্তম সত্যগুলির সুপ্রাচীন ভাণ্ডার" ("The Vedas were considered to be the regulators of our creed....our respect for these works is boundless. They are the earliest repositories of religious truths and they contain in many parts the purest and sublimest of religious truths"] তবে অক্ষয় কুমার দত্তের মতই তিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলে মনে করতেন না। তিনি লেখেন যে বেদের রচনা যতই অনুপ্রাণিত মনে হ'ক না এর উপলব্ধি অলৌকিক ব্যাপার নয়। ["Inspiration there is clearly traceable in these lines of ennobling sublimity or encapturing beauty....but it is not supernatural inspiration. The world owes many truths which are the object of religious knowledge, are beyond all other classes of truths, the discoveries of inspiration which dictated the sublime ideas—contained in the Vedas was the inspiration of such moments".]

বিশ্ব সৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এ সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন ধারণা আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে কতকগুলি ধারণার ন্যায়সঙ্গত

পরিণতি এই বিশ্ব সৃষ্টি ["We may believe that the universe is but a logical development of ideas"], কেউ মনে করেন যে এই বিশ্ব কতকগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা বুদ্ধি গ্রাহ্য উপাদানে গঠিত ["that the universe is a mass of substantial matter cognizable alike by the senses and by reason"] "কারো কারো এমন বিশ্বাস আছে যে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, অথবা সৃষ্টির পূর্বে চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা ছিল এবং সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই এমন একটা কিছু নিয়ম ছিল যে নিয়ম একটা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে" [" We may believe every part of the creation to have come to existence by a fiat of our maker or we may believe the whole to have been evolved by a law of development originally impressed upon the chaos that preceded the universe in existence"] "আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বর তাঁর নিজের মত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে তাঁর পূজা করবে আবার হয়ত তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই আমাদের অনধিগম্য।

আমরা এমনভাবে ভাবতে পারি যে কোন এক প্রক্রিয়ায় নীচু স্তরের প্রাণ থেকে উচ্চ স্তরের জীবের উদ্ভব হয়েছে। আমরা একথা বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবী-রূপ গ্রহের বাইরে আর কিছু নেই, অথবা আমরা একথাও বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে সব গ্রহ রয়েছে সেগুলি অগ্নিময় অথবা তুষারবৃত হলেও সেখানে এমন এমন সব প্রাণী আছে যারা এই পরিবেশের মধ্যেও নিজেদের উপযোগী জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে পারে। আমাদেব মনের এই যে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস আছে সেগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা আমাদের সামাজিক অগ্রগতি টলিয়ে দিতে পারে না। তবে এর মধ্যেও সার কথা হচ্ছে যে আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির যতই বিকাশ হ'ক না, পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ এবং সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতির ভাব বৃদ্ধির শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব। কারণ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।" ["Scientific discoveries cannot unsettle our faith, social progress cannot alter its foundations. With increasing knowledge, we only learn to increasingly love and fear and glorify Him who is without a second.

"—The progress of the truth we hold, of the faith we cherish in us will extend with increasing rapidity until superstition is chased away from the length and breadth of the country and our nation learn to worship with one heart and one voice, Him who is without a second."]

১৬১. ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রদত্ত একটি ভাষণে হরিশ্চন্দ্র মানুষের ধর্মবোধ

বিকাশের একটি বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে "দর্শনচিন্তা থেকেই মানুষেরা ধর্ম বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিল। বিশ্ব সৃষ্টি থেকে তাদের মনে এর স্রষ্টা বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মেছিল। পৃথিবীতে সর্বকালের ধর্মশাস্ত্রেই বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে এক পরমেশ্বরের কথাই বলা হয়েছে · এবং সাধারণভাবে এই মতটি স্বীকৃতি পেয়েছে।··· · তবে কিছু কিছু লোকের মনে সন্দেহ থেকে গেছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৮৬) ছিলেন এমনই একজন সংশয়বাদী। তবে তিনি অন্যান্য সংশয়বাদীদের মত ঈশ্বর নিন্দুক হতে পারেননি (unlike other doubters he never warmed into blasphemy] প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রবক্তা হিউমের পূর্বসূরী ছিলেন লক্‌ ১৬৩২ – ১৭০৪) ও বার্কলে (১৬৮৫ – ১৭৪৩)। বাস্তবে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন সব বিষয়ে (-uper ph)sical) মানুষের চিন্তার মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গিয়েছে। অবরোহ তর্কের ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার করতে গেলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত থেকে যায়।* এরপর ইমানুয়্যাল কাণ্ট (১৭২৪ – ১৮০৪) মানুষের বুদ্ধির বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে মানুষের যে পর্যবেক্ষণ শক্তি তারও উৎস হচ্ছে জ্ঞান, অবরোহ তর্কের আগে থেকেই রয়ে গেছে বিশ্বাস। আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসের মূলে রয়েছে 'প্রজ্ঞা'। কাণ্টের দর্শনের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্র' বিজ্ঞানের রূপ পেয়েছে [E. Kant analysed the human understanding aud proved that there was knowledge before observation, belief before induction; and that our faith in the existence of a God is composed of such knowledge and belief. The theology like all other sciences now found a firm and sure basis."] এই ভাষণে হরিশ্চন্দ্র আরও বলেন যে আমরা এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসাবে সর্বশক্তিমান এবং সবপ্রকার নীতি ধর্মের উৎস।

এই বিশ্ব সংসার নীতি ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। এই নীতি ধর্ম বলতে আমরা বুঝি যে ন্যায় বা কল্যাণ-ধর্মিতার একটা পুরস্কার আছে এবং অন্যায়ের শাস্তি আছে। ন্যায় এবং অন্যায় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা, ন্যায় এবং অন্যায়ের সহাবস্থান কোন মতেই সম্ভব নয়।

মৃত্যুর পরেও একটা অবস্থা আছে, এর অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। এই অস্তিত্ব বিশ্ব-ব্যাপারে যে ন্যায় ধর্মের পরিমণ্ডল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যায়।··· ·· এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র বলেছেন যে মানুষ যেমন ব্যবহারিক জীবনে ধাপে ধাপে

* হিউম দর্শন সম্বন্ধে তাঁর রচিত এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য Treatise of Human Nature, Enquiry into Human Understaanding, Natural History of Religion, Enquiry Concerning the Principle of Human Morals.

এগিয়ে যেতে পারে, আধ্যাত্মিক জীবনেও তা সম্ভব। চেষ্টা সহকারে সে দিব্য জীবনের ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে।

["We believe in the existence of God—a God endowed with a distinct personality, moral attributes equal to His nature and intelligence befitting the Governor of the universe.

We believe in a moral government of the universe—comprehending in that belief a recognition of the designed adjustment of rewards and punishments to acts of moral consciousness, and of the existence of an immutable distinction between right and wrong.

We believe in a future state of existence—a state of conscious existence succeeding life in the world, and supplementary to it as respects the action of the universal moral government. We believe that the religious condition of man is progressive like the other parts of his condition in the world."] তিনি আরও বলেন যে "মানুষের নৈতিক দায়িত্বের চেতনা ঈশ্বর চেতনার মতই মানুষের মনে ওতপ্রোত। মানুষ সকল বাধা বিপত্তির মধ্যেও তার জীবনে নৈতিকতা আঁকড়ে থাকতে পারে। সে যে ভাবে খুশী চলতে পারে (free agent), কাণ্ট এটা মানতে পারেননি এটা তাঁর দর্শনের একটা দুর্বলতা (Kant's antinomics must ever remain a standing monument of inefficiency to deduce man's moral responsibility.) তিনি আরও বলেন যে আমাদের ধর্মের (ব্রাহ্ম সমাজ অনুসৃত বৈদিক ধর্ম) সঙ্গে কাণ্টের যুক্তিবাদী দর্শনের (critical philosophy) বিরোধ এই যে যুক্তিবাদী দর্শনে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বিশ্ব নিয়ন্ত্রক এক সত্তা মাত্র আর কিছু নন। অন্যদিকে আমাদের কাছে তিনি পরম প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ। আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর শুধু আমাদের স্রষ্টা নন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তাঁর অনন্ত শক্তি ও গুণরাশি মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাঁকে ভালবাসতে শেখায়; মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়, এতে তার মনে শান্তি আসে।"

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ 'সমবেত হয়ে ঈশ্বর আরাধনার উপযোগিতা' সম্বন্ধে আর একটি ভাষণ দেন। যুক্তিবাদী হরিশকে নাস্তিক্য বুদ্ধি আচ্ছন্ন করতে পারেনি। হরিশের ধর্ম চিন্তা আর হরিশের ধর্ম-ভাবনার উৎস ছিল উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবদগীতা। হরিশচন্দ্র গীতা বিষয়ে অনেকগুলি ব্যাখ্যামূলক ভাষণ দেন, দুঃখের বিষয় এই ভাষণগুলি রক্ষিত হয়নি। গীতার নিষ্কাম

কর্মযোগ হরিশ্চন্দ্রকে জীবনে যে প্রেরণা দিয়েছিল, তাঁর সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করলে তা বেশ বোঝা যায়।*

হরিশ্চন্দ্রের ধর্মচিন্তা তুলনামূলক ধর্মচর্চার অন্যতম প্রবর্তক, Sacred Books of the East. গ্রন্থমালার সম্পাদক ফ্রীড্‌রীখ্‌ ম্যাক্সমুল্যারেরও (১৮২৩ - ১৯০০) প্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।**

* Three Lectures On Religious Subjects—Harrish Chandra Mookerjee Ed. by Braja Lal Chakraborty, Calcutta (Bhowanipur), 1887

** My Indian Friends (Auld Lang Syne) vol II, London, 1899.

১৬

উপসংহার

হরিশ্চন্দ্র—ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

এক অতি দুঃস্থ পরিবারে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে বাড়িতে পড়ে তিনি বিনা বেতনে ৬ / ৭ বৎসর ভবানীপুরের একটি স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধাবী এই বালককে আর কিছু শেখানোর সামর্থ্য এই স্কুলের শিক্ষকদের ছিল না, তাঁর বিদ্যা শিক্ষকদের বিদ্যাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল! এরপর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের চেষ্টা করেন কিন্তু বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষ থেকে কোন ছাত্রদের নাম প্রেরিত হলে তার পক্ষে বিনা-বেতনে শিক্ষার সুযোগ মিলত। দরিদ্র-ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এঁদের কারো অনুগ্রহ লাভ সম্ভব হয়নি। সংসারে নিদারুণ দারিদ্র ছিল। বালক বয়সেই হরিশ্চন্দ্র লোকের দরখাস্ত লিখে, অথবা দলিল দস্তাবেজের নকল করে দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন—এই অর্থ সংসারের কাজে লাগত। বালক বয়সেই হরিশ্চন্দ্র একটি নীলাম কোম্পানীর আপিসে মাত্র দশ টাকা বেতনের একটি চাকরী পান। বহুদিন তিনি এখানে কাজ করতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি কিছু শিক্ষিত ইউরোপীয়ের সংস্পর্শে আসেন, এঁরা তরুণ হরিশ্চন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। ভবানীপুরবাসী শম্ভুনাথ পণ্ডিতের এবং এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের সংস্পর্শে এসে হরিশ্চন্দ্র এঁদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন, পরে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতেও তাঁর পড়বার সুযোগ ঘটে। অসাধারণ জ্ঞান-স্পৃহা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার সমবায়ে যৌবনে পদার্পণের আগেই হরিশ্চন্দ্র তাঁর পরিচিত মহলে একজন অসাধারণ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। তাঁর অধীতব্য বিষয় শুধু সাহিত্য ছিল না, দেশ বিদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এমন কি আইনের মত বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান জন্মেছিল। সম্ভবতঃ শম্ভুনাথের মাধ্যমে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল, এদের কারো কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পুষ্টকায়, গৌরকান্তি, আয়তনেত্র, প্রশান্ত ও সৌম্যমূর্তি সম্পন্ন হরিশ্চন্দ্র পরিচিত মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁর মানসিক প্রশান্তির হানি করতে পারেনি, তাঁর মুখের

হাসি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে হরিশ্চন্দ্র ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে একটি সরকারি আপিসে চাকরি পান। কর্মদক্ষতা এবং সচ্চরিত্রতার জন্য তিনি তাঁর উপরিতন কর্মচারীদের আস্থা অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম উপরিতন কর্মচারী মিঃ চ্যাম্পনীজ, অচিরকালের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রের একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে তাঁর পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হতে থাকে। মোটামুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়ে যাওয়াতে হরিশ্চন্দ্রের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হয়ে যায়। এতকাল তাকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনো করতে হত, এখন থেকে তিনি কিছু কিছু বই কিনে পড়ারও সুযোগ পান। তাঁর আপিসের মি' চ্যাম্পনীজ ও মিঃ ম্যালেসন দুজনেই সুশিক্ষিত ছিলেন, এঁরা প্রচুর বই হরিশকে পড়তে দিতেন। বিলাতি সাময়িক পত্রিকাগুলি পড়ার সুযোগও তিনি এদের মারফৎ পেতেন। তাঁর পঠিতব্য বিষয় সীমাবদ্ধ ছিল না। শুধু সাহিত্য নয় বিশ্বইতিহাস, বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এমন কি বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলিও তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে তিনি "এডিনবার্গ রিভিউ" এর ৭৫টি খণ্ড পড়ে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় প্রতিটি খণ্ডের বিষয়বস্তু কি তাও তিনি প্রশ্ন করলে বলে দিতে পারতেন। গিবনকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মনে করতেন এবং কথা প্রসঙ্গে তিনি এর অংশবিশেষ অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। কান্টের দর্শন বিশেষ করে "critique of pure reason" থেকেও তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র আইন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতেন, প্রসন্নকুমার 'ছেলেমানুষ' হরিশকে প্রথম প্রথম বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, পরবর্তীকালে তিনি হরিশের আইন জ্ঞানের প্রশংসা করতেন।

মিলিটারী অডিট বিভাগে কাজে যোগদানের প্রায় দুই বৎসর পর সেখানে উত্তর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিত তরুণ-যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাজে যোগদান করেন। গিরিশ হরিশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। গিরিশের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রনাথ ও মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথের সঙ্গেও হরিশের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অতঃপর হরিশ উত্তর কলকাতাবাসী এই ঘোষ পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বরূপ গণ্য হতেন। সম্ভবতঃ এই সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্পর্শে আসার পর হরিশের পরিচিতি উত্তর কলকাতাতেও বিস্তৃত হয়েছিল। ঘোষ ভ্রাতৃগণ ১৮৪৯।৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, হরিশ বেঙ্গল রেকর্ডারের অন্যতম লেখক হন। ইতিপূর্বে কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' কাগজেও হরিশের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইংলিশম্যান' ও অন্য দু'একটি ইংরাজ পরিচালিত কাগজে হরিশের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু এই লেখা-

গুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৫০ এর মধ্যে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে হরিশ্চন্দ্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেন। তাঁর বিত্তাবুদ্ধি, ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা, সারল্য, সহৃদয়তা ও ঔদার্য কলকাতার শিক্ষিত এবং ধনী-অভিজাত ব্যক্তিদেরও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসেননি এমন অনেকেও তাঁর সঙ্গে পরিচয়লাভ সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। কি অবস্থায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয় পূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে। যাঁরা এটি প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ যাঁরা প্রথমেই এর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন তাঁদের মধ্যে হরিশের নাম পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় যে হরিশ এই প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন এবং প্রস্তাবিত চার্টার য়্যাক্টের আবেদন পত্রটি রচনার ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। বি-আই-এসোসিয়েশনের অগ্রিম সভ্য চাঁদা ধার্য হয়েছিল ৫০.০০ টাকা, মনে হয় দরিদ্র করণিক হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এই চাঁদা দিয়ে সভ্য পদ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। হরিশের আত্মসম্মান জ্ঞান অতি প্রখর ছিল, কঠোর দারিদ্রভারে নিষ্পেষিত অবস্থায়ও হরিশ কারো সাহায্য ভিক্ষা করতেন না, তাঁর এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য জীবনান্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যাই হোক, এসোসিয়েশনের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই হরিশ এসোসিয়েশনের সভ্য হন, অগ্রিম চাঁদা ৫০.০০ টাকা সম্ভবতঃ তিনি এই সময়ে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এসোসিয়েশনে যোগদানের পরই তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহসম্পাদক পদে নির্বাচিত হন—নামে সহসম্পাদক হলেও আসলে তিনিই ছিলেন এর প্রধান নেতা। নূতন চার্টার য়্যাকট সংক্রান্ত যে আবেদনপত্র এসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রেরিত হয় তার মুসাবিদা হরিশ্চন্দ্রই করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতে এটি হরিশের হস্তাক্ষরেই প্রেরিত হয়েছিল। এটাই সম্ভব, কারণ হরিশের হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল আর তখন টাইপ রাইটার প্রচলিত হয়নি। এসোসিয়েশনের বহু দাবী গৃহীত হয়নি, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে এসোসিয়েশনের তরফে নানা দাবী উপস্থিত করে আরও দুটি 'পিটিশন' প্রেরিত হয়, এই দুটিরও মুসাবিদা হরিশ্চন্দ্রই করে দেন। এক সময় ভারতবাসীর দাবীগুলি পার্লামেণ্টের সদস্যদের কাছে উপস্থিত করার জন্য ইংলণ্ডে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব হয়, সর্বসম্মতিক্রমে হরিশ্চন্দ্রকেই এই কাজের জন্য উপযুক্ততমরূপে নির্বাচিত করা হয়। হরিশ্চন্দ্র আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সম্ভবতঃ মাতার অনিচ্ছাই এর কারণ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। তবে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। হরিশের মৃত্যুর

পর এসোসিয়েশন আয়োজিত শোক সভায় জনৈক বক্তা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) বলেছিলেন যে এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেও একথা বলা যায় যে হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-পুরুষ। এসোসিয়েশনের চেষ্টায় এর প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছ থেকে ভারতবাসী যেটুকু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, তার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হরিশ্চন্দ্রের প্রাপ্য।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মধুসূদন রায়ের অর্থানুকূল্যে তাঁরই প্রেস থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্র কোন আর্থিক সাহায্য না নিয়েই এর সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর দুই ভ্রাতা তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং হরিশ্চন্দ্রকেই এর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয়। জাতীয়-জাগরণে একটি সংবাদপত্র fourth state রূপে কি স্থান গ্রহণ করতে পারে পশ্চিমদেশীয় সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকায় হরিশ্চন্দ্র তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কাজেই হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার কাজটিকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ও এই কাজের মাধ্যমেই তিনি ভারতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তখন ভারতে সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব ছিল না, ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের মুখপত্র রূপে হিন্দু পেট্রিয়ট ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক লিখেছিলেন যে হরিশ্চন্দ্রই ভারতের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সাংবাদিক।* প্রথম দুই বৎসর হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র চালাতে গিয়ে এর স্বত্বাধিকারীর প্রচুর আর্থিক লোকসান হয়, হরিশ্চন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বিনা পারিশ্রমিকে পালন করলেও এর ব্যবসায়িক দিকটির প্রতি তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল না। হরিশ্চন্দ্র এই পত্রিকাটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে এই পত্রিকাটির স্বত্ব প্রেসসহ কিনে নেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে এটি কিনতে হয়েছিল, কারণ সরকারি কর্মচারীরূপে অন্য কোন ব্যবসা করার অধিকার তাঁর ছিল না। এই প্রেসটি কিনে হিন্দু পেট্রিয়টকে বাঁচিয়ে রাখতে হরিশকে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টকে বাঁচিয়ে রাখতে হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর বেতনের অর্ধেক, কখনও বা তারও অধিক খরচ করতে হ'ত। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদন ও প্রকাশ তিনি তাঁর পরিবার প্রতিপালনের মতই আবশ্যকীয় কর্তব্য মনে করতেন কারণ এই পত্রিকাটিকে তিনি তাঁর দেশ সেবার মাধ্যমরূপে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ব্যবসায়িক সাফল্য না এলেও হিন্দু পেট্রিয়ট ইতিমধ্যে

* "The First Indian Journalist of any note"—G. P. Pillai (Representative Indians)

দেশবাসির বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। ইংরাজি ভাষায় মাধ্যমে প্রচারিত এই পত্রিকা বাংলার বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সমাজকেও জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ লর্ড ডালহৌসি ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লেঃ গভর্ণর হ্যালিডের কুশাসন ও নিপীড়নের কাহিনী নিয়মিত প্রকাশ করে হরিশ্চন্দ্র এদের ভীতি ও উদ্বেগের কারণ হয়েছিলেন। তিনি ইউরোপীয় সমাজের বর্ণবৈষম্য নীতিও আত্ম-ম্ভরিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। একাধিক বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে লর্ড ডালহৌসি লেঃগভর্ণর হ্যালিডের মারফৎ হরিশ্চন্দ্রকে একটি উচ্চ পদের প্রলোভনে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন, দরিদ্র হরিশ্চন্দ্র ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।* গভর্ণমেণ্টের সমালোচনায় হরিশ্চন্দ্র যে নির্ভীকতা ও দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তা তুলনারহিত। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহকালে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে একাধিকবার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু এই ভীতি প্রদর্শন তাঁর মনোবল নষ্ট করতে পারেনি। দৈহিক নির্যাতনের বা প্রাণহানির সম্ভাবনা তাঁকে বিচলিত বা সত্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। পেট্রিয়টের ইতিহাস ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, এর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে যে হরিশ্চন্দ্র এই পত্রে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি, ইংরাজের ঔদ্ধত্য, অপশাসন, অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিবাদে কোন শৈথিল্য দেখাননি। হরিশ্চন্দ্রের রাজনৈতিক এই মত ছিল যে ব্রিটিশ 'কনস্টিটিউশন' ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে, ভারতবাসীকেও সেই অধিকার দিতে হবে। যদি তা না হয় তবে কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রজারা যে স্বাধীনতা ভোগ করে ভারতবাসীদের সেই সুবিধা দিতে হবে। হরিশ্চন্দ্র আরও লিখেছিলেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নিতে হবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে ভারতের জন্য একটি পৃথক পার্লামেণ্ট বসাতে হবে। 'ব্রিটিশ লিবারেলিসম্' বা ব্রিটিশের স্বভাব সুলভ উদারনীতির প্রয়োগ ভারতের ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ করা হবে না—ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠি ও ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে বারবার তিনি এই প্রশ্নই তুলে ধরেছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই হরিশ্চন্দ্র প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে এর ক্ষতিকর দিকটি হিন্দু পেট্রিয়টের পাঠকদের গোচরে আনতেন এবং সংঘবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরামর্শ দিতেন। কোম্পানী শাসনের অবসান ও মহারানি ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ ও সেই সঙ্গে মহারানির ঘোষণায়

* হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী—রামগোপাল সান্যাল (পৃঃ ৫০) নানাসূত্রে থেকেও এই তথ্যটি সমর্থিত হয়েছে।

বিভ্রান্ত ভারতবাসী যখন হর্ষোৎফুল্ল তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁর ক্ষোভ দমন করে রাখতে পারেননি। তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন যে ভাল ভাল প্রতিশ্রুতিগুলি প্রতিপালিত হবার সম্ভাবনা খুব অল্প। কোম্পানী শাসনের তীব্র সমালোচক হরিশ্চন্দ্র কোম্পানী শাসনের অবসানে কোন আনন্দ প্রকাশ করেননি। তিনি এই সময় লিখেছিলেন যে এতদিন একটি বণিকগোষ্ঠি দেশ-শাসন করত, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সাক্ষাৎ ব্রিটিশ 'ক্রাউনের' শাসনভুক্ত ভারতের কাঁধে পরাধীনতার জোয়াল আরও চেপে বসবে—তাঁর এই আশঙ্কা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপনকালে হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন যে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে 'সরেজমিনে' তদন্ত করে দেখার চেষ্টা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট করেনি, নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শাসিতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি, self determination অর্থাৎ শাসনতন্ত্র বেছে নেওয়ার অধিকার মানুষের আছে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোটি কোটি ভারতবাসীর মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চাইছে, এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এমন সময় এসেই পড়ছে যখন ভারত শাসন সম্পর্কীয় সকল কিছু সমস্যা ভারতবাসীরাই সমাধান করে নেবে।......সিপাহী বিদ্রোহ ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ জনগণকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে ভারত শাসনের রীতি ভারতবাসীর ইচ্ছামত না হলে পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে। ["Can a revolution in the Indian Govt. be authorised by parliament without consulting the wishes of the vast millions of men for whose benefit it is proposed to be made? The reply must be in the negative. The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians......]"—সিপাহী বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি হরিশ্চন্দ্র উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ কালে কালে গণবিদ্রোহের রূপ নেবে—এবং এর ফলে একদিন ইংরাজকে ভারত থেকে বিদায় নিতে হবে, হরিশ্চন্দ্র এটা মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন যে ভারতে অনভিপ্রেত হরিশ্চন্দ্র এই কথাটি বহু আগেই ঘোষণা করে লিখেছিলেন যে এমন কোন একজন ভারতবাসীও নেই যে বিদেশী শাসনরূপ নাগপাশের যন্ত্রণা অনুভব করে না কারণ বিদেশী শাসন মানেই যন্ত্রণা। ["There is not a single native of India, who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule" H. P. May 21, 1857]

হরিশের আগে কোন ভারতীয় এমন নির্ভীকভাবে পরাধীনতার যন্ত্রণার স্বরূপ ব্যক্ত করেননি। নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র কি ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন তা ইতিপূর্বে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন কি ভাবে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত ও ভীত করতে পারে নীল বিদ্রোহ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই নীল বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল।

নীল বিদ্রোহ সংগঠন, নীল কমিশন গঠন এবং নীলকর দমনে হরিশ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও গভীর দেশপ্রেম তাঁর সমসাময়িক কালেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভারতে জাতীয়তাবাদের জনকরূপে খ্যাত মনস্বী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) হরিশের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় বলেছিলেন যে হরিশই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে কি ভাবে জাতীয় সম্মান বজায় রাখতে হয়, অবিচলিত চিত্ত ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থাকে কি ভাবে যুক্তির সাহায্যে সংযত করা যায় ["From him we have learnt that dignified unyielding constitutional resistance to unjust measures and that calm logical mode of protest" HP. 12. 9. 1861.]

ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ ও কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ টমসন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার কলিকাতায় আসেন এবং কিছু দিন এখানে থাকেন। এই সময়ে তরুণ যুবক কৃষ্ণদাস পাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। হাতের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজটি দেখিয়ে এই অভিজ্ঞ রাজনীতি-ধুরন্ধর জর্জ টমসন এই মন্তব্য করেন যে ভারতে শুধু একটি মাত্র ব্যক্তি রাজনীতি বোঝেন এবং ইনি হলেন হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ["Only one Indian understood politics in India and that was the editor of the Patriot—Harish Chander Mookherjee."]*

হরিশচন্দ্রের পূর্বে কোন শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক বাঙলার শোষিত কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাননি। হরিশের আগে কোন বাঙালী নেতা দুঃস্থ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। হরিশচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নীল বিদ্রোহে মফঃস্বলের শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকেরাও অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অংশভাগী হওয়া বা গ্রাম বাঙলার মানুষের স্বার্থকে সমগ্র দেশের স্বার্থরূপে দেখা কর্তব্য এই শিক্ষা বাঙালী ভদ্রলোক-শ্রেণী সর্বপ্রথম হরিশচন্দ্রের জীবন থেকেই পেয়েছেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর যতই দিন এগিয়েছে ততই দেশের নেতৃবৃন্দ গ্রাম বাঙলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। হরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং মৃত্যুর পর বিদেশী সরকারকেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার

* K. D. Pal—A Study, N. N. Ghose, Calcutta, 1887.

প্রয়োজনে গ্রাম বাঙলার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোক নিয়েই শুধু দেশ নয়, এদের বাইরে যে বৃহৎ সংখ্যক কৃষক শ্রমিক গ্রাম বাঙলায় বাস করে তারাই যে দেশের মেরুদণ্ড এটি সর্বপ্রথম হরিশ্চন্দ্রই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষকে তিনি এবিষয়ে অবহিত করে গিয়েছেন। এ সম্বন্ধে এক বিদেশী ঐতিহাসিকের মতের উল্লেখ করা যেতে পারে, ইনি মন্তব্য করেছেন "আধুনিক যুগে (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী) ভারতের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল এই কলকাতা শহরে ; এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান। একটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এটাই আবার সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, এই লক্ষ্য ছিল যে দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।······হরিশ্চন্দ্র নীল বিদ্রোহের কালে এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ বা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারণাটিকে তাঁর সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে জনপ্রিয় ও লোকগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। এক যুগ পরে প্রখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার মাধ্যমে উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ধারার মূল স্রোতের অন্তর্ভূত হয়ে গিয়েছিল।" ["Although compassion for the weak and poor had strong roots in Indian thought, the quest for justice was first introduced into modern Indian politics by the European missionary and humanitarian...... the rómatic movement, transplanted to Calcutta through English education gave rise among the intelligentia to an idealisation of rustics. During the indigo disturbances this sentiment was popularised in the editorials of Harish Chandra Mukherjee of the Hindoo Patriot. A decade later it would enter the mainstream of Indian political thought······This concern with rural welfare was revolutionary in Indian history. In the past, the peasant of India carried the burden of his afflictions alone ···The peasants were always the victims, always the givers, never the receivers. Today politicians go among the villagers soliciting votes, planning commissions concern themselves with rural develoment projects, government agencies work to increase crop yields, extends cheap agricultural credit, improve

village sanitation and encourage education. The official con--cern with rural welfare had its beginning in the nineteenth century. It was foreshadowed by the sympathy shown the peasants by both the governments of Bengal and the educated Indian middle class during Indigo-disturbances of 1859-1862."]*

হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে আধুনিককালের এক বাঙালি গবেষকের একটি মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে. "সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্য শ্রেণীর ভিতর হরিশ্চন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কেবল কথায় নহে, কার্যত মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় নায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লইয়াই যে জাতি নহে, সমাজের শতকরা নব্বই জন কৃষকই জাতির প্রধানতম অংশ, এই কৃষক জনসাধারণের জীবনই যে প্রকৃত জাতীয় জীবন তাহাদের সংগ্রামই যে প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম তাহা একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।…"** আধুনিককালের আর এক অধ্যাপক গবেষক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় দশকের বাঙলার নায়করূপে বিখ্যাত ব্যক্তিদের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে এঁদের দোষ-ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ইনি লিখেছেন "শিক্ষিত বাঙালী সমাজ অর্ধশতাব্দী ধরে কৃষক সমাজের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেননি; কৃষক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা তাঁদের কর্তব্য ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র এর ব্যতিক্রম। শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যা আকাঙ্ক্ষিত তার কাছাকাছি তিনি পৌঁছেছিলেন।" ব্লেয়ার ক্লিং এর উক্তি উদ্ধৃত করে এই লেখক লিখেছেন যে সর্বপ্রথম এই একজন মধ্যবিত্ত নাগরিক কৃষক সমাজের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর ইনি লিখেছেন যে হরিশের বৈঠকখানায় বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কৃষক সমাজের যথার্থ ও উচিত সম্পর্কের সূচনা হয়। হরিশ এদের দরখাস্ত লিখে দিতেন। দুঃস্থ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলে এঁদের কথা (তাঁর কাগজে) লিখতেন। পরবর্তীকালে এই নব স্থাপিত কৃষক ও শিক্ষিত সমাজের সহযোগিতা বিষয়টি বেশ ভালভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিল।…(মর্মানুবাদ)।***

* Blue Mutiny—O.P. cit (pp. 222-23)

** ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়, কলিকাতা ১৯৬৬ (পৃঃ ৪০)

*** New View Points on Nineteenth Century Bengal—C. Palit, Calcutta, 1980 (pp. 100)

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন এগুলি পড়লে হরিশ্চন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর জীবনী লেখকদের কাছ থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। এইগুলির ভিত্তিতে হরিশের ব্যক্তি জীবনের একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত করা যেতে পারে।

হরিশ্চন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অপরিসীম মাতৃভক্তি। চাকুরি জীবনে প্রবেশ করার পর হরিশ্চন্দ্র অতি কষ্টে ভবানীপুর চাউলপটিতে (বর্তমান হরিশ মুখার্জি রোড,) একটি বাড়ি ক্রয় করেন অথবা নির্মাণ করেন। হরিশ জননী রুক্মিনী দেবীর কোনদিন স্বামী গৃহবাসের সৌভাগ্য হয়নি। প্রথমে মাতামহের গৃহে পরে নিজের পিত্রালয়ে দুটি পুত্রসহ রুক্মিনী দেবীকে বাস করতে হয়েছে। হরিশ প্রথম সুযোগেই মাতাকে স্বগৃহে কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাংসারিক বিষয়ে পরিবারে মাতারই একাধিপত্য ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে হরিশ মাতার একান্ত বাধ্য ছিলেন। হরিশকে একাধিকবার ভারতের প্রতিনিধিরূপে ভারতবাসীর দাবী উত্থাপনের জন্য ইংলণ্ড প্রেরণের প্রস্তাব উঠেছিল। সম্ভবতঃ মায়ের অনুমোদন না পাওয়াতেই হরিশ এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই হরিশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের মনোনীত এক কুরূপা, অশিক্ষিতা ও দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্রের এই দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। তথাপি হরিশ্চন্দ্র কোনদিন এই স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন বা তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছেন একথা শোনা যায়নি। হরিশ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তিনি যে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ছিলেন একথা নিশ্চিত। একেশ্বরবাদী হরিশ মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন। মায়ের ইচ্ছাপূরণ ব্যতীত হরিশের নিজ গৃহে দুর্গাপূজার আয়োজনের মধ্যে হরিশের চরিত্রের আরও দুটি দিক উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। প্রথমটি হ'ল তাঁর মধ্যে তৎকালীন ব্রাহ্ম সুলভ গোঁড়ামির অভাব। পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গোৎসবের মধ্যে তিনি যে সামাজিক সম্প্রীতির পৃষ্ঠপোষণা করতে চাইতেন এইটি হ'ল দ্বিতীয় দিক্। তাঁর জীবনের শেষ দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান-কালে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে হরিশ মন্তব্য করেন যে – কতই ত প্রাচীন উৎসব আছে কিন্তু দুর্গাপূজার মত কোন উৎসব মনকে এত আলোড়িত করে না, এত মধুর স্মৃতি বহন করে না। এই পূজাকালে মন এক গভীর পবিত্রতায় আপ্লুত হয়। সেই সঙ্গে মিশে থাকে একটা আনন্দের বাতাবরণ। এই আনন্দ আমাদের একটা পবিত্র পরিবেশে উন্নীত করে রাখে।

["Of all the old festivals, however, that of the Durga Puja awaken the strongest and most heartfelt associations. There

is tone of solemn and sacred feelings that blends with the conviviality and lifts the spirit to a state of hallowed elevated enjoyment." — Durga Puja ; H.P. 24. 10. 60.] হরিশ বাল্যকাল থেকে সর্দি কাশি ও হাঁপানি রোগে ভুগতেন। এর প্রতিষেধকরূপে মাতা রুক্মিনী দেবী নিজ বিশ্বাসমত একটি দৈবশক্তি সম্পন্ন মাদুলি তাঁর হাতে বেঁধে দেন। কুসংস্কারমুক্ত হরিশ্চন্দ্র এই মাদুলিটি আজীবন তাঁর বাহুলগ্ন রেখেছিলেন, মার মনে কষ্ট না দেওয়ার জন্যই তিনি এই মাদুলিটি কোন দিন ত্যাগ করেননি। অশিক্ষিতা কুলীন কন্যা, কুলীন পত্নী, মাতা রুক্মিনী দেবী ও তাঁর দেশমান্য সুশিক্ষিত এবং কর্মযোগী পুত্র হরিশের মধ্যে নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও একটি গভীর মানসিক সাযুজ্য ছিল। হরিশ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন না সুতরাং একথা নিশ্চিত যে এই অশিক্ষিতা মাতা হরিশের জনকল্যাণে আত্মনিয়োগের সমর্থক ছিলেন, হয়ত তিনি বিদ্যাসাগর জননী ভগবতীদেবীর মতই হরিশের প্রেরণাদাত্রীও ছিলেন। হরিশের বাড়িতে বহু বন্ধু-বান্ধবের আসা যাওয়া ছিল, হরিশ জননী এঁদের প্রতি প্রীতিপরায়ণা ছিলেন এবং এঁদের আহার বা জলযোগের ব্যবস্থা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে আরও দুচার জন সঙ্গী নিয়ে অসময়ে উপস্থিত হয়ে আহার করতে চাইতেন, উদ্দেশ্য থাকত বন্ধুকে বিব্রত করে কিছু কৌতুক। শুধু অন্তরঙ্গমহলেই এই দেশবিশ্রুত মহাপুরুষের কৌতুকপ্রিয়তা প্রকাশ পেত। সুদূর উত্তর কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে দুচারজন সঙ্গীসহ ভবানীপুরে অসময়ে হরিশের বাড়িতে চলে আসতেন। দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি হ'ত। ইতিমধ্যে রুক্মিনীদেবী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সঙ্গীদের পরিতৃপ্তি সহকারে আহারের ব্যবস্থা করে দিতেন।* নীলবিদ্রোহ-কালে হরিশের বাড়িতে মফঃস্বল থেকে বহুলোক আসতেন, এজন্য হরিশ নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িটি বন্ধক রেখে তাঁকে এই সময় ঋণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে শোনা যায়। মাতার প্রশ্রয় না পেলে হরিশের পক্ষে প্রত্যহ মফঃস্বল থেকে আগত বহু লোককে বাড়িতে আহার ও আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হত না। রুক্মিনী দেবীকেই এঁদের রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে হত। তিনি হয়ত কলহপ্রিয়া ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির ছিলেন কিন্তু তিনি যে অসাধারণ করুণাময়ী রমণী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীলবিদ্রোহকালে-সারাদিন আপিসের পরিশ্রমের পর হরিশ আপিসের পোষাক বদলাবার সময় পেতেন না, সেই বেশেই পেট্রিয়টের কাজ করতে বসতেন। তখন হরিশ জননী আর্তনাদ করে বলতেন 'ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মারা পড়বি, ওরে কলম রাখ'। হরিশ এই একটি ক্ষেত্রে মায়ের কথা শুনতেন না।

* বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. কলিকাতা, ১৮৯৫ (পৃঃ ৪৬১)

তিনি বলতেন "মা, তোমার সব কথা শুনবো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, একাজ না করে আমি ঘুমুতে পারব না···"।*

পারিবারিক জীবনে হরিশ্চন্দ্রের নিকট অগ্রজ হারাণচন্দ্রের স্থান মায়ের ঠিক পরেই ছিল। মনে হয় হারাণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তবে মোটামুটি লেখাপড়া জানতেন। তাঁর কাছ থেকেই হরিশ্চন্দ্র প্রথম ইংরাজি শিক্ষা করেন।* স্বল্পশিক্ষিত হারাণচন্দ্রের কোন নির্দিষ্ট জীবিকা ছিল বলে মনে হয় না। তিনি যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন তবে হরিশ্চন্দ্রের কিশোর বয়সে নীলাম কোম্পানীর আপিসে মাসিক দশ টাকা বেতনে চাকুরি করার প্রয়োজন হত না। স্পষ্টই বোঝা যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ছোট ভাইকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। হরিশ্চন্দ্র তাঁর উপর নির্ভরশীল এই অগ্রজকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখতেন। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসটি হারাণচন্দ্রের নামেই কেনা হয়, অতঃপর হারাণচন্দ্র এই প্রেসটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। হরিশ্চন্দ্রের সাজসজ্জা অতি সাধারণ ছিল, চাকরিতে উন্নতি এবং শিক্ষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হরিশের বেশভূষার পরিবর্তন হয়নি। নিজের সাজসজ্জায় উদাসীন হরিশ্চন্দ্র হারাণচন্দ্র যাতে ভবানীপুর পল্লীর সম্ভ্রান্ত 'বাবু'দের মত জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। হরিশ নিঃসন্তান ছিলেন। তার স্ত্রী ভগবতী দেবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না—তিনি 'কাব্যের উপেক্ষিতা'ই থেকে গেছেন। এক কালের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাল্যকাল ভবানীপুর পল্লীতে অতিবাহিত হয়েছিল। সৌরীন্দ্রমোহন বাল্যকালে এই মহিলাকে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে পাড়ার ছেলেরা ভগবতী দেবীকে 'ঠাকুমা' বলত। তিনি ধর্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা ছিলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে ডেকে তিনি তাদের ভাল করে পড়াশুনা করতে বলতেন, আরও বলতেন যে আমাদের বাবু (অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র) খুব পড়াশুনা করতেন, আর যে সব ছেলেরা পড়াশুনা করে তাদের খুব ভালবাসতেন।†

হরিশ্চন্দ্র আপিসে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে খুব সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করতেন, এই কর্মচারীরাও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার খুব সৌজন্যপূর্ণ ও হৃদ্য ছিল। হরিশের ঊর্ধতন কর্মচারীরা সকলেই

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, নিউ এজ সং.

† প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সৌরীন্দ্রমোহনের এই স্মৃতি কথা কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। স্মৃতি থেকে এটি উদ্ধৃত হ'ল। সঠিক সূত্র নির্দেশের অক্ষমতার জন্য পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

ছিলেন ইংরাজ। এঁদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ ছিল কিন্তু কখনও তিনি এঁদের তোষামোদ করতেন না। তাঁর প্রখর আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান সর্বদাই সজাগ থাকত। একবার তাঁর একজন উর্ধতন কর্মচারী মিঃ হোলিংবেরী তাঁকে লক্ষ্য করে অপর একজনকে বলেন যে 'লোকটার রকম দেখ' (look at the man)। হরিশ এতে অপমানিত বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। যথাকালে এই পদত্যাগ পত্র পেয়ে আপিসের বড়কর্তা মিঃ চ্যাম্পনীজ হরিশকে ডেকে বলেন যে মিঃ হোলিংবেরীর কাছে তাঁকে যাতে কোন কাগজ পত্র না নিয়ে যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা তিনি তখনই করবেন। হোলিংবেরীকে এ বিষয়ে সতর্কও করে দেওয়া হবে। মিঃ চ্যাম্পনীজের অনুরোধে হরিশ্চন্দ্র তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। মিঃ চ্যাম্পনীজের সঙ্গে হরিশের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। মিঃ চ্যাম্পনীজ তাঁর অতি দুঃস্থ অবস্থায় তাঁকে চাকুরি দিয়েছিলেন এই জন্য হরিশ আমৃত্যু এঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। হরিশের আইন জ্ঞান গভীর ছিল, তখনকার দিনে আইন (Law) পরীক্ষার প্রবর্তন হয়নি। নিজের আইন জ্ঞানের কিছু পরিচয় দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট থেকে আইন ব্যবসায়ের অধিকার বা সনদ পাওয়া যেত, এই ভাবে 'সনদ' পেয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন ব্যবসায় অবলম্বন করে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জন করেন। এঁরা হরিশকে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত করার চেষ্টা করেন, হরিশ এঁদের পরামর্শ বা অনুরোধ উপেক্ষা করেন। তৎকালে বিখ্যাত ইংরাজ ব্যবহারজীবী মিঃ মণ্ট্রিয়ো প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়নের ব্যবস্থা হলে সেখানে আইন অধ্যাপনাও করতেন। তিনি ছাত্রদের বলতেন যে হরিশ্চন্দ্রের মত আইন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ইংল্যাণ্ড দেশেও বেশি নেই। দরিদ্র হরিশ্চন্দ্রের অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাঁর অর্থলোভ ছিল না। তিনি এই সব বন্ধুদের বলতেন যে দশটা পাঁচটার সরকারি চাকুরি করে যে সময় তিনি পান তাতে তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট চালাবার ও জনসেবা করার সময় পান। আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলে তাঁকে সব সময় এই কাজ নিয়ে থাকতে হবে তিনি আর দেশসেবার সময় পাবেন না। তৎকালের সফল ব্যবসায়ী স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ হরিশের আর্থিক উন্নতির জন্য তাঁকে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। হরিশ এই একই কারণে তাঁর পরম হিতৈষী মহাপ্রাণ রামগোপালের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। রামগোপাল হরিশের এই নির্লোভিতা এবং দেশসেবার ঐকান্তিকতায় তাঁর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হরিশ নিজের ব্যক্তি জীবনের মাধ্যমে জাতীয় ও আত্ম সম্মান কি ভাবে রক্ষা উচিত তা দেশবাসীকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

হরিশের অন্যতম সুহৃৎ ও গুণমুগ্ধ মনস্বী রাজনারায়ণ বসু হরিশের দিন চর্যার

এই মর্মে একটি বিবরণ দিয়েছেন "হরিশ মোটেই আরাম প্রিয় ছিলেন না। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতেন। এরই মধ্যে তাঁর বাড়িতে বন্ধু সমাগম হত। এদের সঙ্গে আলাপের ফাঁকে ফাঁকেই আগামী সংখ্যার পেট্রিয়টে কি কি বিষয় নিয়ে লেখা হবে তার একটা খসড়া তিনি করে ফেলতেন। এর পর খুব তাড়াতাড়ি আহার সেরে বেলা দশটায় আপিসে পৌছাতেন। বৈকাল পাঁচটায় আপিসের কাজ সেরে ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরীতে (মেটকাফ হল) গিয়ে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার কাজ সেরে কষাই টোলায় (বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট অঞ্চল) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে এসে বসতেন। এখানে জরুরি চিঠিপত্র লেখা ও অন্যান্য কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতেন। ততক্ষণে তাঁর বৈঠকখানায় তাঁর প্রিয় বন্ধুরা সব এসে জুটে যেতেন। হরিশের সঙ্গ এই বন্ধুদের পরম কাম্য ছিল, হরিশও তাদের গভীর ভাবে ভালবাসতেন। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশের আগের দিনের দু তিন রাত্রি হরিশ প্রেসেই কাটাতেন, প্রুফ দেখা থেকে সম্পাদকীয় লেখা সব কাজই রাত জেগে করতেন। ...

হরিশ বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দিতেন, তবে এই কাজটি খুবই গোপনে করতেন, যাতে গ্রহীতার মর্যাদা হানি না হয়। পাড়ায় আগুন লাগলে হরিশ সর্বাগ্রে আগুন নেভাতে ছুটে যেতেন। প্রতিবেশী অথবা বন্ধুদের বাড়িতে কারো অসুখ করলে হরিশ রাত্রির পর রাত্রি জেগে রোগীর সেবাশুশ্রূষায় রত হতেন। প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সর্বাগ্রে হরিশ্চন্দ্র তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন" (হিন্দুপেট্রিয়ট থেকে সংকলিত ও অনূদিত, ১২.৯. ১৮৬১)।

দীর্ঘ যষ্টি হস্তে জলের বালতি নিয়ে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ হরিশ পাড়ায় আগুন নেভাতে ছুটতেন, রাত্রি জেগে রোগীর সেবা করতেন, তাঁর অজস্র গোপন দান ছিল—এসব কথা হরিশের অন্যান্য জীবনী লেখকেরাও লিখে গিয়েছেন। রাজ-নারায়ণ লিখেছেন পাড়া প্রতিবেশীর বিপদে আপদে হরিশ তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। তবে হরিশের এই পর-দুঃখকাতরতা তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তখনকার দিনে বহু কলকাতাবাসী এমন কি মফঃস্বলবাসীর মনে এই ধারণা ছিল যে কোনরকমে হরিশ মুখুজ্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের বিপদের একটা সুরাহা হয়ে যাবে। হরিশের মৃত্যুর শতাব্দী কাল পরেও একটা জনশ্রুতি ছিল যে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ 'পরামর্শের জন্য 'হরিশবাবু উকীলের' কাছে তাদের দূত পাঠিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিপদ-গ্রস্থ এক মারাঠী বিদ্রোহী নায়কের স্ত্রী তাঁর সংকট মোচনের জন্য কলকাতায় হরিশের কাছে ছুটে এসেছিলেন। তবে এই জনশ্রুতির কোন ভিত্তি আছে কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। বস্তুতঃ হরিশের বাড়িতে সাহায্য প্রার্থীর ভিড় লেগেই থাকত (শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় 'রথের মেলার মত')। অবশ্য সকলেই যে অর্থ সাহায্যের জন্য আসত এমন নয়। যে কোন বিপদেই প্রতিকারের জন্য

মানুষ হরিশের কাছে ছুটে আসত।

হরিশ দানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন, অথচ তিনি মোটেই ধনী ছিলেন না। হরিশের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে হরিশ অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন, তাঁর অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয়-বান্ধব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তাঁর জীবন যাত্রা অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। পদোন্নতি হওয়ার পরও আপিসে হরিশ একটি সাধারণ ঘরে সাধারণ চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করতেন, আপিসের বড়কর্তা মিঃ চ্যাম্পনীজ তাঁর ঘরটি তাঁর পদোপযুক্ত রূপে সুসজ্জিত করার আদেশ দেন। হরিশের তীব্র আপত্তিতে এটি কার্যকর হয়নি। হরিশ আপিসের কর্তাকে বলেছিলেন, "আমরা ভারতবাসী, আমরা আড়ম্বর শূন্য জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত থেকেও অনেক বড় বড় কাজ করতে পারি। আমার পূর্বপুরুষেরা কুটিরে বাস করেও অনেক উচ্চ চিন্তার ফসল রেখে গিয়েছেন।" হরিশের আপিসের ইংরাজ ও য়্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলত যে নেটিভেরা কাজ করতে ভয় পায়, অসুখের অজুহাতে যখন তখন ছুটি নেয়। হরিশ স্বজাতীয়দের এই সমালোচনায় ব্যথিত ও অপমানিত বোধ করতেন। তিনি নিজে খুব কম ছুটি নিতেন, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। তাঁর শরীরে ক্ষয়কাশ রোগের লক্ষণ প্রাত্যহিক জ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি এই সময় আপিস থেকে ছুটি নেননি। বন্ধুরা ছুটি নেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন আপিসের ফিরিঙ্গি ও ইংরেজদের তিনি দেখিয়ে দিতে চান যে ভারতবাসীরা যে কোন অবস্থাতেই তাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে। এই শিশু সুলভ জেদের ফলে হরিশ স্থায়ীভাবে শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

হরিশচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি কখনও কোন মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। এ বিষয়ে তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র ভেদ ছিল না। রাস্তার মুটে মজুরদের প্রতিও তাঁর ব্যবহার অতি ভদ্র ছিল। অনেক শিক্ষিত লোক ধমক দিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে এদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। হরিশ কখনও এদের কাছ থেকে কোন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতেন না। কোন বন্ধু-বান্ধবকে মেহনতী মানুষকে ঠকাতে দেখলে হরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে এদের সঠিক প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করতেন। দুঃখ দারিদ্র্যের পীড়নে এককালে নিপীড়িত হরিশচন্দ্র দুঃখ দারিদ্র্য পিষ্ট মানুষের প্রতি গভীর মমতা পোষণ করতেন, এদের প্রতি কোন তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার ভাব তাঁর মনে স্থান পেত না। এ বিষয়েও করুণা-সাগর বিদ্যাসাগরের তিনি ছিলেন প্রকৃত অনুগামী।

হরিশ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আত্ম-প্রচার বিমুখতা। তখনকার দিনে টাউন হলে বক্তৃতা সভার বিবরণে হরিশের নামের অনুল্লেখ চোখে পড়ার

মত। সভার পরিকল্পনা বা গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনেক সময় হয়ত তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত হত তবে তাঁকে সভা মঞ্চে দেখা যেত না। হরিশের সমকালে 'ফটো-গ্রাফী' কলকাতার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের মত বহু আলেখ্য-অঙ্কক তখন কলকাতায় ছিলেন। হরিশের সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রায় সকলেরই 'ফটো'বা আলেখ্য পাওয়া যায়। শুধু হরিশই এর ব্যতিক্রম, তাঁর কোন ফটো বা অলেখ্য পাওয়া যায় না, এটা তাঁর আত্মপ্রচার বিমুখতার একটি দৃষ্টান্ত। হরিশ্চন্দ্র কখনও নিজেকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক রূপে ঘোষণা করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি 'লাইবেল' বা মানহানির মামলা হয়েছিল এই সংবাদ হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে হরিশ্চন্দ্র নিজেকে 'বিখ্যাত' করতে চাননি, এই ভাবে তিনি এ ব্যাপারে কারো সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চাননি, কারো সাহায্যও চাননি। ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজগুলি এ বিষয়ে যে সব মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত, এর প্রতিবাদে হিন্দু পেট্রিয়টে 'লাইবেল' বা মানহানি মামলায় প্রকৃত বিবরণ অবশ্য ছাপা হয়েছিল। এই লাইবেল বা মানহানির মামলায় হরিশ আইনের ফাঁকে বেরিয়ে আসতে পারতেন কারণ তিনি খাতা পত্রে হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক বা প্রেসের 'কীপার' ছিলেন না, কিন্তু তিনি তা করেননি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাণচন্দ্র এবং পেট্রিয়ট কাগজের বেতনভুক প্রিণ্টার ও পাবলিশারকে হয়রাণি থেকে বাঁচাতে তিনি এই মামলাগুলির যে আসল বিবাদী বা আসামী একথা অস্বীকার করেন নি। হরমণি হরণ সংক্রান্ত মানহানির মামলা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, যে হরিশ্চন্দ্র অভিযোক্তা আর্কিবল্ড হিলসের মানহানি করার জন্য আদালতে লিখিত ভাবে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে মামলাটি মিটে যেত। হরিশের কাছে এমন প্রস্তাবও বিপক্ষ থেকে এসেছিল জানা যায় কিন্তু হরিশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি মামলায় জিতে উদ্ধত, দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী এই ইংরেজ সন্তানকে উচিত শিক্ষা দেবার'সংকল্প' নিয়ে মামলা চালিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি অবশ্য বুঝতে পারেননি যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং তাঁর এই পৌরুষের মূল্য একদিন তাঁর সহায় সম্বলহীনা বিধবা পত্নীকে দিতে হবে। বিভিন্ন নির্ভর যোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে গভর্ণর জেনারেল থেকে শুরু করে ভারত সরকারের প্রতিটি দায়িত্বশীল উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী হিন্দু পেট্রিয়টের মতামতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।* নিঃসন্দেহে এরা ব্যক্তিগত ভাবে হরিশকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে একমাত্র হরিশকেই সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়েছিল— এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে বিশিষ্ট রাজপুরুষেরা তাঁকে চিনতেন এবং শ্রদ্ধা

* Bengal under Lt. Governors, Buckland—(Vo. 1) P. 1048.

করতেন। হরিশ কোন দিন এঁদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেননি বা এঁদের দরবারে হাজির হননি। বহু রাজা জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিশের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার স্বত্ব ক্রয়ের পর প্রায় তিন বৎসর কাল পত্রিকা প্রকাশের জন্য হরিশকে তাঁর কষ্টার্জিত অর্থের প্রায় অর্ধেক অংশ অর্থাৎ মাসিক দেড়শত থেকে দুইশত টাকা ব্যয় করতে হ'ত। এই সময় মধুসূদন রায়ের আমলে কেনা টাইপগুলি প্রায় অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল, অর্থাভাবে নিকৃষ্ট কাগজে পেট্রিয়ট, ছাপতে হ'ত। হরিশের ধনী বন্ধুদের কেউ কেউ এই সময় অযাচিতভাবে হরিশকে নূতন 'টাইপ' ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন—এঁর মধ্যে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহও একজন ছিলেন। ধনী বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে বা নাচ গান দেখতে যেতে হরিশ রাজী থাকতেন, কিন্তু এঁদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ হরিশের কাছে সহনীয় ছিল না। তিনি মনে করতেন, যে তাঁর ধনী জমিদার বন্ধু যতই তাঁর ঘনিষ্ঠ হন না কেন, কোন সময়ে কোন অন্যায় কাজ করতে পারেন, জমিদার হলে প্রজা পীড়নে অংশ নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে উপকার কর্তার বিরুদ্ধে কিছু লেখার অসুবিধা ঘটবে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথাটি (Free press) আজকাল বহু ব্যবহৃত। কোন গোষ্ঠির কাছে টিকি বাঁধা থাকলে স্বাধীন ভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা অসম্ভব, এই সত্যটি ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক যুগেই হরিশ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাঁর আক্রমণ ও সমালোচনা থেকে কোন বিশেষ শ্রেণী বা সমাজই রক্ষা পায়নি। হরিশের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিসভায় সুপ্রীম কোর্টের শ্রেষ্ঠতম আইনজীবী মিঃ মণ্টিয়ো বলেছিলেন যে তিনি দেখে বিশেষ আনন্দিত বোধ করছেন যে সব শ্রেণীর ও সব সমাজের মানুষেরাই এই শোকসভায় এসেছেন যদিও এঁরা কেউই হরিশের গালাগালির হাত থেকে বাঁচতে পারেন নি ("He had castigated you all and yet to your honour be it said, you are here to do justice to his memory").

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে দেশে নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর নব্য বঙ্গরূপে পরিচিত হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ রামমোহনের এই ঐতিহ্য বহনের ভার গ্রহণ করেন, তবে এঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এঁরা কখনও কখনও মুখ খুলেছিলেন কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে ইংরাজের অপশাসনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই ইয়ং বেঙ্গলদের অধিকাংশই নিজের নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতেই শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। দেশের এই অবস্থায় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠির বহির্ভূত হরিশ্চন্দ্র প্রথমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মক্ষেত্রে ও পরে হিন্দু পেট্রিয়ট, সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের

শুরু থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদন করেন। আট বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ভারতের জাতীয় জীবনে একটি যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত কালের মধ্যে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (বেঙ্গলী সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সম্পাদক) একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে "আমরা সবে সমাজের সঙ্গে তাল রাখে বাঁচতে শিখছিলাম। যুগ যুগান্ত ধরে অন্ধকারের মধ্যে বাস করে আমরা একান্ত চেষ্টায় এক আলোক রশ্মির সম্মুখীন হতে পেরেছিলাম। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ কি তা আমরা সবে বুঝতে শিখেছিলাম। এই আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। তাঁর মৃত্যুতে সমাজে এক বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে গেল।" [Mookherjee's Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত (জুন, ১৮৬১)], গিরিশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটির একাংশ ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য দক্ষ সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ জাতীয় জীবনে হরিশ্চন্দ্রের দান কতটুকু তা দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে জাতীয়তা বোধ উদ্বোধনে হরিশ্চন্দ্র যে পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া হরিশ ও রামগোপালকে বাংলা দেশে দেশ-বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যেতে পারে" (ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব পৃঃ ৭৭, কলিকাতা-১৮৮৫)। হরিশের হিন্দু পেট্রিয়ট্ শুধু জনজাগরণের ও জনসেবার ক্ষেত্রে প্রথম নয়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় আদর্শ সংবাদ পত্র। হরিশের মৃত্যুর পর বোম্বাইবাসীগণ তাঁর স্মৃতি সভার আয়োজন করেন এবং একটি আবেদন পত্র প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য ২০০১ টাকা সংগ্রহ করে কলকাতার হরিশ স্মৃতি তহবিলের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এঁদের এই অর্থসংগ্রহের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হরিশের স্মৃতি রক্ষার জন্য হিন্দু পেট্রিয়টের অব্যাহত প্রকাশ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে বোম্বাই-এ একটি বিদ্বৎ সংস্থায় "হরিশের জীবন" সম্পর্কে আলোচনার জন্য কয়েকদিন আগে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। ভারতের সুদূর প্রান্ত প্রদেশের মানুষেরা হরিশের মৃত্যুর নয় মাসের মধ্যে হরিশের জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন—এই ঘটনাটি বুঝিয়ে দেয় সাংবাদিক হিসেবে হরিশ্চন্দ্র দেশবাসীর মনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু ছিল। দেশের জন-জাগরণে ও পরিশেষে স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটা স্বীকৃত সত্য। ভারতের স্বাধীনতা লাভে

জাতীয় নেতাদের অপেক্ষা জাতীয় সংবাদপত্রগুলির কাছে ভারতীয় জনগণ কম ঋণী নয়। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এমন কি স্বয়ং মাহাত্মা গান্ধীও সংবাদ পত্রকে তাঁদের মতবাদ প্রচারের মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র এই সব জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের আদি-পুরুষ, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। বিবেকানন্দ পরিব্রাজক রূপে ভাষণের মাধ্যমে ভারতে জাতীয়-জাগরণ এনেছিলেন আর হরিশের মাধ্যম ছিল একটি সংবাদ পত্র, এই সংবাদ পত্র সর্বভারতে এমন কি বিদেশেও বিদেশীদের কাছে সমাদৃত ছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্র বিদেশী শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করে সমগ্র দেশকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, জনগণের মধ্যে সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা সঞ্চারও তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ভারতের সংবাদ পত্রের ইতিহাসে তাঁর স্বদেশ প্রেম ও নির্ভীকতা তাঁর মৃত্যুর ১২৫ বৎসর পরেও দীপ্যমান হয়ে আছে। জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে বিবেকানন্দের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে দুঃখে এই মন্তব্য করেছেন যে গুরু পরিশ্রমে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন (worched himself out)। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে দেশের কল্যাণের জন্য তিনি জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে অকাল মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিলেন। মায়ের সতর্ক বাণী "ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মারা পড়বি, ওরে কলম রাখ" মাতৃভক্ত হরিশকে কর্তব্য ভ্রষ্ট করতে পারেনি। মৃত্যুর মিনিট তিনেক পূর্বেও জ্বর বিকারের ঘোরে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল "ওরে পেট্রিয়টের প্রুফটা আর একবার আমাকে দেখতে দে, আমাকে আর একবার না দেখিয়ে ছাপিস নে"। তার পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৩৭ বৎসর পূর্ণ হয়নি। সাংবাদিক-কেশরী হরিশ্চন্দ্রের এই আত্মোৎসর্গ যে ব্যর্থ হয়নি, পরবর্তী কালের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে। একমাত্র সাংবাদিকতার মাধ্যমেই হরিশ্চন্দ্র সমসাময়িক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক এবং জনগণের মানুষ (peoples' man) রূপে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন। একালের জননায়কদের মধ্যে অনেকেই সাংবাদিক ছিলেন তবে এটাই তাঁদের একমাত্র পরিচয় ছিল না, তাঁদের কর্মের পরিধি অন্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ছিল। দেশের জনজাগরণের ও জনসেবার জন্য হরিশ্চন্দ্রের হাতে একটি মাত্র আয়ুধ ছিল এবং তা' ছিল আত্মোৎসর্গকারী নির্ভীক ও কুশলী সাংবাদিকতা।

স মা প্ত

পরিশিষ্ট—ক

ON HARISH

A vessel floundering with its port in sight;
A tower by lightning struck when just complete;
An eagle smitten in its loftiest flight,
A tree blight withered as its fruit grows sweet,
Old emblem is all, too common to be strange
Of the world's insecurity and change.

II

So hath it been with him. He passed away, just as the well deserved reward was gained. The honour due to him for many a day, is by a dying hand at last attained. Like the the old Grecian Warrior was he, expiring on the arms of victory.

III

His was the glory of a useful life,
Devoted to a helpless nation's good
Not in the barbarous pride of war-like strife
Not against hostile arms the champion stood,
But against apathy and fraud and wrong,
He struggled nobly and he struggled long.

IV

It was his to strive to wake the torpid mind,
To let in light where all was dark before,
Peace, plenty, Liberty, his ends designed,
Justice and truth the instructions he bore,
Untiring duty was his watch-word made
What he enjoined on all, himself obeyed.

V

And he has died the true, the earnest hearted
Mourn sons of India, for your loss is great
A light is quenched, a father had departed,
Just all his worth ye did appreciate,
What hath he left behind a spotless fame
A great example and a revered name.

Mahim, 21.8.1862 F.B.

[Extracted from 'Indian Banner' Bombay, August 1862.]

পরিশিষ্ট—খ

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পর্বত শেখর হ'তে বরষা সময়ে
গভীর গর্জনে নদী ভাসাইয়া কূল
বহে যথা, সেইরূপ বেগবান হয়ে
লেখনি প্রবাহ তব বহিল তুমুল,
ঘোর রবে বিজাতীয় অত্যাচারী তীর
আক্রমণ করি; যথা কাটি শত্রু-শির
অসিপত্র ঝকমকে। বাঙ্গালা মাঝারে
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ
করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা সুধারে।
আনন্দিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিতে,—
তোমা হতে হ'বে আরো মঙ্গল সাধন,
কিন্তু নিরদয় কাল (ভীম দরশন!)
হরিল তোমার আশা পূর্ণ না হইতে।

রাজকৃষ্ণ রায়

(বঙ্গভূষণ, পৃঃ ৩৭, কলিকাতা, সম্বৎ—১৯৩০)

পরিশিষ্ট—গ

হিন্দু-প্যাট্রিয়ট

"—দেখ হিন্দু-প্যাটরিয়ট, পত্র মনোহর
স্বদেশের শুভদানে ফুল্ল-কলেবর,
কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়,
তাহার সংক্ষেপ বার্ত্তা বলি তব পায়
পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর,
অবিরাম বারিস্রোতে ক্ষোদিত প্রস্তর,
প্রাজ্ঞে যদি করে অধ্যবসায় বরণ,
আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট দেশের কল্যাণ,
হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল-চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়
প্যাট্রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল,
মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে?"

—দীনবন্ধু মিত্র

(সুরধনী কাব্য থেকে উদ্ধৃত ; দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সং, কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ ১৪৬—৭)